রাজগৃহ পর্ব

বিপুল সাহা

Rajgriha Parba
by Bipul Saha

প্রকাশ কাল ঃ নভেম্বর, ২০১১

গ্রন্থস্বত্ব ঃ ভারতী সাহা

প্রকাশক ঃ

চিত্রসজ্জায় ঃ কিংশুক সরকার
প্রচ্ছদচিত্র সামনে ঃ

অ(র বিন্যাস ঃ রূপা পাল

মুদ্রক ঃ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বিনিময় মূল্য ঃ

পার্বতী
দিদি

সূচীপত্র

রাজগৃহ পর্ব

১। গৌরচন্দ্রিকা	৭
২। বিহারশরিফ	১০
৩। রাঁচি থেকে যাত্রা	১৫
৪। পরিচয় পর্ব	২০
৫। রাজগৃহ	২৬
৬। উষ্ণকুণ্ড	
৭। বিপুলাচল	
৮। গৃধকুটের পথে	
৯। বাসাবদল	
১০। নালন্দা	
১১। পাবাপুরী	
১২। আবার বিপুলাচল	
১৩। বোধগয়া	
১৪। বাজে করুণ সুর	

সারনাথ পর্ব
পরিশিষ্ট

মুখবন্ধ

দেশভ্রমণের নেশা যাদের, তারাই জানে কী প্রবল এমন জ্বরের প্রকোপ। শুধু ভ্রমণকথা হয়তো একে বলা যাবে না, যদিও ভ্রমণ কেন্দ্র করেই নানা কথার বিন্যাস ও চরিত্রের আনাগোনা। ঘটনাত্র(ম অনেক কাল আগের এবং লেখালেখিও। আরো কিছু কথা জুড়ে শেষ করা হল দুটি পর্বে।

সারনাথ ও রাজগৃহ পর্ব ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে 'শিলালিপি' শারদীয় পত্রিকায়। পর্ব শেষে পরিশিষ্টে জুড়তে হল দুচার কথা। এমনধারা ভ্রমণগল্পও পাঠকের যদি ভালো লেগে যায় সেই আশায় রইলাম।

প্রচ্ছদের কাজে সাহায্য করেছে শ্রীমতী রূপা পাল। গ্রন্থাকারে প্রকাশনা পূর্বে ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করা হল। তবে ছবিগুলি সমকালের নয়। অনেক হাল আমলের।

সকলকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

বিপুল সাহা

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
কোলকাতা - ১০

লেখকের অন্যান্য রচনা

১। পার্লহার্বার
২। কার্গিল কা(্মীর
৩। ঈ(ের দেবতা ও সৃষ্টি
৪। বৈষে(াদেবী অমরনাথ দর্শন
৫। কুমায়ুন ভ্রমণ
৬। সাগরে মন্দিরে নীলাচল
৭। প্রলয় দানব সুনামি
৮। ধর্মভাবনা বিজ্ঞানভাবনা
৯। হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ
১০। অরূপ খাজুরাহো
১১। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

রাজগৃহ পর্ব

১। গৌরচন্দ্রিকা

সময়কে ছোঁয়া যায় না। দেখা যায় না। সময় ধরা থাকে বোধে। সময় ধরা থাকে মানুষের ইতিহাসে, ঐতিহ্যে। ধরা থাকে মাটিতে পাথরে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে এবং ফসিলে। সে এক আশ্চর্য বহতা নদী। দৃশ্যমান নয় তবু তার স্রোত আছে। বি(চরাচর সেই স্রোতে আপ্-ুত। শা(ত নয় কিছুই। সূর্য নয়, চন্দ্র নয়, পৃথিবী নয়। অবশ্য তা মহাকালের মাপে। মানুষের জীবন অতি (ুদ্র এবং ন(র। কাল সেখানে খণ্ড খণ্ড ভগ্নাংশমাত্র। জীবনের খণ্ডকালের তুলনায় সূর্য-চন্দ্র-তারাদের অবিন(র মনে হয়। মানুষ ন(র হলেও মানবতা যেন শা(তবোধে মহান। ন(র সময় সেখানে অবিন(র হয়ে যায়।

জীবনের অপরাহ(বেলায় ফেলে আসা অতীতের স্মৃতি নিয়ে রোমন্থন ভালো লাগে। সকলেরই লাগে। বর্তমান বড়ো নির্মম – অত্যন্ত বাস্তব। ভবিষ্যতের গর্ভে থাকে কল্পনার সোনালি পরশ। স্বপ্নময় করে তোলে অনাগতকে। বিদগ্ধ অতীত রূঢ় বাস্তবতার ঘোর ছিন্ন করে ফেলতে পারে। তবু সে মধুর হয়ে দেখা দেয়। আঁচড় দেওয়ার (মতা নেই বলে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে চলা আমাদের। অতীত ঘেঁটে উপাদানের বি(ে-ষণ করি। তারপর ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় বর্তমানকে গড়ে তুলি। এভাবে চলে জীবনের ধারা।

শীতের ডিসেম্বরে কোথায় যাওয়া যায়? পাহাড়ে না সমুদ্রে? কাছেপিঠে না দূরে কোথাও? বিয়ে নির্বিঘ্নে পঁচিশটা বছর পার করা হয়েছে বলে কথা! কমলেন্দু চিঠি লিখেছে – কোথায় যাচ্ছ এবার? সিলভার জুবিলির দিনটা তো সেলিব্রেট করতেই হবে।

মন বলছে আরেকবার সেই সুদূর অতীতের ইতিহাস-পুরীতে যাই। প্রাচীন রাজধানী ছিল একদা। আজ সবই ভগ্নস্তূপ – সবই ধ্বংসাবশেষ।

– কার কথা বলছ?

মজা করে বললাম – গিরিব্রজ।

– ব্রজ বললেই তো ব্রজের রাখাল বালকের কথা মনে হয়। তার মানে বৃন্দাবন-মথুরা?

– না না সেখানে নয়।

– অনেককাল আগে এদেশে এক মহাপু(ষ জন্মেছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি গিয়েছিলেন সেখানে। সংসার ত্যাগ করে, সুখসম্পদ ত্যাগ করে বেছে নিয়েছিলেন সন্ন্যাসের জীবন। দুঃখের কারণ খুঁজতে বেড়িয়েছিলেন তিনি। আবার গিয়েছিলেন সেখানে সাধনায় সত্যলাভের পর। মানবকল্যাণে ব্রতী সেই তাপসের পুণ্যস্মৃতি জড়ানো তীর্থ বলতে পার। সেই রাজগৃহে।

লোকের মুখে রাজগৃহ এখন রাজগীর। শীতের মরশুমে চমৎকার স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে পরিচিত। পাহাড় ঘেরা ছোট্ট অথচ দা(ণ সুন্দর জায়গা। উপত্যকা না বলে সমতলভূমি বলাই ভালো। উষ(প্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত। সেই সঙ্গে খানিকটা ইতিহাস আছে নানা ধ্বংসাবশেষে ছড়ানো। আছে দু'জন মহামানবের পুণ্যস্মৃতি। তথাগত বুদ্ধ এবং বর্ধমান মহাবীর। আর আছে আধুনিক সভ্যতার নানা উপকরণ এবং বৈদ্যুতিক রোপওয়ে।

কোলকাতার কাছাকাছি এমন সমতল, পাহাড়, উষ(প্রস্রবণ, ইতিহাস, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, রোগ-উপশমের সুযোগ এত সব একসঙ্গে মেলা ভার। বৌদ্ধ এবং জৈনদের কাছে অবশ্য প্রধান আকর্ষণ তীর্থ(ে ত্রের মহিমা।

হাওড়া থেকে মেন লাইনে পাটনার কয়েক স্টেশন আগে পড়ে বক্তি(য়ারপুর জংশন। আগে ঐ স্টেশনে নেমে গাড়ি বদল করে যেতে হত রাজগীর। এখন ৩২৩১ হাওড়া-দানাপুর এক্সপ্রেসের খানকয়েক কোচ সোজাসুজি রাজগীর পর্যন্ত চলে যায় ৩২৩৪ পাটনা-রাজগীর এক্সপ্রেসের লেজুড় হয়ে। সময় নেয় ঘন্টা দেড়েক। সড়কপথেও প্রচুর যোগাযোগ আছে অন্যান্য শহরের সঙ্গে – পাটনা, গয়া, নওয়াদা, রাঁচি, হাজারিবাগ, বক্তি(য়ারপুর ও বিহারশরিফ। কোলকাতা থেকেও সরাসরি বাস যায়। বক্তি(য়ারপুর থেকে অনেক ট্রেকার চলে রাজগীরে যাওয়ার জন্য। পাটনা থেকে দূরত্ব ১০৩ আর বক্তি(য়ারপুর থেকে ৬৮ কিলোমিটার। হাওড়া থেকে রাজগীর রেলপথে ৫৪০ আর সড়কপথে ৫২৮ কিলোমিটার।

অতীতে অনেক নাম ছিল রাজগৃহের। যেমন বসুমতী, বৃহদ্রথপুর, কুশাগ্রপুর এবং মগধপুর। রামায়ণে দ্বাত্রিংশ সর্গে বলা হয়েছে – ভগবান স্বয়ম্ভুর পুত্র কুশ। ঐ রাজার চার পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র বসু। তিনি পাঁচটি পর্বতের মধ্যস্থলে গিরিব্রজ নামক নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তা বসুরাজার নামে বসুমতী বলে প্রসিদ্ধ হয়। রামায়ণে শোণা বা মাগধী নদীরও উল্লেখ আছে।

মহাভারতের সভাপর্বে পাই বৃহদ্রথ-জরাসন্ধের কথা। মগধের রাজা বৃহদ্রথ ছিলেন জরাসন্ধের পিতা। তাঁর নামানুসারে রাজগীর নগরীর নাম হয় বৃহদ্রথপুর। কুশাগ্র নামে কোন রাজার জন্য হয়তো কুশাগ্রপুর নাম হয়ে থাকবে। মগধপুর নাম তো মগধরাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি করতে। জরাসন্ধের পরে প্রদ্যোত বংশ এবং তারপর শিশুনাগ বংশ এখানে রাজত্ব করে। আমরা অবশ্য ঐতিহাসিক কালের মগধরাজ বিম্বিসার আর অজাতশত্রুর

রাজগৃহের সঙ্গে অধিক পরিচিত। আরো পরিচিত তথাগত ও মহাবীরের স্মৃতিধন্য রাজগৃহের সঙ্গে।

বিম্বিসার শিশুনাগ বংশীয় রাজা। বৌদ্ধ মহাবংশ মতে তিনি ভট্টিয় নামক রাজার পুত্র ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতকে। আনুমানিক রাজত্বকাল ৬০৩ থেকে ৫১৫ খৃঃপূঃ। আবার ৪৯১ খৃঃপূঃ পর্যন্তও হতে পারে। নির্ভর করছে তথাগত বুদ্ধের কালনির্ণয়ের উপর। তিনি কবে জন্মেছিলেন? ৬২৩, ৫৬৭, ৫৬৬ না ৫৬৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে? তাঁর জীবনকাল আশি বছরের। তথাগতের মহাপ্রয়াণের কিছু সময় আগে বিম্বিসারের জীবনাবসান হয় এবং পুত্র অজাতশত্রু সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ অশোক এখানে স্তূপ এবং হস্তিশীর্ষযুক্ত(স্তম্ভ নির্মাণ করেন। পঞ্চম শতকে ফা হিয়েন এবং সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ রাজগৃহে এসেছিলেন।

অনেক কাল আগে এক আশ্চর্য ভ্রমণ হয়েছিল সেই রাজগৃহে। শতাব্দী শেষ হওয়ার ছত্রিশ বছর আগে। রাঁচি থেকে বাসে চড়ে দুই যুবকের যাত্রা হয়েছিল। অন্যদিকে চারজন মহিলা বক্তি(য়ারপুর হয়ে ট্রেনে করেই বেরিয়ে পড়েছিল রাজগৃহের উদ্দেশে। স্বাস্থ্য-উদ্ধার যেমন ছিল, সেই সঙ্গে সংসারের বাধানিষেধের গণ্ডী থেকে মুক্তি(র মতলবও ছিল।

স্মৃতিচারণ ভারী সুখের। যতবারই হোক না কেন, প্রথম রাজগৃহ ভ্রমণের স্মৃতি উজ্জ্বলতম থেকে গিয়েছে কারো কারো জীবনে। আনন্দ অমলিন আজো। কারণ তো আর কিছু নয়, ভ্রমণের সঙ্গে জুড়ে যায় ভ্রমণকারীদের সুখদুঃখ, তাদের জীবনকথা। এই ভ্রমণকাহিনী মূলত 'সেদিনের সোনাঝরা সন্ধ্যা'র।

২। বিহারশরিফ

বাসে উঠে সবে গুছিয়ে বসা হয়েছে। গাড়িতে লোক জন বেশী নেই। দশবারোজন যাত্রী হবে বড়ো জোর। এতটা ফাঁকা হবে আশা করা শক্ত(। বেশ আরাম করে যাওয়া যাবে মনে হচ্ছে। কিন্তু সচল হবে কখন কে জানে! এই সব সাতপাঁচ ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে মনে।

এমন সময় কোথা থেকে এক প্রমীলাদল কলকল করে মালপত্র নিয়ে বাসের দরজায় হাজির। লোটবহর নিয়ে গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

— এ ভাই রোককে রোককে। তাড়াতাড়ি ওঠো না। ইয়ে রাজগীর যায়গি? যায়গি? হ্যাঁরে যাবে বলছে। আয় আয় দে আমার হাতে দে ব্যাগটা .....

কমলেন্দু আর এত(ণকার অবদমিত কৌতূহল চেপে স্থির থাকতে পারল না। দু'চার কথা যা কানে এসেছে তাতে তো বোঝাই গেল ওনারা কোন দেশীয়? তবু দুম করে সাদা বাংলায় জিজ্ঞেস করে বসল।

— আচ্ছা দিদি, আপনারা কি বাঙালী?

খোদ বাঙালিকে এরকম একটা প্র(ো করা যায়? থুরি বাঙালিনীদের? এবং এরকম জেনেশুনে? আসল কথা, আলাপ শু(করতে হলে কিছু দিয়ে তো শু(করতে হবে। লণ্ডনে হয় আবহাওয়া দিয়ে। ওখানকার দস্তুরমাফিক। পরিচয়ের সূত্রপাতের জন্যে এ রকম কিছু না কিছু তো থাকতে হবে। এখানে যে সুযোগটা পাওয়া গিয়েছে, তা যেন অনেকটা বাজারের থলে হাতে পথচারীকে 'বাজারে যাচ্ছেন নাকি' প্র(ো করে আলাপ জমানোর মতো।

সেদিন সামান্য প্র(ো দিয়ে চারজন মহিলার সঙ্গে যে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল দুই যুবকের, দিন কয়েকের মধ্যে তা অন্তরঙ্গতায় গভীর হয়েছিল। শেষদিন শোনগিরি পাহাড়ের বৃ(লতায় ঘন সবুজের উঁচু শিখরে বসে অদিতিকে সেকথা স্মরণ করিয়ে দিতেই স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে ও প্রস্রবণ হয়ে গেল। সেদিন বলতে পাঁচদিন পরে যেদিন রাজগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে দুই বন্ধুকে রাঁচি ফিরে যেতে হয়।

এভাবে আলাপের সূত্রপাত ঘটানো কি খুব চমকপ্রদ কাজ হয়েছিল? বেশ নাটুকেপনা? আসলে হয়েছিল কী, অপরিচিত মানুষের ভিড়ে হিন্দি ভাষার ঢক্কানিনাদে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল দুই বঙ্গসন্তান। বুঝি সেজন্যে বঙ্গীয় ললিত লাবণ্যের প্রতি এত আগ্রহ জন্মেছিল। কতটা তার বঙ্গভাষার জন্যে আর কতটা বঙ্গললনাদের জন্যে, সে কূট কথা না হয় অনুক্ত(থাক।

প্রমীলাদলকে প্রশ্নটা করেছিল কমলেন্দু। আসলে তা দুজনেরই জিজ্ঞাস্য। উত্তরে নিরাশ হতে হয়নি।

বাক্সবিছানার ঝক্কি সামলাতে সামলাতে ব্যস্ত দলনেত্রী গোছের একজন দরাজ গলায় জবাব দিলেন — হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাও তো রাজগীর যাচ্ছি। দাঁড়ান আগে জিনিসপত্র সামলে নি, তারপর সব বলছি।

দুই যুবকের বিছানাপত্র আগেই বাসের মাথায় চড়ে বসেছে। মহিলাদলটির বাক্সবিছানা সেই দশা লাভ করল। সকলে মিলে হাত লাগিয়ে হৈ চৈ করে অন্যান্য লোটবহর বাসের কোটরে তুলে ফেলা হল। মহিলাদলের সর্বকনিষ্ঠা সদস্যা ভারী স্যুটকেশ নিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল। বাসে তুলতে হবে।

এগিয়ে এসে বললাম — ছেড়ে দিন আপনি, আমি দেখছি।

— না না তার দরকার নেই। আমি পারব। এতবার যাতায়াত করেছি, ওঠানামা করেছি, এখন বেশ অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। সজোরে প্রতিবাদ করল মেয়েটি।

— ঠিক আছে বুঝলাম আপনি পারবেন। বিদেশে সুযোগ পেলে একটু আধটু সাহায্য করতে হয়। চান্সটা না হয় দিলেনই। তা ছাড়া আমরা বসে বসে আপনাদের স্যুটকেশ নিয়ে কসরৎ দেখব, সেটাই বা কেমন কথা বলুন?

— আচ্ছা নিন তবে তুলুন। হাল ছেড়ে স্যুটকেশ এগিয়ে দেয়।

সিটের উপরে নিচে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা দরকার। যে কোন সাহায্য করার জন্য দুই বঙ্গযুবক তখন সদাপ্রস্তুত। জিনিসপত্র গোছানো শেষ করে লম্বা সিটে মৌজ করে বসলেন দলনেত্রী। ইনি নবীনা নন বটে, তবে প্রবীণাও বলা চলে না। ফর্সা পাতলা গড়ন। বঙ্গললনারা যেমন হয় আর কী। সুভদ্রা ও মার্জিত (চিসম্পন্না। দেখলেই মনে হবে ওজন আছে। তার মানে নিজেদের সামলে সুমলে চলতে হবে। নয়তো ধমক খাওয়ার চান্স আছে। গম্ভীর হলেও ভীষণ কিছু নন। হাসিখুশি মিশুকে বলেই মনে হবে। তার পাশে বসেছেন কাছাকাছি বয়সের আরেকজন মহিলা। ফর্সা (গ্ন চেহারা তার। বোঝা যাচ্ছে, ইনি অবশ্যই কথা কম বলিয়ে। সঙ্গে চেহারায় মিল আছে এমন একজন মাসিমা। ছোটখাট চেহারা সেই প্রবীণা মহিলার। বৈধব্যবেশ জানাচ্ছে যে তার স্বামী গত হয়েছেন। একরাশ মালপত্র ঐ দু'জনের হেফাজতে। পিছনের সিটে গিয়ে বসল দলের সর্বকনিষ্ঠা সদস্যা। ইনি নবীনা। এমনভাবে কালো চাদর জড়িয়ে রয়েছে যেন তাকে নবীনা বলে কেউ বুঝতে না পারে। খুব সতর্ক সে ব্যাপারে।

থিতু হয়ে বসে দলনেত্রী বললেন — এবার শুনি তোমাদের খবর। কোত্থেকে আসছ? এই দেখ, তুমি বলে ফেললাম। কিছু মনে করলে না তো?

কলকল করে বলে উঠলেন। ধা করে তুমিতে নেমে যেতে মেয়েদের জুড়ি নেই। তারপরেই সাফাই দেবে, কিছু মনে করলে না তো। অন্য সময় হলে হয়তো বলেই

বসতাম, হ্যাঁ, কিছু মনে করেছি। কমলেন্দু সেপথে হাঁটলো না। কালবিলম্ব না করে বলে উঠল — না না মনে করব কেন। বরং আমরাও এই সুযোগে দিদি বলার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

এরপর পরিচয়ের পালা। নামধাম বলা। উল্লেখ করার মতো পরিচয় তো কিছু নেই — সাধারণ ছাপোষা বাঙালি ঘরের আর পাঁচটা বঙ্গসন্তান যেমন হয় আর কী! তবু নাম একটা না হলে পরিচয়ের ভার বহন করবে কে? একজন কমলেন্দু দাস। গা থেকে তার বাঙাল-বাঙাল গন্ধ এখনো যায় নি। অন্যজন আমি। আধ-বাঙাল হলেও বাঙাল গন্ধ ঘুচিয়ে প্রাণপনে কলকাত্তাই হয়ে উঠতে সচেষ্ট। কোলকাতা মহানগরে বাস। কলেজ পড়ুয়া দু'জনেই। থার্ড ইয়ার চলছে।

প্রমীলাদলটির পরিচয় এমনিধারা। দলনেত্রী বলে যাকে মনে হচ্ছিল, তার নাম নীতা রায়। তারই সমবয়স্কা যিনি, তার নাম সুরমা বিশ্বাস। মাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আমাদের গল্পে তার পরিচয় নি(মাসি। সর্বকনিষ্ঠার নাম অদিতি মণ্ডল। একটা ব্যাপারেই এদের মধ্যে ঘোর মিল, তা হল সকলেই বর্তমানে খাস কোলকাতার বাসিন্দা।

— কোথা থেকে আসছ? প্রশ্নটা দলনেত্রীর।

— আপাতত রাঁচি থেকে। কমলেন্দু উত্তর দেয়।

— রাঁচি থেকে মানে? সর্বো-না-আ- শ! কী বলছ সব! ঠিকঠাক আছো তো?

— না না রাঁচির পাগলা গারদ থেকে আসিনি। রাঁচিতে এসেছিলাম মেজদার কাছে। উনি সেখানে সার্ভিস করেন। এদিকে এসেছি ঘুরতে। বলতে পারেন কলেজ পালিয়েছি। ঘুরে ফিরে যাব বিহারের খানিকটা জায়গা। উত্তর দিই।

— তাই বল। কণ্ঠে ছদ্ম স্বস্তির সুর। পাগলা গারদ থেকে ফেরা নয় শুনে যেন খুব আশ্বস্ত হওয়া গেল। সবাই খুব একচোট হেসে নিল ছোটখাট কথার খুনসুটিতে।

বেশী(ণ বাসে বসে থাকতে হয় নি। একটু পরেই গাড়ি চলতে শু(করল। বিহারশরিফ থেকে রাজগৃহের দিকে গতিমুখ।

মাত্র আধঘন্টা আগে রাঁচি থেকে বিহারশরিফ এসে পৌঁছেছিলাম। আর তারপরেই রাজগীরের লোকাল বাসটা পেয়ে যেতে কেবলই মনে হচ্ছিল — কপালটা ভালোই যাচ্ছে। সময়মতো বাস পাওয়া যেন এক সৌভাগ্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তা না হলে তো সেই সাতটা সাড়ে-সাতটা অবধি অপে(া করতে হত। তারপরও হয়তো শুনতে হত — নির্ধারিত বাসটা ছাড়বে না নির্ধারিত সময়ে ছাড়বে না(অনিবার্য কারণে বাতিল হয়ে গিয়েছে। তখন এই ঘিঞ্জি ধুলোসর্বস্ব জায়গায় বিহারশরীফ বাসটার্মিনাসে বসে বসে চরম দুর্ভোগের মধ্যে রাত কাটাতে হবে। একদিকে প্রচণ্ড শীত, আরেকদিকে সারাদিনের বাসযাত্রার ধকল। এবং (ুধা। কুম্ভকর্ণের মতো ঘুম চেপে বসত চোখে। কি করে ঘুম

তাড়িয়ে বসে অপে(া করতুম কে জানে! সময়সারণিতে অবশ্য বলা ছিল, যে কোন সময়ে স্থানীয় বাস পাওয়া যেতে পারে।

দুই যুবকের উদরে তখন যা চলছে তা না বলাই ভালো। ঈশ্বর জানেন — সর্বভুক খাণ্ডবদহন এ ছাড়া অন্য কাকে বলে।

রাঁচি থেকে সকালবেলা যখন রওনা দিয়েছিলাম, ভেবে রেখেছিলাম বিহারশরিফে পৌঁছে রাতের ভোজনপর্ব সেরে নিয়ে তারপর অচেনা রাজগৃহের পথে পা বাড়ানো সঠিক হবে। রাজগৃহে রাতের আশ্রয় কোথায় জুটবে কে জানে! কোন ডেরা ঠিক করে বেরিয়ে পড়া হয়নি। মনে মনে তৈরী থেকেছি রেল স্টেশনে বা বাস টার্মিনাসে রাত গুজরান করতে হতে পারে। নিদেনপ(কোন বাড়ির দয়ালু বারান্দা। তাও না জুটলে বৃ(চ্ছায়া। রাতের অন্ধকারে বৃ(চ্ছায়ার কল্পনা অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বটে কিন্তু আমরা নিরূপায়। আসলে সকলেরই একটা বয়স থাকে যখন ও রকম কল্পনাবিলাসী ভাবনায় গা-ভাসানোয় কোন লজ্জাশরম থাকে না।

এরকমধারা একটু বেপরোয়া না হয়ে উপায়ও ছিল না। কারণ একদিকে পকেটের দৈন্যদশা, অন্যদিকে মুক্ত(আকাশের নিচে পা ফেলার দুর্নিবার লোভ। শুধু নিমুনিয়ার দুর্ভোগে না পড়তে হয় এটাই ছিল একমাত্র প্রার্থনা। সবরকম পথকষ্ট স্বীকার করে ঘরের বাইরে বেরোতে হবে — এরকম দুর্দম প্রেরণা পাথেয় করে পথে নামাই তো প্রকৃত ভ্রমণ। রাঁচির মেসে মেজদার সহকর্মী মানিকদাকে বলে এসেছিলাম — কষ্ট স্বীকার করে পথ চলার আনন্দ আলাদা স্বাদের। আমরা সেই আনন্দের স্বাদ পেতে চললাম রাজগীরের দিকে।

শেষ পর্যন্ত বিহারশরিফে পৌঁছে (ুধা নিবৃত্তির সামান্য ব্যবস্থাটুকু করা হয়ে উঠল না। এক পেয়ালা চা পর্যন্ত নয়। বাস টার্মিনাসের কাছে তেমন হোটেল রেস্তোরা দেখতে পেলাম না। যে দুচারটে দোকান নজরে এল, তা আবার আমাদের শহুরে চোখে পছন্দ হল না। ভবানীপুরের বনফুল না হোক রাসবিহারীর শোভা রেস্টুরেন্ট তো আশা করতেই পারি। কিন্তু ওই যে বলে না, ধন্য আশা কুহকিনী!

অপ্রশস্ত রাস্তায় রিক্সা ট্যাক্সি আর অনেক মানুষের জটলা। মুসলমানদের কি এক পরব চলছিল তখন। সেকারণে বিশাল জনসমাগম। খুব বিরক্ত(লাগছিল।

বিহারশরিফে মুসলিম সিদ্ধপু(ষ মালিক ইব্রাহিম বায়ুর দরগা আছে। পির পাহাড়ীর ওপর। আছে আরো একজন সিদ্ধপু(ষ মখদুম শাহ সরফুদ্দিন মনেরীর দরগা। নদীর কাছাকাছি সেসবের অবস্থান। ফলে এলাকাটি ইসলামী তীর্থস্থানও বটে। ভক্ত(মুসলমানদের তাই এত ভিড়। অতীতে এখানে ছিল বিশাল বৌদ্ধবিহার। ওদন্তপুর বিহার। কথিত আছে পাল রাজবংশের মহারাজ গোপালদেব ওদন্তপুব বিহার স্থাপন

করেন। তিনি ছিলেন পাল বংশের প্রথম রাজা — রাজত্বকাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষভাগে। মতান্তরে বিহারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন পরবর্তী কালের ঐ রাজবংশের মহারাজ ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃঃ)। অন্য এক কাহিনী অনুসারে এক বৌদ্ধ উপাসক কোন অলৌকিক উপায়ে প্রভূত স্বর্ণ সংগ্রহ করে বিহার নির্মাণ করেন এবং রাজা দেবপালকে সমর্পণ করেন।

আচার্য শীলর(িত এই ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাঙ্ঘিক ছিলেন। দশম-একাদশ শতকের সন্ধি(ণে পূর্ব বাংলার বিত্র(মপুরের রাজপুত্র চন্দ্রগর্ভ তাঁর কাছে ভি(দী(া গ্রহণ করেন। দী(ার পর তাঁরই নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ১১৯৭ সালে মুসলমান আত্র(মণে ওদন্তপুর বিহার এবং অন্যান্য বিহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ওদন্তপুর বিহারের খ্যাতির দৌলতেই নাকি এতদঞ্চলের নাম হয়ে যায় বিহার। তিব্বতের ইতিহাসে বিহার অঞ্চল ওদন্তপুর বা ওতন্তপুরী নামে বর্ণিত। কথাটি এসেছে উদ্দণ্ডপুর থেকে। অন্য মতে বিহারে অনেক বৌদ্ধবিহার ছিল। মুসলমান শসকদল বৌদ্ধবিহারগুলোকে মনে করত এক একটি দুর্গ। তারাই অঞ্চলটিকে বিহার নামে অভিহিত করে। কালে কালে বিহার পরিচিতিই প্রাধান্য লাভ করে।

৩। রাঁচি থেকে যাত্রা

সেই সকাল নটায় রাঁচী রেলওয়ে মেসের প্রসিদ্ধ রসুয়ে নরেশচন্দ্রের ডালভাত আর ডিমসেদ্ধ গলাধঃকরণ করে স্টেশন রোডে হাজির হয়েছি। বিহার রোড ট্রান্সপোর্টের বাস টার্মিনাসে। রাঁচি-পাটনা বাস ধরতে হবে। গন্তব্যস্থল বিহারশরিফ। সেখান থেকে যাওয়া হবে লোকাল বাসে করে রাজগৃহে।

মানিকদা মানে মানিক চত্র(বর্তী, রবীন বল আর মেজদা অফিস থেকে ছুটি নিয়ে কোলকাতার বাড়িতে। মেসে তখন বিনোদ হালদার, শ্যামল রায় আর শ্যামাদাস গাঙ্গুলি — এই তিনজনমাত্র বোর্ডার। রোববার ছুটির দিন। বাসে তুলে দিতে বিনোদদা আমাদের কিটব্যাগ হাতে তুলে নিল। কমলেন্দু আর শ্যামলদা মিলে বেডিং বয়ে আনল।

টিকিট কেটে বাসে উঠতে উঠতে ভাবছি বসার আসন জুটবে কি না কে জানে? অনেকটা পথ। বসতে না পেলে এতটা পথ দাঁড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর।

মানিকদা পই পই করে বলে দিয়েছিলেন — ডানদিকের জানালার ধারে বসতে হবে, বুঝলে। না হলে রামগড়ের ঘাট সেকশন দেখতে পাবে না। চলতে চলতে চোখে পড়বে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। পাহাড়ের শরীর জড়ানো আঁকাবাঁকা পথ। বাঁদিকে বসলে দেখতে পাবে শুধু পাথরের দেয়াল।

সেজন্যেই তো তাড়াহুড়ো করে ঘন্টাখানেক সময় হাতে নিয়ে বাস ধরতে আসা। গতকাল টিকিট কাউন্টারের ভদ্রলোক অবশ্য আ(াস দিয়েছিলেন — নটার মধ্যে চলে এলে ঠিক বাসের সিট পাওয়া যাবে। আর যদি পাওয়া না যায়, তবে আমার কাছে চলে আসবে।

শেষ পর্যন্ত দুখানা সিট পাওয়া গেল বটে তবে একটাও জানালার পাশে হল না। আলাদা আলাদা বসতে হল অন্য যাত্রীর পাশে। দুজনকেই। কমলেন্দু বলল — ওতেই হবে। বরাতে যখন যা জোটে তাই সই।

ড্রাইভার-সাহেবকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল বিহারশরিফ পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল চারটে কি পাঁচটা বেজে যাবে। তার মানে সাত থেকে সাড়ে সাত ঘন্টা বাসজার্নি করতে হবে। ওখান থেকে যেতে হবে রাজগীর। বেশী রাত হলে তো অচেনা জায়গায় পা বাড়ানো মুস্কিল হবে। রাতের আশ্রয়ের জন্যে জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে।

এমন সময়ে সকলে হৈহৈ করে সকলে বাসে উঠল। বাস চলতে শু(করল ঠিক সাড়ে নটায়। বিনোদদা আর শ্যামলদাকে হাত নেড়ে বললাম — গুড বাই, পাঁচদিন পরে ফিরে আসছি। মানে শুত্র(বার।

সেদিন ফিরে আসতেই হচ্ছে কেননা পরদিন শনিবার আমাদের কোলকাতা ফেরার ট্রেন ধরতে হবে। বুঝতে পারছি, মেসে ফিরে বিনোদদা-শ্যামলদার খারাপ লাগবে। ঘরগুলো ফাঁকা হয়ে গেল একেবারে। দু'দিন বেড়াতে এসে এমন হৈ হুল্লোড় করেছিলাম দু'জনে যে, ওরা আমাদের প্রায় ছাড়তেই চাইছিল না। বিদেশে চাকরিবাকরি করা মানে কোন রকমে দিনগত পাপ(য়।

— সে তুমি যাই বল না কেন, ওদের কোন এন্থু নেই। এতদিন রাঁচিতে আছে অথচ মোরাবাদি হিলে যায়নি একদিনও! হতে পারে? বড্ড ঘরকুনো টাইপের ওরা।

— শুধু মানিকদা ব্যতিত্র(ম।

এ ব্যাপারে আমাদের দ্বিমত নেই। সত্যিকারের ভ্রমণবিলাসী মানুষ। রোজ অফিস থেকে ফিরে এসে খোঁজখবর নিতেন। জিজ্ঞাসা করতেন — আজ কোথায় বেড়ানো হল। তারপর টিফিন খেতে খেতে পরামর্শ দিতেন — এখানে যাও, ওখানে যাও। বাকিরা সকলেই ঘরকুনো। এমন কি মেজদা মুকুন্দলালও। এরা পূর্ব রেলের দপ্তরে কী সব আঁকাবুকির কাজকর্ম করেন।

সাঁওতাল পরগনার মধ্যে রাঁচি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। উচ্চতা বেশি নয় — মাত্র ২০৬৯ ফুট। শীতের মরশুমে চমৎকার স্বাস্থ্যকর জায়গা হিসেবে খুব নামডাক। দুটি পাহাড় আছে — পশ্চিমদিকে রাঁচি হিল এবং উত্তরে মোরাবাদি হিল। অন্য নাম টেগোর হিল। মধ্যে রাঁচি লেক — রাঁচি পাহাড়ের নিচে। পাঁচ মাইল দূরে কাঁকে। সেখানে রয়েছে রাঁচির বিখ্যাত উন্মাদ আশ্রম।

দা(ণ দুটি জলপ্রপাত আছে কাছাকাছি — হুড্রু আর জোনহা ফলস। হুড্রু সাতাশ মাইল এবং জোনহা চব্বিশ মাইল দূরে। হুড্রুতে তিনশ বিশ ফুট উচ্চতা থেকে ভীমগর্জনে জল আছড়ে পড়ছে নিচের খাদে। উপর থেকে দেখতে রীতিমতো ভয় লাগে। জোনহা বা গৌতমধারার জলপতন সে তুলনায় অনেক কম — মাত্র একশ চল্লিশ ফুট। উপর থেকে জল পড়ে নিচের কুণ্ডে। তারপর নাচতে নাচতে গড়িয়ে গিয়ে ছোট্ট করে আরেকবার ঝাঁপ দিয়েছে নিচের ধরাতলে। সেখানে পৌঁছনো যাওয়া যায় সহজে।

কাছাকাছি আরো অনেক জলপ্রপাত আছে শুনেছি। দশম ফলস, হিরনি ফলস। কিছুদূরে নেতারহাট — এককালের সাহেবী ভাষায় কুইন অব ছোটনাগপুর। রাঁচি থেকে সাতানব্বুই মাইল দূরে। উচ্চতা ৩৬২২ ফুট। নিষ্পাপ শান্ত প্রকৃতির দেখা মেলে। নেতারহাটের ট্যুরিস্ট বাংলো বা পালামৌ বাংলো থেকে সূর্যোদয় এবং ম্যাগ্নোলিয়া পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত নাকি সাংঘাতিক দেখায়। ১৫৬ মাইল দূরে পালামৌ। সঞ্জীবচন্দ্রের লেখনীতে খ্যাত সেই পালামৌ। অন্য নাম বেতলা। বন-পাহাড়ে ঘেরা বেতলা জঙ্গল।

আমাদের তখন নেতারহাট যাওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তার বদলে মানিকদার পরামর্শমতো একদিন ঘুরতে গেলাম আমঝরিয়া। নেতারহাট যাওয়ার পথে পড়ে।

আমঝরিয়া! কী মিষ্টি নাম। তেমনি অপূর্ব জায়গা। পাহাড়ে, অরণ্যে, লালমাটিতে, সবুজ নির্জনতায় অনন্য। মধুমাখা। কালো বন্য সাঁওতাল মানুষগুলোকে কেমন আদি ও অকৃত্রিম মনে হয়। একেবারে প্রকৃতির নিজস্বতায় গড়া মাটির মানুষ।

বাসটা রাঁচি থেকে যাত্রা করে প্রথম থামল রামগড়। ত্রিশ মাইল পথ। ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজে।

একটু আগে চলে গিয়েছে সেই সর্পিল পাহাড়ী রাস্তা। ঘন শালবনের বুক চিরে পথ। বাস তখন উঁচুতে উঠছিল। ডাইনে বাঁয়ে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছিল। পিচঢালা পথ দ্রুত পেছনে হারিয়ে যাচ্ছিল।

ঘাট সেকসনের নাম জানা গেল চুটু-পালুঘাট। দৈর্ঘ্যে সাত মাইল। রাঁচি থেকে বিশ মাইল দুরে ঘাটের অবস্থান। পাহাড়ের পদপ্রান্ত ছুঁয়ে একটা কালো শরীর খুব দ্রুত অঙ্গ ভঙ্গিমায় নেচে নেচে এগিয়ে চলেছে। এই একটু উঁচুতে উঠছে, তারপরেই নিচে নেমে যাচ্ছে।

ছোটনাগপুর এলাকা মানেই তো কালো পাথর আর লাল মাটির বন্ধুর প্রকৃতি। তার মধ্যেও এক আশ্চর্য শান্ত স্নিগ্ধ রূপ আছে। সেই রূপে মন প্রসন্ন হয়। এক মধুর শ্রী আছে। তা নির্বাক বিস্ময়ে দেখতে ভালো লাগে। এর মোহময়ী লাবণ্য তীব্র আকর্ষণ করে। অযথা উদ্দাম করে তুলতে পারে। যেমন এর প্রকৃতি তেমনি এখানকার সাঁওতাল মানুষেরা। সরল নিষ্পাপ জীবনযাত্রা। জীবনধারণের সামান্য রসদটুকু জুটলেই হল। তারপর বাকি থাকে মহুয়া, নাচ আর গান।

যেতে যেতে একটা বাঁকের মুখে এসে পড়েছি। বাঁ দিকে পাথরের স্তূপ আর ডানদিকে পাহাড়ের ঢল নিচে আরো নিচে নেমে গিয়েছে — দিগন্ত জোড়া উন্মুক্ত(প্রান্তরে। উদার প্রকৃতির কাছে। পাথরে পাহাড়ে বন্দী নয়ন হঠাৎ অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে পড়ে যেন অভিভূত। মহান শূন্যতার ডানায় স্বাধীনতার অপার আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।

পথটা অর্ধবৃত্তাকার ঘুরে বাঁক নিয়ে চলেছে। মাঝখানে গভীর খাদ সবুজ গাছপালায় ভরা। আরো নিচে রক্তি(ম প্রান্তর। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। দূর দিগন্ত অবধি। সবুজ রঙের বাহার কিছুটা এগিয়ে কেন যে লাল হয়ে উঠল কে জানে! কোন লজ্জায়? অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে রূপোলী রেখা। নিশ্চয়ই কোন জলধারা। দিগন্তে মাঝে মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে উঁচু পাহাড়ের রেখাচিত্র। সাদা কুয়াশার মেঘ সবটা কাটে নি। তার মধ্যে সোনালী রৌদ্রের ঝিকিমিকি। সব মিলিয়ে আমাদের কাছে মনে হচ্ছিল প্রকৃতি এখানে যেন অপ্সরার সাজে। যদি একটু থামা যেত, বেশ হত।

কমলেন্দু পাশের মানুষটির সঙ্গে গল্প জমিয়ে দিয়েছে। কথা বলার মাধ্যম হিন্দি নয় বলেই সম্ভব হয়েছে। উনি হাজারিবাগে কর্মরত। একদা চাকরি সূত্রে নানা জায়গায় ঘুরে

বেড়িয়েছেন। অল্পবয়সী দুই যুবকের ঘুরে বেড়ানোর ঝোঁক দেখে তার বোধহয় খুব ভালো লাগছিল।

পাহাড়ের বুকের ওপর রামগড়।

রামগড় থেকে রাতু রোডের মোড় পার হলে তিনি ীণ জলধারা দেখিয়ে বললেন তার নাম দামোদর। সমতলে নেমে এই নদীই কি সেই ভয়াল দামোদর যা সাঁতরে পার করেছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই? এখানে সে তো ঝর্ণা — এক দামাল পাহাড়ী স্রোত। পাত্রাতু থেকে মানিকদারা নাকি একবার দামোদরের উৎস দেখতে বেড়িয়েছিলেন। রামগড় থেকে পাত্রাতু ত্রিশ মাইল হবে। উৎসটির স্থানীয় নাম চুলাপানি। এমন নামকরণের পিছনে নাকি কাহিনী আছে। কোন এক সন্ন্যাসী সারাদিন জপতপের পর দিনান্তের আহার্য তৈরী করতে বনের এক জায়গায় চুলা বানাতে মাটি খনন করছিলেন। সেই গহ্বর থেকে হঠাৎ উথলে উঠেছিল জলধারা। চুলা বানাতে গিয়ে পানি মিলল বলে তার নাম হল চুলাপানি। সমতলে তার নাম দামোদর।

কমলেন্দু তর্ক করেছিল — দামোদর পেরেনিয়াল রিভার, ওর উৎস একটা নয় অনেক। তাহলে চুলাপানি নামে কোন একটা উৎস হবে কি করে?

— হয়তো অনেক উৎসের মধ্যে চুলাপানিও একটি উৎস ছিল। আর সবচেয়ে বেশী উঁচুতে এর অবস্থান। তাই তাকে প্রধান উৎস বলা। মানিকদা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

কমলেন্দুর সহযাত্রী ভদ্রলোক চলতে চলতে হাজারিবাগের সং(প্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন। হাজারিবাগ স্বাস্থ্যকর জায়গা। উচ্চতা হাজার দুয়েক ফুট হবে। তিন মাইল দূরে ক্যানারি হিল। সানরাইজ-সানসেট দেখার জন্য চমৎকার। পার্ক-অবজার্ভেটরি-লেক আছে। খুব বেশি দূরে নয়। হাজারিবাগের মূল আকর্ষণ নিশ্চয়ই অভয়ারণ্য। এদিকে বনাঞ্চল তো ছিলই। ১৯৫৪ সালে জন্ম হয় হাজারিবাগ জাতীয় উদ্যানের। শহর থেকে বারো মাইল দূরে পঁচাত্তর বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থান। ষোলো নম্বর জাতীয় সড়ক যাচ্ছে সেই অরণ্যের বুক চিড়ে। বাঘ-চিতাবাঘ আছে, সম্বর-নীলগাই-চিতল আছে। বন দপ্তর থেকে অরণ্য-দর্শনের ব্যবস্থাও আছে। তারপর বৈশালী-শ্রাবস্তী-নালন্দা-পাবাপুরী একপ্রস্থ দর্শনীয় জায়গার নাম উল্লেখ করে হাজারিবাগে নেমে গেলেন।

রাঁচি থেকে আমরা চলে এসেছি প্রায় ষাট মাইল। রীতিমতো রেল স্টেশনের মতো বড়োসড়ো বাস টার্মিনাস হাজারিবাগে। গাড়ি পার্ক করার জায়গা আছে, যাত্রীদের জন্যে বিশ্রামাগার আছে, টিকিট (ম, পেট্রোল পাম্প আছে। এখানে বাসের উদরে আরেকপ্রস্থ জ্বালানি তেল ভরা হবে।

বসে থেকে থেকে শরীরটা ধরে গিয়েছে। মিনিট পনেরো গাড়ি থামার কথা এখানে। বেডিং গাড়ির মাথায় ঠিক আছে তো? নাকি মাঝপথে বিদায় নিয়েছে? ঝুড়ি নিয়ে

বিত্রে(তা এসেছে – সুপক্ক কদলী আর কি কি সব ঘরে তৈরী করা খাবার। যতই হাঁকাহাঁকি ডাকাকাকি ক(ক ওরা, আমরা বদ্ধকালা – ইচ্ছে না করলে আমরা কিছুই শুনতে পাই না। খাদ্যের ব্যাপারে সন্ন্যাসীর মতো পরম উদাসীন থাকতে হবে। কারণ ভাঁড়ে মা ভবানী।

হাত পা ঝাড়া দিয়ে আবার বাসে উঠে বসা হল। এবার আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসতে পেরেছি। কমলেন্দু সহযাত্রীর থেকে সদ্য সংগ্রহ-করা সংবাদ পরিবেশন করতে শু(করল একে একে।

– আরো দুটো ঘাট সেকসন পেরোতে হবে, বুঝলে? একটা দু মাইল লম্বা, অন্যটি তেরো মাইল। তাছাড়া চলতে চলতে হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক আর ক্যানারি হিল দেখা যাবে।

রামগড় থেকে গোলা-ধানবাদের দিকে যে পথ গিয়েছে সেপথে রয়েছে এদিককার নামকরা ঘাটসেকসন – রাজরাপ্পা। তেপ্পান্ন মাইল দীর্ঘ ঘাট। রাজরাপ্পায় আছে ছিন্নমস্তার মন্দির। সতীর একান্ন পীঠের মধ্যে এক পীঠ হিসেবে প্রসিদ্ধ। একটি ফলসও আছে। না, দেখা হবে না আমাদের। হাজারিবাগের ন্যাশনাল পার্কও দেখা হবে না।

দেখতে দেখতে অভয়ারণ্য এসে গেল। শাল-পিয়ালের বন। সবুজ বনের পাশ দিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু এখানে আমরা থাকতে পারছি না। আপশোস আপশোস!

দিনের আলোয় বনের শোভা একরকম। আর রাতে বেলা আরেক রকম। মনে মনে কল্পনা করতে বসলাম – এক্দিন বন দেখতে এসেছি(খুব একচোট লুচি-মাংস সাঁটিয়ে চাঙা হয়ে মধ্যরাতে বেড়িয়েছি জিপ নিয়ে। টর্চ-সার্চলাইট-ছুরি-সটগান নিয়ে তৈরী হয়ে। জিপের তীব্র আলোয় বনের জন্তুরা ধরা পড়ছে। বাঘের খোঁজ চলছে। তার দেখা পাওয়া যায়নি তখনো। তবে খুব শীগগির পেয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে। মেসের দত্তমশাই বলেছিলেন – হাজারিবাগে চার-পাঁচটা টাওয়ার আছে। সেখান থেকে সার্চলাইটের আলো ফেলে বনের জন্তু দেখানো হয়। অবশ্য যদি ভাগ্য ভালো থাকে তবেই তাদের দর্শন মেলে। বেশির ভাগ সময় ভাগ্য সদয় থাকে না। তাইতো জিপ নিয়ে যাওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু বাঘের তো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুতেই না।

৪। পরিচয় পর্ব

অন্ধকারে বিহারশরিফ থেকে রাজগৃহের দিকে বাসটা ছুটছে। পনেরো মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। কত আর সময় লাগবে?

নি(মাসি জিজ্ঞাসা করলেন – তোমরা কোথায় থাকবে বাবা? ঠিক করা আছে কিছু?

– না না মাসিমা, সেসব কোন ব্যবস্থা করে আসিনি। আগে পৌঁছই তারপর সে সব ভাবব। কোথায় থাকব, কি খাব, অত হিসেব করে বাইরে বেরিয়েছি নাকি? জবাব দিই আমরা।

আমাদের গভীর বি(োস, কোন রকম পূর্বপরিকল্পনা না করে যদি বাইরে বেরোনো হয়, তবে তার উন্মাদনা হয় আলাদা স্বাদের। ধরাবাঁধা ভ্রমণ, (টিনমাফিক চলা – এ সব একঘেয়েমিতে ভরা। সে তো দিনরাত মাস-বছর জুড়ে আছেই। আমরা চাই বরাদ্দের বাইরে যেতে। বাঁধনহারা পথে চলতে। পথের কড়ি জুটলেই বেরিয়ে পড়তে। ঘরের চৌহদ্দির বাইরে। চাই স্রোতের টানে ভেসে যেতে। ইচ্ছেটা আছে, তবে সত্যি কথাটা হল, পুরোপুরি বোহেমিয়ান হওয়ার মতো সাহসও ছিল না। কিছুটা হওয়া গিয়েছিল মাত্র।

– ছেলেদের আবার কি! বেরিয়ে পড়লেই হল। ওদের তো এই সুবিধে। অনেক(ণ পরে সুরমাদি কথা বললেন। কোলের উপর আদর খাচ্ছে পোটলা। তার মধ্যে বাংলা হারিকেনের মস্তক উঁকি দিচ্ছে।

কমলেন্দু প্র(করল – নীতাদি, আপনারা উঠছেন কোথায়? ঘর আগে থেকে ঠিক করা আছে বুঝি?

– হ্যাঁ মোটামুটি একটা ব্যবস্থা আছে। আমরা প্রথমে তো রাজগীরেই এসেছিলাম। তারপর পাটনা চলে যাই। এখন পাটনা থেকে ফিরছি। যে বাড়িতে আগে ছিলাম, সেখানেই উঠব ভাবছি। সিংজির বাড়ি। না হলে পাণ্ডেজির বাড়ি। একটা না একটা আস্তানা জুটে যাবে ঠিক।

ওনাদের কাছ থেকে যতদূর জানা গেল – রাজগীরে থাকার জায়গা আছে অনেক। অল্প মুদ্রার বিনিময়েই কোন-না-কোন মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ধর্মশালা আছে। বিলাসবহুল ব্যবস্থাদি তো আছেই। আমরা অবশ্য বিনে পয়সায় বাস করার খদ্দের। কোন রকমে চারটে দিন কাটাতে হবে। রেলস্টেশন-মন্দির-মসজিদ যেখানে হোক। নিতান্ত নি(পায় হলে ঘরভাড়া করতে হবে। নয়তো ঘরভাড়া করা নেই আমাদের অভিধানে।

কমলেন্দু অনেক(ণ ধরে তাল খুঁজছিল কিছু একটা বলবে বলে। ফাঁক পেয়ে আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল — একটা কথা বলব দিদি, কিছু মনে করবেন না যেন। আপনারা কি মিস্‌ট্রেস্? মানে স্কুল-শি(য়িত্রী?

হঠাৎ এমন প্র(ের জন্যে কেউ তৈরী ছিল না। প্রমীলাদল একটু থমকে গেল। তারপর তুমুল হাসিতে গড়িয়ে পড়ল চলন্ত বাসের সিটের ওপর। শীতের জড়তা কাটিয়ে বাসটা যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। অন্য সহযাত্রীরা হতচকিত।

ভয়ানক হকচকিয়ে গেলাম। কলেজি ভাষায় বলতে হয় — বামা হয়ে গেলাম। ধা করে অমন একটা প্র(করা যায় কি না সেটাই ভাবার ব্যাপার। বিশেষত সামান্য পরিচিতা ভদ্রমহিলাদের কাছে এবং তাদের সম্পর্কেই । ব্যাপারটা স্থানকাল সূত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে না?

ওদিকে মেয়েমহল হেসেই চলেছে তো হেসেই চলেছে। বিরাম নেই তার। হাসতে হাসতে একজন কোনরকমে বলতে পারল — কি যা তা বলছ তোমরা? আমরা মিস্‌ট্রেস? গায়ে লেখা আছে নাকি? অ্যাঁ? কি দেখে তোমাদের মনে হল?

সত্যিই তো মিস্‌ট্রেসদের গায়ে কি তা লেখা থাকে যে তারা মিস্‌ট্রেস! নিজে ভালোমানুষ সাজতে বলতে গেলাম — আমি নয়, আমি নয়, ও বলেছে। হাসির তোড়ে সেসব কথা ভেসে গেল খড়কুটোর মতো।

একটু দম নিয়ে নীতাদি বললেন — সত্যি বল না, কি দেখে মনে হল তোমাদের যে আমরা সকলে মিস্‌ট্রেস?

— এমনি মনে হল তাই বললাম। কমলেন্দু বেকায়দা দেখে তখন পুরো ডিফেন্সে চলে গিয়েছে।

ছেলেটা বলে কি! এমনি মনে হল আর অমনি বলে ফেললে? রাঁচি বেড়াতে এসে পাগলা গারদের কোন বিশেষ প্রভাব পড়ে নি তো? হ্যাঁ, ওর আবার কি সব অদ্ভুত ব্যাপার স্যাপার আছে। এই যেমন, ও নাকি যখন তখন এমনি এমনি দুম করে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। পারে নাকি? সে পরী(া করিনি আমরা। কলেজের জিগরি দোস্ত অশোক মোতায়েদ তো শুনেই হাতজোড় করে বলেছিল — দোহাই তোমার, এ সব ঝক্কির কি দরকার! সোজা কথায় বল, সিনেমা দেখিয়ে দিচ্ছি।

তা সেরকম কোন বিদঘুটে মতলব করেনি তো তলে তলে? ঠিক ঠাহর করতে পারছি না। পিছন থেকে দলের সর্বকনিষ্ঠা কন্যাটি কলকল করে উঠল — আমি বলব? দিদির এই কালো চাদর দেখে আপনার মনে হয়েছে। তাই না?

তারপর হি হি করে হাসতে হাসতে বলল — কালোদিদির গায়ে কালো চাদরখানা খুব মানায়। ঠিক মনে হয় দিদিমণি।

বুঝলাম ফর্সা ভদ্রমহিলার আদুরে নাম কালোদিদি। মনে হচ্ছে এরকম নামকরণ হওয়াই যথাসঙ্গত। না হলে ঠিক রঙের কনট্রাস্ট হত না।

— অসভ্যতা করবে না। কালো চাদর গায় দিলেই কেউ মিস্‌ট্রেস হয় নাকি? অ্যাঁ? গম্ভীরস্বরে কনিষ্ঠাকে ধমকানোর চেষ্টা করলেন বটে কিন্তু বেশি(ণ গাম্ভীর্য ধরে রাখতে পারছিলেন না। আবার কলকল হাসিতে গড়িয়ে পড়লেন।

আমাদের দিকে তাকিয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন চাইলেন — কি হাবা মেয়ে দেখেছ? সাধে কি বলি হাবা দি গ্রেট!

কমলেন্দুর সঙ্গে আমিও নির্বোধের মতো দন্তকৌমুদী বিকশিত করে বসে রইলাম। তা ছাড়া আর কিই বা করা যেত!

কিছু(ণ পরে উনি নিজেই বললেন — তবে তোমরা খানিকটা ঠিকই ধরেছ। আমি স্কুল-মিস্‌ট্রেস। ওরা কেউ নয়। সুরমা আর আমি একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি। ও আমার বন্ধু। আর অদিতি আমার ছাত্রী।

অন্ধকার পথ। হু হু করে বাস ছুটছে। গোটা বাস জুড়ে তীব্র ঝাঁকুনি। নড়বড়ে বাসের গঠন আর কলকবজার তীব্র ঝঞ্ঝনায় ভালো করে কথা বলা যাচ্ছে না। যাত্রীসংখ্যা সামান্য। কণ্ডাক্টর নালন্দা নালন্দা বলে চীৎকার করে উঠল। আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। নালন্দা? নালন্দা এখানে নাকি? সেই ইতিহাস-খ্যাত নালন্দা? কবে আসা হবে এখানে? আগামীকাল না পরশু?

বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। শীতার্ত বাতাস সূচালো বল্লম হয়ে বিঁধছে। নিস্তার পাওয়ার জন্যে বাসের দরজা-জানালায় চট ঝোলানো হয়েছে। বাইরের দৃশ্য চোখে পড়ছিল না তাই। টুকটাক কথা হচ্ছে। বাড়ির কথা হচ্ছে। রাঁচিতে বসে ভাইয়ের চিঠি পেয়েছিলাম। ভাইবোন সকলে এমনিতে ঠিক আছে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা শুধু। কোলকাতা থেকে এখন আমরা কতদূরে?

অদিতি বসেছিল একলা, বাসের পিছনের সিটে । একটু পরে নীতাদির পাশে উঠে এল। আর তার পেছনে মুখ লুকিয়ে হেসে লুটোপুটি যাচ্ছিল। কি ব্যাপার? নিশ্চয়ই নেপথ্যে আরেকটি চমকপ্রদ ঘটনা আছে। ঠাহর করতে পারছি না।

নীতাদি ধমকে উঠলেন কৃত্রিম কোপে — ও কি, বোকা মেয়ের মতো শুধু শুধু হাসছ কেন? দেখছ তো কেমন হেসে চলেছে। হাবা কোথাকার।

— ঠিক আছে, আমি হাবা দি গ্রেট(বারণ করেছি নাকি। তবে তার আগে আগের বাসটায় কি হয়েছিল বলুন। অদিতি বলে।

— ও মেয়ে সে জন্যে হাসছ! সত্যি সে এক কাণ্ড বটে। মুহূর্তের মধ্যে নীতাদিও ত্র(মশ হাসতে হাসতে ঝর্ণা হয়ে গেলেন। না, এই হাসির জন্যে তাকে হাবা বলা যাচ্ছে না। একজন দিদিমণিকে হাবা বলার সাহস আমাদের নেই।

সুরমাদি অসুস্থ বলে হয়তো হাসির প্রতিযোগিতায় সমানে পাল্লা দিতে পারছিলেন না। আমরা দুই সখা দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। মনে মনে বলছি – কি ব্যাপার বুঝছ কিছু? হাসির জলস্রোত বইছে তো বইছে। বাঁধ না দিলে এ প্রবাহ (দ্ধ হবে না।

প্র(্ন করলুম – কি হয়েছিল আগের বাসে, বললেন না তো? ব্রেকডাউন?

– না না দাঁড়াও দাঁড়াও বলছি।

বেগ দমন করে নীতাদি বলতে শু(করলেন – জানো তো আমরা বিহারশরিফ থেকে এর আগের বাসটায় উঠেছিলুম প্রথমে। ওঠা থেকেই গাড়ীর কণ্ডাক্টর এমন জঘন্য ব্যবহার শু(করে দিল যে কী বলব। সে কি অসভ্যতা – ভাবতে পারা যায় না। একে গাড়িতে তুলছে, ওকে হৈ হৈ করে বাস থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। সে এক বিরাট হট্টগোল লাগিয়ে দিচ্ছিল। গাড়িটা যেন ওর জমিদারী। হঠাৎ আমাদের পাশে ধপ করে বসে পড়ল। বোঝ – একেবারে গায়ের উপর ধাক্কা দিয়ে। ধমক দিতে গেলুম তো সে উল্টে আমাকেই চোখ রাঙায়।

– সে কি! অন্য যাত্রীরা কিছু বলল না?

– ধুর! কে এই মুলুকে প্রতিবাদ করতে যাবে? যা সব চিজ এদিককার লোকজন! তা হলেই হয়েছে আর কি!

সুরমাদি বললেন – শুধু কি তাই! কনুই দিয়ে আমাকে এমনি এমনি করে গুঁতো দিচ্ছিল। এমন ছোটলোক পথেঘাটে দেখিনি। কিছু বলতে গেলে উল্টে আবার চেঁচামেচি করে! বোঝ কাণ্ড।

– তাহলে তো ভয় পাওয়ার মতোই কথা।

ফস করে এই সব কথার মধ্যে অদিতি নিজেকে জাহির করল – হি হি, জানেন দিদি তখন কোমরে একটা ছুরি গুঁজে রেখেছিলেন।

– হ্যাঁ রেখেছিলাম তো। রাখব না কেন বল, মেয়ে বলে যা তা অসভ্যতা করে যাবে আর আমরা চুপচাপ মুখ বুজে সহ্য করে যাব? অত ভীতু নই। বেশি চালাকি চলবে না আমার কাছে – আমিও দেখে নেব বলে তৈরী।

– তারপর কি হল?

– কি আর হবে! বাস থামিয়ে নেমে গেলাম। বললাম কণ্ডাক্টরের নামে রিপোর্ট করব অফিসে গিয়ে।

– তা রিপোর্ট করেছিলেন?

– না, শেষ অবধি আর করা হল না। অফিসের কয়েকজন খুব অনুরোধ করল রিপোর্ট না করার জন্যে। আমিও ভাবলুম কি লাভ লোকটাকে বিপদে ফেলে। আমাদের তো কোন (তি হয়নি। ম(কগে ছাই।

ভাবলাম – তা বেশ করেছে কণ্ডাক্টরটি। ভাগ্যিস সে অভদ্র শ্রেণির লোক ছিল! তাই তো দেখা হল এদের সঙ্গে। আমাদের বাসটাও যে বিহারশরিফ পৌঁছতে দেরি করেছে, এখন মনে হচ্ছে, তা যেন শাপে বর হওয়া। বিদেশে উপযুক্ত(সঙ্গীসাথী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার! তার উপর আবার এমন নিখাদ প্রমীলা বাহিনী!

মনে মনে হাসছি একটু আগেকার কথা ভেবে। আমাদেরও এক মজার কাণ্ড হয়েছিল। এনাদের নিয়েই। রাঁচির বাস থেকে নেমে তখন সিমেন্ট বাঁধানো সিটের ওপর বেডিং কিটব্যাগ তুলে বসেছিলাম বিহারশরিফ বাস স্ট্যাণ্ডে। খোঁজখবর নিচ্ছি কখন বাস ছাড়বে। টাইমটেবিল বলছে এখন নিশ্চিন্তে ঘন্টাখানেক সময় অপে(া করা যায়। দুই বন্ধু পরামর্শ করছি – রাজগীর না গিয়ে বিহারশরিফে থেকে গেলে কেমন হয়? তোফা বাঁধানো বেঞ্চি আছে। মাথার ওপর চমৎকার ছাউনি আছে। সময়পাল মানে টাইমকিপারের ঘরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখা গেল, জনমানব নেই।

কমলেন্দুর সঙ্গে বাসের জন্য অপে(ারত দু'জন বাঙালির আলাপ হল। তারা রাজগীর থেকে ফিরছে। পাটনা যাবে। তারা বলল – মালপত্র সঙ্গে আছে কিছু? সাবধানে রাখবে। আর ঘরের কথা জানতে চাইছ ? সে পেয়ে যাবে একটা কিছু।

কি ছাই জিনিস আছে যে চব্বিশ ঘন্টা পাহারা দিতে হবে? জিনিস বলতে দু'জনের দুটো কিটব্যাগ। পাশের সিটে কয়েকজন মহিলা বসেছিলেন। কমলেন্দুকে বললাম – দ্যাখো তো ওনারা বাঙালি কি না! মনে হচ্ছে স্বজাতীয়া হবে।

– আমারও তাই মনে হচ্ছে, পিওর বাঙালি।

– তবে যাও না সোজাসুজি জিজ্ঞেস কর।

– যাব বলছ? শেষটায় যদি না হয় তখন কি বিশ্রী অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? না বাপু আমি ও লাইনে নেই।

– এই জন্যেই বলে বাঙালি ভীতুর ডিম।

– বেশি লেকচার দিও না। তুমি গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারছ না? বসে বসে লেজ নাড়ছ যে বড়ো।

– চটিতং কেন? শান্তি শান্তি। আচ্ছা, দুএকটা কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কি বলো?

– তাই দ্যাখো না হয়।

প্রমীলা সিটের সামনে দিয়ে ঘুরে এলাম, পেছন দিক দিয়ে চক্কর দিলাম। না, এমন একটা কথাও কানে এল না যাতে বোঝা যায় ওনারা বাঙালি। অথচ কলকল্লোলিনী মহিলারা মোটেই চুপ করে বসে নেই। দিব্যি কলকল করে কথা বলে চলেছেন। দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। যেই কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি, ব্যস অমনি কথা

বন্ধ। চাদরে মুখ ঢেকে হাসছে। কথা বন্ধ করে। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করার সাহস নেই। অদূরবর্তিনীদের সম্পর্কে এই সামান্য খবরটা সংগ্রহ করতে চূড়ান্ত রকমের ব্যর্থ হলাম।

এমন সময়ে রাজগীরের বাস এসে পড়ল। আর দুদ্দাড় করে বাসে ওঠার জন্যে ছুটতে হল। একটু পরেই ওনারা বাসে উঠে এলেন।

এখন বুঝতে পারছি তখন ওনারা সিটে বসে বসে অত হাসছিলেন কেন। অভদ্র কণ্ডাক্টরের কথা আলোচনা করে নিশ্চয়ই। যেন এক রহস্যের সমাধান হল।

৫। রাজগৃহ

বিহারশরিফ থেকে রাজগৃহের পনেরো মাইল দূরত্ব অতিত্র(ম করতে বড় জোর চল্লিশ মিনিট সময় লাগার কথা। ঘড়ি দেখে মনে হচ্ছে প্রায় পৌঁছে গিয়েছি।

নীতাদি বললেন — তোমরা কোথায় থাকবে কিছু ঠিক করে এসেছ? নাকি কোন ব্যবস্থা নেই। যেখানেই থাকো না কেন আগামীকাল কুণ্ডে দেখা হবে। রাজগীর একসঙ্গে ঘুরে দেখা যাবে। কেমন?

— তাহলে তো খুব ভালোই হয়। আমাদের উৎসাহপূর্ণ সমর্থন।

আশ্রয়ের চিন্তা প্রবল হয়ে উঠছে। ধা করে পথে বেড়িয়ে তো পরেছি ডোন্ট কেয়ার করে। কিন্তু মনে মনে ঘোর দুশ্চিন্তা। কোথায় রাত কাটাই! কোথায় থাকি! চারদিক তো মনে হচ্ছে ফাঁকা মাঠ। দু'চারটে আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে বটে তবু বিজন প্রান্তরই হবে চারধারে। ধুধু করছে সবকিছু শীতের কনকনে হাওয়ায়। নিজেকে চাঙা করার জন্যে নিজেকে তবু বলা — হ্যাঁ হ্যাঁ সে দেখা যাবে। হৈচৈ করে রাত কাটিয়ে দেব ঠিক। আরে বাবা, এই না হলে প্রতিভা!

রাজগীর এসে গেল। বাস থামতে অনেকগুলো ছায়া ছায়া শরীর এগিয়ে এল। আবছা অন্ধকার। ভিড় ঠেলে মালপত্র টানাটানি করে নিচে নামানো হয়েছে। কমলেন্দু আর নীতাদি গেল বাসের উপর থেকে বেডিং-স্যুটকেস নামাতে।

— ওঃ, কি বিশ্রী গন্ধ! অদিতি নাক সিঁটকে দূরে সরে গেল।

সত্যি লোকজনের মুখ থেকে ভুরভুর করে নেশার গন্ধ বের হচ্ছে। কটু ঝাঁঝালো গন্ধ।

বাসটা আবার বিহারশরিফে ফিরে যাবে। তাই ওঠার জন্য যাত্রীদের ভিড়। বাক্সবিছানা নামিয়ে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। নীতাদিকে বললাম — আপনারা তাহলে এখন চললেন? কোনদিকে যাবেন?

— এই তো কাছেই। এসো না, একটা এক্কা দেখি। নীতাদি ডাকলেন।

আশেপাশে দুএকটা দোকান দেখা যাচ্ছে। বিবর্ণ চেহারা তাদের। তারের জাল দিয়ে টার্মিনাস এলাকাটি কোনরকমে ঘেরা। এক্কা পাওয়া গেল না। একটা রিক্সা আছে বটে কিন্তু তার চালক নেই। বোধ হয় নেশার ডাকে সাড়া দিতে বেপাত্তা।

ফিরে এসে নীতাদি বললেন — সুরমা, গাড়ি পাওয়া গেল না। হাতে হাতে জিনিসগুলো তুলে নিতে হবে। স্যুটকেস আর বেডিং কুলির মাথায় চাপিয়ে দিচ্ছি।

দুতিনজন কুলি কাছেই ঘুরঘুর করছিল। ডাক শুনে হাজির। একজনের মাথায় প্রমীলা দলের মালপত্র তুলে দেওয়া হল।

শেষবারের মতো নীতাদি বললেন — তাহলে তোমরা কী করবে?

— কী করব এখনো ঠিক জানি না। ধীরেসুস্থে ভেবে দেখি কী করা যায়? বাস টার্মিনাসে থাকাও দেখছি একেবারে অসম্ভব নয়। সিমেন্ট বাঁধানো সিট আছে, মাথার উপরে ছাদ আছে। দিব্যি ঘুমোনো যাবে মনে হচ্ছে।

— এই ঠাণ্ডায়? তার থেকে চলো আমাদের সঙ্গে। আমাদের অবশ্য একখানা ঘর। তা হয়ে যাবে'খন। নীতাদি প্রস্তাব দিলেন।

এমন অযাচিত প্রস্তাবে অবাক হয়ে গেলাম। নিখাদ মহিলাদল কি সদ্য পরিচিত যুবকদের এমন করে তাদের আস্তানায় আশ্রয় দেওয়ার আহ্বান জানাতে পারে? বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি শুনছি তো? কোন দায় নেই অথচ ...

মানুষের মনের বিন্যাস বিচিত্র। অল্প পরিচিত যুবকদুটিকে বোধহয় তাদের মন্দ লাগেনি। মেয়েদের সহজাত চোখ দিয়ে মনে হয়েছিল — বিশ্বাস করা যায়। বিশ্বাস করা গেলে ভরসাও করা যেতে পারে। আমাদের নিজেদের তো সব সময়েই মনে হয় আমরা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। যদিও এতদিন ধরে কেন কোন মেয়ে যথেষ্ট বিশ্বাস করে ঘনিষ্ঠ হয়নি, তার ব্যাখ্যা দিতে পারব না।

দলনেত্রীর বাণী মধুর সুরে রিনরিন করে বেজে উঠল। মনে মনে এরকম ভাবনা যে এক একবার অঙ্কুরিত হচ্ছিল না, তা নয়। তবু তা আশাতীত রকমের অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই আর বেশি ভাবতে সাহস হচ্ছিল না। অবশেষে তেমনই এক অবাস্তব স্বপ্ন আশ্চর্য রহস্যে বাস্তবায়িত হল বুঝি।

কমলেন্দু দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে জবাব দিল — না মানে আমাদের তো আপত্তি নেই কিন্তু আপনাদের অসুবিধা হবে।

— না না আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। নিন চলুন তো। এবার দ্বিগুণ উৎসাহে অদিতি কলকল করে উঠল।

এগোবার জন্য ওনারা প্রস্তুত। আমাদের ভাবখানা যেন অগত্যা কী আর করা! নি(পায় হয়ে যাচ্ছি এনাদের সঙ্গে। এদিকে মনে মনে দা(ণ উল্লসিত। ভদ্রতা করে আর বেশি দ্বিধা-টিধা জানানোর দরকার নেই। এত সহজে আশ্রয় জুটে যাবে আমাদের মতো অভাগাদের, ভাবা যায়? সকলে হাতে হাতে ভাগ করে মালপত্র তুলে নিল।

চলতে চলতে কমলেন্দু জিজ্ঞেস করল নিচু স্বরে — কি কথা বলছ না কেন? খারাপ হল কাজটা?

— জানি না। তবে আপাতত রাতের জন্য তোফা আশ্রয় জুটল এটা তো সবথেকে বড়ো সত্যি।

— একটা জিনিস খেয়াল করলে। নীতাদি আর অদিতি শুধু আমাদের যাওয়ার জন্যে বলল। অন্য দুজন চুপচাপ ছিল।

— হ্যাঁ, ল(্য করেছি। কথা না বাড়িয়ে আজকের রাতটা কাটাও তো দেখি। পরের কথা পরে ভাবা যাবে।

সামনে রাতের ধূসর আকাশ। প্রান্তসীমায় গাঢ় মসিময় পাহাড়ের চালচিত্র। খুব দূরে নয় পাহাড়টি। এর নাম যে বিপুলাচল সে খবর পরে জানা হয়েছে। বাস রাস্তা পার হয়ে লম্বমান পথ ধরে এগোচ্ছি আমরা। খানিকটা চলার পর জনবসতির আভাষ পাওয়া গেল। দোকানপাট চোখে পড়ল। বাঁহাতে সর্ষে পেষার প্রাচীন ঘানি। চৌরাস্তার মোড়। ডানদিকে বাঁক নিয়ে যেতে হবে। উষ(কুণ্ডের দিকে যাওয়ার পথ এটাই।

চলতে চলতে হোটেল-রেস্তোরা-মিঠাইর দোকান চোখে পড়ছে। এদিকটা বাজার এলাকা মনে হচ্ছে। অথবা বাজারের কাছাকাছি জায়গা। পথে মানুষজন নেই বললেই চলে। হোটেলে গরমাগরম (টি সেঁকা হচ্ছে। হাল আমলের রাজগীর জনপদ এদিকটায়। প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজগৃহ আরো দ(ণদিকে। পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায়।

সামনে দিয়ে হনহন করে যাচ্ছিল একজন। মাঙ্কিক্যাপে মুখ ঢাকা। গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবি। অদিতি পেছন থেকে বলে উঠল — সিংজী না?

সিংজী থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বলল — আরে খোকিরা। পাটনাসে আ গিয়া?

— এই তো আয়া।

— অব কিধার যানা?

— পাণ্ডেজির বাড়ি।

— আরে উধার তো কোই কামরা খালি নেহি, মেরা ঘর চলো। সিংজী বলল।

নীতাদির সঙ্গে কথা বলে ঠিক হল সিংজী তথা সুজন সিং-এর বাড়ির দিকে যাওয়া হবে। কুলি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে ডেকে আনা হল — ইধার আও।

সড়ক থেকে বাঁদিকে কাঁচা রাস্তা চলে গিয়েছে পেছনের পাহাড়ের দিকে। সেদিকে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল বাঁহাতে সারি সারি খানকতক ঘরবাড়ি। জনমানববর্জিত স্থান নয় বলেই বোঝা যাচ্ছিল। ডানদিকে অনেকটা ফাঁকা জমি পড়ে আছে। খেলার মাঠ কিনা অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মাঠ পেরিয়ে একতলা বাড়ির সামনে পৌঁছেছি।

টালির ছাউনি দেওয়া বাড়ির সামনে টানা লম্বা বারান্দা। যেন একেবারে পাহাড়ের কোলে বসানো।

ঘরে ঢুকে বিজলি বাতির আলো জ্বেলে সিংজী বাইরে বেড়িয়ে গেল।

অদিতি বলল — এই হল সিংজীর ঘর।

ভিতরে ঢুকে মালপত্রের ওজন ঝেড়ে ফেলে মুক্ত(হলাম। একখানা ঘর হলেও বেশ বড়ো কামরা।

দরজা থেকে সিংজী মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল — দিদি আয়া?

— ওই তো পেছনেই আসছেন।

তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চাইছে না আমাদের। তাহলে সত্যি আমরা চার দেয়াল আর ছাদ-মেঝেওয়ালা আশ্রয় পেয়ে গেলাম? স্টেশনের বেঞ্চি নয়, গাড়ি-বারান্দা নয়, বৃ(চ্ছায়া নয়। একেবারে আদি অকৃত্রিম গৃহ। একখানা আশ্রয়! এ তো স্বপ্ন নয়। নির্জলা সত্যি। কপাল বলতে হয় একে!

নীতাদি-সুরমাদিরা তখনো এসে পৌঁছননি। কমলেন্দু তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে গেল।

ঘরে তত্ত(পোষ রয়েছে একাধিক। ফাঁকা কুঠুরিতে সামান্য পরিচিতা এক মেয়ের সান্নিধ্যে অস্বস্তি হচ্ছিল। অথচ তাকে একলা ফেলে বাইরে চলে যেতে পারছি না। অভদ্রতা হবে মনে হচ্ছে। দরজার পর্দা তুলে পায়ে পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। গুনগুন করছে অব(দ্ধ আবেগ।

বারান্দা থেকে নিচে ফাঁকা জমির ওপর পা রেখেছি। উপরে বিশাল আকাশ। ন(ত্রমালা জ্বলছে। কিছু গাছপালা দূরে অন্ধকার কাঁথা জড়িয়ে ভৌতিক অবস্থান নিয়ে বসে আছে। পিচ রাস্তা থেকে এক চিলতে বৈদ্যুতিক আলো এসে মাঠে পড়েছে। চিকচিক করছে এমনভাবে যেন বালুকাবেলায় জ্যোৎস্না ছড়ানো। বোধ হয় মাঠের বেশ কিছুটা জায়গা জলময়। শীত করছে। তবু শীত লাগছে না। হালকা লাগছে। কত যে দুশ্চিন্তার অবসান হল! এখন আপাদমস্তক শান্তি, স্বস্তি আর আনন্দ।

— কোথায় যাচ্ছেন? দাঁড়ান, যাবেন না প্লি-জ। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অদিতি অনুরোধ জানায়।

— না না যাচ্ছি না কোথাও। এমনি বাইরে এলুম। জায়গাটা দেখতে। কথাটা কিছুটা সত্যি। সম্পূর্ণ সত্যি নয়। সঙ্কোচের কথা মুখ ফুটে বলা যাচ্ছে না।

— সিংজীর মুখ থেকে গন্ধ পান নি? অদিতি প্র(করে।

— হ্যাঁ তা পেয়েছিলাম বটে। ঐ ভদ্রলোক নেশা করেন?

কমলেন্দু কখন কাছাকাছি চলে এসেছিল কে জানে! ও শুনতে পেয়েছিল শেষের কথাগুলো। ওমনি ফোঁড়ন কাটল — বুঝলে কি করে ওটা নেশার গন্ধ? নিশ্চয়ই অভ্যেস আছে।

অন্য সময় হলে চোস্ত উত্তর দিতে দ্বিধা করতাম না। নবীনা মেয়েটির সামনে তা করা যায় না। শালীনতার সীমা র(া করতে সচেষ্ট হলাম। বললাম — বিলো দ্য বেল্ট হিট হল ব্রাদার! তোলা রইল, পরে শোধ নেব।

অদিতি হাসছিল দু'জনের বাক্যালাপ শুনে। কোন মন্তব্য করল না। পুরনো কথার রেশ টেনে বলল — নেশা তো এদিককার সকলেই করে। বাস থেকে নামবার সময় দেখলেন না কী গন্ধ চারদিকে।

— তাহলে এ বাড়িতে আপনাদের খুব অসুবিধা হবে?

— না না অসুবিধে হবে না।

নীতাদিরা এখনো এসে পৌঁছলেন না কেন? কমলেন্দু বলল — আমাকে তো বললেন, চলে যাও, আসছি।

এতটা সময় লাগার কারণ বোঝা যাচ্ছিল না। কমলেন্দু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল রাস্তার দিকে।

অদিতিকে জিজ্ঞেস করলাম — ওনারা দেরি করছেন কেন?

— বাজার ঘুরে আসছেন বোধ হয়।

রাতে আহারপর্ব বলে একটা ব্যাপার আছে এবং তার জন্যে ব্যবস্থাদির প্রয়োজন আছে। সেসব কথা ছেলেদের মগজে এত চট করে আসে না। মেয়েদের কেমন সহজে এসে যায়। সহজাত গুণের মতে। নীরব সময় বইতে দেওয়া যায় না। অস্বস্তি বাড়ে। তাই প্র(— এই ঘরটার ভাড়া কত?

— থোক হিসেবে দিতে হবে আমাদের। এমনি ভাড়া কত জানি না।

— পিছনের ওই পাহাড়ে উঠেছেন? ওই যে বাড়ির পেছনের পাহাড়ে?

— না উঠিনি আমরা।

— বাহ্, পাহাড়টাকে দা(ণ লাগছে কিন্তু । কেমন মায়াবী মনে হচ্ছে, ছবির মতো পটে আঁকা যেন।

— আর পাহাড়ের কোলে বসানো সিংজীর বাড়িখানা। ভারী চমৎকার।

একটু পরে নীতাদিরা সদলবলে এসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক কাজকর্ম শু(হয়ে গেল। দুটি চৌকি ঘরের একপ্রান্তে রাখা হল। অন্য চৌকিটা অন্যদিকে। আমাদের জন্যে। বেডিং তুলে পেতে দেওয়া হল। ঝটপট বিছানা তৈরী। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তা চলছে।

— অনেক পোটলাপুটলি সঙ্গে করে এনেছেন। মায় হ্যারিকেন পর্যন্ত।

— কি করব বল! ছেলেরা হুট করে যেমন খুশি বেরিয়ে পড়তে পারে মেয়েদের বেলায় তা তো হয় না। কত টুকিটাকি জিনিস তাদের বইতে হয়। তবে একবার কষ্ট করে বয়ে আনতে পারলে, তারপর কটা দিন কিন্তু বেশ আরামে কাটানো যায়। তাই না?

— হ্যাঁ তা হয়তো যায়। তবে আমরা বুঝি বোঝা বয়ে বেরোনোর ঝামেলা। না বাবা ওতে আমরা নেই।

— তোমরা তো তা বলবেই। সব ফাঁকিবাজের দল যে!

কমলেন্দু ইশারা করল ঘরের বাইরে যেতে। বারান্দা পেরিয়ে মাঠে পা দিতেই পিঠের ওপর একখানা মো(ম কিল পড়ল। শ্রীমানের অঢেল আনন্দ-প্রকাশ সানন্দেই

হজম করতে হল। বললাম — হয়েছে বাপু! অসীম (মতা তোমার। পিঠে দয়া করেছ এবার পেটে কিছু দয়া করো। কোন সকালে নরেশচন্দ্রের ডালভাত উদরস্থ করেছি। সে সব কখন প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে জানো? আর সহ্য হচ্ছে না। কাছেই বাজার হোটেল আছে দেখেছি।

পায়ে পায়ে বাজারের দিকে এগিয়ে গেলাম। কয়েকটা হোটেল চোখে পড়েছিল তখন। পছন্দ হচ্ছিল না শহুরে চোখে। উপায় তো কিছু নেই। যে দেশে যেমন বিধি, যেমন ঠাঁটবাট। এদের মধ্যে কোন হোটেল পছন্দ করতেই হবে। রাঁচিতে মেস থেকে লেভেল ক্র(সিং পার হয়ে যেখানে জলখাবার খেতে যেতাম, তার নাম ছিল অশোক হোটেল। রাজগৃহে যে হোটেলে ঢুকলাম সেও অশোক হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। ভারতের সর্বত্র একটি করে অশোক হোটেল আছে কিনা সে ভাবনা অসমাপ্ত রেখে মূল কাজে মন দিতে হল।

ভীষণ (ুধার্ত। ঝটিতি এমন কিছু খাদ্যের অর্ডার দিতে হবে যা জলদি সার্ভ করা যায়। কেননা আর তর সইছে না। সুতরাং গরম (টি আর মাংস। থালায় গরমাগরম (টি পড়ছে আর তুরন্ত সাফ হয়ে যাচ্ছে।

উদরে কিছুটা শান্তি ফিরে এলো। মগজ সক্রি(য় হল। বললাম — জানো, ভুল হয়ে গেল মনে হচ্ছে। ওনারা স্টোভে রান্নার আয়োজন করছিলেন দেখে এসেছি। মনে হচ্ছে এই দুটি অবোধ প্রাণীর খাদ্যও ওখানে তৈরী হচ্ছে।

— আরে তাই তো! এ কথাটা তো একেবারে খেয়াল করা হয়নি। ইস্টপ্। আর খাওয়া নয়। শুধু এক কাপ চা।

— বুঝলে একদম ফ্রেস হয়ে বাড়ি ঢুকব। দরকার হলে আবার থালার সামনে বসে পড়ব। কি বল? যে রকম ি(দে ছিল, মনে হচ্ছে উড়িয়ে দিতে পারব আরেকপ্রস্থ খাবার।

— ঠিক ঠিক।

সিংজীর বাড়ির দু' নম্বর কামরা আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। ঘরের বাইরে থেকে নীতাদির কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। কড়া নাড়তে অদিতি দরজা খুলে দিল।

বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে মিঠে উষ(তার আমেজটা বেশ বোঝা যায়। অন্দরে অখণ্ড শ্রী বিরাজ করছে। মেয়েদের হাতের ছোঁয়ায় যেমন হয় আর কী! জিনিসপত্র সুন্দর করে সাজানো গোছানো হয়েছে। নিভাঁজ বিছানায় কম্বল ভাঁজ করা। আমাদের মতো হতচ্ছাড়া উড়নচণ্ডি স্বভাবের জীবের কাছে এমন পরিচ্ছন্ন ঘরোয়া পরিবেশ বড্ড বেখাপ্পা। তা বুঝে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম। এমন আশ্রয়ের সুষ্ঠু মর্যাদা ও সম্ভ্রম র(ার জন্য প্রাণপণ সচেষ্ট থাকব। মনে মনে ঠিক করলাম।

স্টোভে রান্না হচ্ছে। সোঁ সোঁ শব্দ জানান দিচ্ছে। নি(মাসী রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। সহজ এবং উপাদেয় আইটেম — খিচুড়ি। তার কন্যাটি অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী। অন্য দুজন রন্ধনকার্যে বোধ হয় সাহায্য করেটরে এখন চৌকি আশ্রয় করেছে। পরিচয়ের পালা শেষ হয়নি। তা কি অত সহজে শেষ হয়? কথা হচ্ছে সে সব নিয়ে।

দরজা বন্ধ ভিতর থেকে। ঘরের মধ্যে ছ'টি প্রাণী। ীণ বৈদ্যুতিক আলো সব অন্ধকার দূর করতে পারছে না। সাদা দেয়াল আর সাধারণ মেঝে এখনো অনেকটা আঁধারে লেপা। এখানে নেই কোন ট্রামের ঘরঘর শব্দ। কিম্বা লঝঝড়ে বাসের ঝরঝরে আওয়াজ। মোটরগাড়ি মাতালের মতো ছুটে যাচ্ছে না। ঠুনঠুন করে রিক্সার ঘন্টা বাজছে না। সিনেমা হল থেকে অব(দ্ধ জনতা হঠাৎ রাজপথ কলোচ্ছ্বাসে প-াবিত করে ভেসে যাচ্ছে না। নির্জনতা, শুধু নির্জনতা চারদিকে। স্টোভের সোঁ সোঁ শব্দ সেই নির্জনতা গভীর করছে।

নি(মাসী ঘোষণা করলেন — নীতা রান্না হয়ে গিয়েছে, সবাইকে খেতে বসিয়ে দাও।

অদিতি শয্যা থেকে উঠল। বসার ব্যবস্থা হল। নানা আকৃতির ও প্রকৃতির পাত্র ধুয়ে নিয়ে এল। 'খাব না' বলার সুযোগ নেই, কেননা তাহলে 'খেয়ে এসেছি' কথাটা কবুল করতে হবে। তা একেবারে অসম্ভব। অগত্যা সবার সঙ্গে আহারে বসতে হল। এক পাত্র করে খাদ্য গ্রহণ করা হল। এবং নেড়েচেড়ে গলাধঃকরণ করতেও হচ্ছিল।

আমাদের খাদ্য-আত্মীকরণের পদ্ধতি বোধহয় খুব দৃষ্টিনন্দন ছিল না। কেননা পাত্র থেকে খাদ্যবস্তু উঠছিলই না। নীতাদি একসময়ে বলে উঠলেন — ও কী, তোমরা খাচ্ছো না কেন? লজ্জা করে খাচ্ছো নাকি?

— না না লজ্জা করে খাব কেন! এই তো খাচ্ছি।

— আরেকটু নেবে তো?

— ব্যস আর চাই না। অনেক হয়েছে।

এই সব বলছি অবস্থা সামলানোর জন্যে। সত্যি কথাটা তো বলা যাচ্ছে না। এদের এড়িয়ে লুকিয়ে এভাবে খেয়ে আসাটা অন্যায় হয়েছে বুঝতে পারছি। কিন্তু কর্মটি তো সারা হয়ে গিয়েছে। এখন বুঝে আর কি লাভ?

নীতাদি কী বুঝলেন আর বুঝলেন না, জানি না। কিছু বললেন না। মাঝখান থেকে ফাজিল মেয়েটা টুক করে বলে উঠল — দিদি, ওরা বোধ হয় বাইরে খেয়ে এসেছে।

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ঠিক ধরেছে মেয়েটা। কী সাংঘাতিক, কী সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পেরেছে। বুঝেছিল ভালোকথা, তা বলে কী একটু চুপচাপ থাকা যেত না? এরকম করে সবার সামনে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে হয়? নীতাদিও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন হয়তো কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে প্রকাশ করেন নি। আর

ডেপোমি করে এই দুর্দিনের বাজারে আমাদের ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করার কি খুব দরকার ছিল? মাথা নিচু করে 'যেন শুনতে পাইনি' গোছের ভাব করে বসে রইলাম। তারপর উঠে পড়লাম। মনে মনে আওড়াতে হল — ফাজিল মেয়েটার থেকে খুব সাবধান!

দিনের শেষে উষ(বিছানার নরম সান্নিধ্য। ভাগ্যের কথা আরেকবার স্মরণ করতেই হবে। বালিশের বদলে কিটব্যাগ আর চাদর-জড়ানো মোড়কই তোফা। একটু পরে ঘরের আলো নিভল। পাশের ঘরে কোলকাতার রেডিও স্টেশন ধরা হয়েছে। রবিবারের গানের আসর বসেছে।

কোথায় ছিলাম কোলকাতার জীর্ণ (টিনে-বাঁধা জীবনে আর কোথায় উদাত্ত আবেগের প্রমত্ত প্রবাহে রাঁচি-রাজগৃহ হয়ে এখানে চলে আসা। কত পথ, নদনদী, পাহাড় প্রান্তর পেরিয়ে এখানে এসেছি। এসে পড়েছি অপরিচিত মানুষের পরিচিত ছায়াত(মূলে। তাদের সহৃদয়তায়। এ সব কি বি(্বাস করা যায়? অবি(্বাস্য হলেও তা যে সত্যি। যে মানুষ কোলকাতার নৈমিত্তিকতায় শহুরে জীবনযাত্রার চাপে হারিয়ে যায়, সে কিনা দেশদেশান্তরে ঘুরছে, হাসছে, কথা বলেছে, গান গাইছে, সব কিছু ভালোবাসছে, প্রাণবন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এই উদাত্ত পরিবেশে সে কী জীবন্ত প্রাণ, বাঁচার জন্যে মরিয়া একতাল প্রোটোপ-াজম।

অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল সকলে। ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হল না।

৬। উষ(কুণ্ড

শেষরাতে ঘুম ভাঙল চাপা হাসির শব্দে। এই অন্ধকারে কে হাসে?

খেয়াল হল আমরা একটি ঘরে শুয়ে আছি এবং সেখানে আরো চারজন মহিলা আছেন। চাপা হাসির দমক দুই নারীকণ্ঠ থেকে উৎসারিত বলে মনে হচ্ছে। ফিসফিস করে কথা হচ্ছে। জেগে আছি এবং ওদের অস্ফুট কথাবার্তার সা(ী থাকছি, তা ওদের জানানো ঠিক হবে না। নিঃসাড়ে শুয়ে আছি।

— হাসছিলাম কেন জানেন? ভাবছিলাম ...

— কি ভাবছিলেন?

— ভাবছিলাম যে আপনাদের তো রাতটা বাস টার্মিনাসে কাটানোর কথা ছিল। যদি সত্যি রাত কাটাতেন ওখানে, তাহলে ভোরবেলায় ঠিক চাদর মুড়ি দিয়ে দেখতে যেতাম এই শীতে কেমন হু হু করে কাঁপছেন।

— সত্যি দেখতে যেতেন?

— বললাম তো যেতাম।

— ওহ, কি অসভ্য মেয়ে রে বাবা! আমরা শীতে তখন আধমরা হয়ে পড়ে থাকতাম, আর উনি কিনা তখন আরাম করে বিছানা ছেড়ে মজা দেখতে যেতেন! কমলেন্দু শুনছ শ্রীমতী কি বলছে?

এ সব কথা পরে হয়েছিল অদিতির সঙ্গে। কোলকাতা ফিরে।

চুপচাপ কত(ণ আর শুয়ে থাকা যায়? একটু পরে ওনারা শয্যা ত্যাগ করল। আমরাও উঠে পড়লাম। জব্বর ঠাণ্ডা। গরম পোষাক যা সঙ্গে ছিল, সব গায়ে চাপানো হল। তবু শীত যাচ্ছে না। লম্ফঝম্ফ করতে হবে।

নীতাদি ছোট বালতি হাতে ধরিয়ে বললেন — বাইরে থেকে জল তুলে ভিতরের চৌবাচ্চায় ভরে দাও কয়েক বালতি।

কয়েক বালতি জল ঢেলে বুঝলাম — এত ছোট পাত্র দিয়ে ভিতরের বড়ো চৌবাচ্চা ভর্তির কাজটা সহজ হবে না। খুঁজেপেতে মাঝারি সাইজের ড্রাম যোগাড় করা হল। নি(িছদ্র ড্রাম নয়। তবু কাজ হল তা দিয়ে।

ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথ(ম। তার পাশে (ুদ্র প্রাঙ্গণ। তারপর আরেকটি ঘর রান্নার জন্যে। অবশ্য তা ব্যবহৃত হচ্ছে না।

চা তৈরী। শীতের কামড় ভাঙতে উষ(চা অমূল্য পানীয়। বাটিতে চুমুক দিয়ে বললাম — আমরা একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসছি।

— কোথায় যাবে এই ঠাণ্ডায়?

— গতকাল রাতে বাড়ির পিছন দিকে যে পাহাড় দেখেছি, সেটাতে উঠতে হবে।

অন্ধকার মুছে গিয়ে ভোরের শুচি আলোয় আকাশ ভরেছে। বাতসে দুরন্ত শীতের আকুলতা। সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। মানিকদা-মেজদা ঠিকই বলেছিলেন — রাজগীরে ঠাণ্ডা রাঁচির থেকে বেশী। সেই ভয়ে যতটা গরম জামাকাপড় সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম সব সঙ্গে নিয়ে এসেছি। মানিকদার কাছ থেকে এক জোড়া গ-াভস পর্যন্ত চেয়ে নিয়েছি। পাইপ দিয়ে একেবারে বরফ-গলা জল সাপ-াই হচ্ছে যেন। হাড় পর্যন্ত কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। হাত পা চলতে চাইছে না। দু'জনে ছুটতে শু(করলুম।

ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছি।

এদিকটায় খাঁড়াই খুব। একটা পথ আন্দাজ করে উপরে ওঠা শু(হল। একটু পরে মালুম হল পাহাড় চড়ার ব্যাপারটা মোটেই অত সহজ কাজ নয়। এর আগে রাজমহলের কাছে তিনপাহাড়ে চড়া হয়েছে, ভাইজাগের সীমাচলমে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীর পাহাড়ে চড়া হয়েছে আর ভাইজাগ বন্দরের প্রবেশপথে লাইটহাউস দেখতে গ্রীন ডলফিন্স্ নোজ পাহাড়ে উঠেছি। তাছাড়া চিত্তরঞ্জনের পাহাড়, রাঁচির পাহাড় সে সব তো আছেই। এত অভিজ্ঞতার পুঁজি আমাদের। অতএব পর্বতারোহণে আমরা বিশেষ দ(, এমন ভেবে আত্মতৃপ্ত ছিলাম। সেই আমরা যখন চড়াই ভাঙতে গলদঘর্ম হচ্ছি, তখন চড়াই পথটাই আসলে অতীব দুর্গম। হতেই হবে। ভেবে দেখলাম, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ করা চলবে না। অন্তত আমরা তো মরে গেলেও সন্দেহ করতে পারব না।

শরীরের ভার সামলে লতাগুল্মের কাঁটা বাঁচিয়ে বড়ো বড়ো পাথরের চাই জাপটে অনেকটা উপরে ওঠা হল। আর শীত বোধ হচ্ছে না। একটু বিশ্রাম দরকার।

বাঁ দিকের এই পাহাড়টির নাম বিপুলাচল। রাজগৃহে মোট পাঁচটি পাহাড় আছে — বৈভার, বিপুলাচল, উদয়গিরি এবং শোনগিরি। বিপুলাচলের পূর্বদিকের নানা অংশের আবার নানা নাম — রত্নগিরি, ছটাগিরি, গৃধ্রকূট ও শৈলগিরি। মহাভারতে সভাপর্বের বিংশ অধ্যায়ে এদের নাম বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক। অন্যত্র বলা হয়েছে বৈভার, পাণ্ডব, বৈপুল্য, গৃধ্রকূট এবং ঋষিগিরি। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হত বৈপূল, বেভার, গৃজ্ঝকূট, পাণ্ডব এবং ইসিগিলি। জৈন ধর্মগ্রন্থে বৈবাহার, বিপুল, রত্ন, উদয় এবং সোনা। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কোন পাহাড়ের কোন নাম ছিল তা সবটা ঠিকঠিক বলা আজ আর সম্ভব নয়।

অমলিন আকাশ। নিস্তব্ধ পাহাড়ের ব(দেশ। সকালের তুহিন বাতাসে বুকভরা পবিত্রতা। এমন শুদ্ধ বায়ু যত পারো নিঃশ্বাস নাও।

রাজগৃহ শহর নয়। ছোট্ট জনপদ। লোকে বলে রাজগীর। আমাদের রাজগৃহ কথাটিই বেশি পছন্দ। গীর মানে পাহাড়-পর্বত। রাজগীর যেন রাজার মতো পাহাড়-পর্বত আছে

এমন একটি জায়গা। আধুনিক রাজগীরের অবস্থান আসলে ঐ পাহাড়গুলোর উত্তর দিশায়। প্রাচীন ইতিহাসের রাজগৃহ আরো দ(ণে। একেবারে পাঁচ পাহাড়ের কোলে পাহাড় ঘেরা উপত্যকায়। ইতিহাসের গল্প ঐ জলপদ ঘিরে।

পাহাড়গুলি উচ্চতায় গগনচুম্বী নয়। আকারে আয়তনে সুবিশালও নয়। উচ্চতা হাজার এগারোশো ফুটের মতো। তবু সব মিলিয়ে দৃষ্টিনন্দন। উপর থেকে নিচের জনবসতি পথঘাট পটে আঁকা ছবির মতো সুন্দর দেখায়। ডান দিকে বাজার, হাসপাতাল, পোস্ট-অফিস ইত্যাদি। ঘরবাড়ি খুব কম। স্থায়ী বাসিন্দা বেশি নয়। শীতের সময় ভ্রমণবিলাসীর সংখ্যা বাড়ে। বঙ্গদেশ থেকেই আসে অধিকাংশ ভ্রমণকারীর দল।

ছোট ছোট আবাদী জমি ছড়িয়ে আছে। নয়া রাজগীর তৈরী হচ্ছে আরো পশ্চিম দিকে বাস টার্মিনাসের পেছনে। ডানদিকে দেখা যাচ্ছে খয়েরী রঙের কোন মন্দিরের চূড়ো। দূরে সিগন্যাল টাওয়ার দেখা যাচ্ছে। ওদিকটায় রেলওয়ে স্টেশন হবে তাহলে। বাঁ দিকে অন্যান্য পাহাড়। তাদের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা পথরেখা চূড়োয় উঠে গিয়েছে। সবুজ গাছপালার উজ্জ্বল সমারোহে হারিয়ে গিয়েছে। ভারী সুন্দর লাগছিল সেই ধূসর পথরেখার উর্দ্ধবিস্তার। মহাপ্রস্থানের পথে? রাজগীরের বিখ্যাত উষ(প্রস্রবণ কোনদিকে হবে? ভেবেচিন্তে বার করা হল, আমাদের বাঁদিকেই হবে। অর্থাৎ যেদিকে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে সেদিকে। পাহাড় নাহলে ঝর্ণা হয় না। কলতান হয় না। ঝর্ণার নৃত্য হয় না।

— অনেক বেলা হল। ওনারা আবার স্নানে চলে না যায়?

— ঠিক বলেছ। আর উপরে ওঠা নয়। চলো নামা যাক। কমলেন্দুকে বলি।

যা ভেবেছি তাই। বাড়ি ফিরে দেখি সিংজীর ঘর তালাবন্ধ। স্নানে চলে গিয়েছেন সকলে। তাহলে এখন কী করা? কে জানে অনেক(ণ অপে(া করে তারপর চলে গিয়েছেন হয়তো।

সকালে নীতাদি একবার বলছিলেন বটে — তাড়াতাড়ি স্নান করতে যাব। ফিরবও তাড়াতাড়ি। তোমরা নিশ্চয়ই মাংস খাও, দেখি তার ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

দ(ণদিকে চলে গিয়েছে উষ(কুণ্ডের পথ। সামান্য দূরে। পায়ে হেঁটেই দিব্যি এগোনো যায়। পথের মধ্যে পড়ল দুয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান। বর্মি মন্দির ও জাপানি মন্দির। অদূরে অজাতশত্রুর গড়। বাসস্ট্যাণ্ড থেকে দ(ণদিকের পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে গড়ের মধ্য দিয়ে। পাহাড়-ঘেরা ঐতিহাসিক রাজগৃহ উপত্যকার বাইরে সমতল প্রান্তরে গড়ের অবস্থান। গড়ের পশ্চিমদিকে শুকনো খালের পশ্চিম পাড়ে টিলা দেখা যায়। দ(ণদিকে পড়ছে বেণুবন এবং কালান্দক নিবাপ নামের পুষ্করিণী।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা দুটি পাহাড়ের কোলে এসে পড়েছি। বাঁদিকে বিপুলাচল আর ডানদিকে বৈভার। মহাভারতের সময়কাল থেকে খ্যাত উষ(কুণ্ডের অবস্থান বৈভারে।

তখন এই উষ(প্রস্রবণকে তপোদ বলা হত। ব্রহ্মের তপস্যার ফলে উদ্ভূত বলে এর নাম হয় তপোদ। তাপ থেকে তপোদ নামকরণও তো হতে পারত। হয়তো পারত, তবে তখন উষ(কুণ্ডের এমন মাহাত্ম্য থাকত না।

চিত্র-১। বৈভার থেকে বিপুলাচল পাহাড়।

নালার উপরে পুরনো লোহার ব্রিজ পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি টপকে উপরে উঠে যেতে হয় কুণ্ডের দিকে। একদা এই নালা নাকি নদী ছিল। সরস্বতী নদী। তবে আর্যসভ্যতার বিস্তারকালীন পশ্চিম ভারতের সরস্বতী নদী নয় বা এলাহাবাদের অন্তঃসলীলা সরস্বতীও নয়। গঙ্গার মতো ভারতে অনেক সরস্বতী নদী।

ব্রিজের উপরেই দেখা হয়ে গেল নীতাদিদের সঙ্গে। সবার পেছনে ছিল অদিতি। সেই বলল — দিদি একবার পেছনে তাকান।

নীতাদি ঘুরে তাকিয়ে বললেন — বাহ্ ঠিকমতো রাস্তা চিনে আসতে পেরেছ তাহলে?

— পারব না কেন? এ তো নাক বরাবর সিধে রাস্তা।

পৌঁছে গেলাম রাজগৃহের বিখ্যাত উষ(প্রস্রবণ এলাকায়। অগণিত মানুষজন এসেছে স্নান উপল(। পূজারী মানুষের ভিড়, দর্শনার্থী মানুষের ভিড়, অনাথ-আতুড়ের ভিড়, রোগগ্রস্ত মানুষের জটলা। মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর-ঘন্টার কলরোল শোনা যাচ্ছে।

ইতিহাসের রাজগৃহ ছিল মগধ রাজ্যের রাজধানী। রাজার রাজপ্রাসাদ ছিল এখানে কোথাও। রাজা ছিল, রানি ছিল, রাজপুত্র ছিল। রাজকন্যে তো থাকবেই, কারণ আমাদের ধারণা, উইদাউট রাজকন্যে কোন রাজত্ব থাকতেই পারে না।

চিত্র-২। উষ(প্রস্রবণ, রাজগৃহ।

রাজধানীর অন্দরে প্রবেশ করতে নিশ্চয়ই অনেক তোরণ ছিল। তার মধ্যে একটি প্রবেশতোরণ ছিল নাকি এই প্রস্রবণের ধারেকাছে। রাজপুরীর অন্তঃপ্রাচীরের উত্তরের প্রবেশতোরণ। আজ সে সবের চিহ্(মাত্র নেই। বড়োজোর কল্পনা করা যায় সেই তোরণটি। কল্পনার সেই তোরণের সঙ্গে সাঁচী স্তূপের প্রবেশ তোরণের

খুব মিল। কেন যে এরকম মিল মনে এসেছিল জানি না। হয়তো বুদ্ধদেব বোদ্ধধর্ম ইত্যাদি অনুষঙ্গে মিলের আনাগোনা।

একাধিক কুণ্ড আছে এখানে। বৈভারে রয়েছে সপ্তর্ষি কুণ্ড বা সাতধারা, ব্রহ্মকুণ্ড, অনন্তঋষিকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড, মার্কণ্ডেয়কুণ্ড, কামাখ্যাকুণ্ড এবং গঙ্গা-যমুনা কুণ্ড। বিপুলাচলে আছে সূর্যকুণ্ড, সোমকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, গণেশকুণ্ড এবং মখদুম বা মোকডাম বা ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ড। চারদিকে কুণ্ডের ছড়াছড়ি।

শি(ক-শি(য়িত্রীরা বোধ হয় আপামর জনগণকে ছাত্রছাত্রী মনে করেন এবং সুযোগ পেলেই জ্ঞানের পরী(া নিতে বসেন। পরিহাস করেই নীতাদি আমাদের বললেন — বল দেখি, এত রাশি রাশি জল কি করে গরম হয়? ফার্নেসে ফোটানো হয় না তো!

— না না পাগল নাকি! এত জল কি কৃত্রিম উপায়ে গরম করা যায়? আসলে এর কারণ ভূতত্ত্ব। সুযোগ পেয়ে ফাণ্ডা জাহির করার এমন মো(ম চান্স হারাতে রাজি নই। বলতে সবে শু(করেছি।

কমলেন্দু অমনি চেঁচিয়ে উঠল — ব্যস, চান্স পেয়ে গিয়েছে, এবার ঠ্যালা সামলান।

ফিউজ করে দিল হতচ্ছাড়া। ভূতত্ত্বে জ্ঞানগম্যি একটু বেশি ছিল বলে বেশ চোস্ত একখানা লেকচার দেওয়ার সুযোগ হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল। আর জিগরি দোস্ত হয়েও সেমসাইড একখানা গোল ঠুসে দিলে। বলতে যাচ্ছিলাম ভূপৃষ্ঠের জল ভূস্তরের অনেক নিচে চলে গেলে, ওপরের স্তরের চাপ আর তাপে এমনিতেই গরম হয়। সেই সঙ্গে যদি কোন সালফার-জাতীয় ডিপজিটের সংস্পর্শে আসে তাহলে তো কথাই নেই। রাসায়নিক বিক্রি(য়ায় জল আরো গরম হয়ে ওঠে। সেই জল ভূস্তর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ পেলে উষ(প্রস্রবণ হয়ে যায়। কত কথা বলার ছিল এ নিয়ে। সহ্য হল না বদমাসটার। হিংসে, এ কেবল হিংসে, তা ছাড়া আর কিছু নয়। মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি।

একটু পরে নীতাদি এমন দুরবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করলেন। বললেন — ওর কথায় কান দিও না, বল শুনি।

উৎসাহ দমিত তবু সং(েপে বলতে হল। নীতাদি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন । মাঝে মাঝে ‘ও’ ‘আচ্ছা’ ইত্যাদি বলে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন।

সিঁড়ি ভেঙে সামান্য উপরে কুণ্ড এলাকা। চুনকাম করা দেয়াল দিয়ে ঘেরা অনেক চত্বর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জামা-কাপড় আগলে বসে আছে কেউ কেউ। একধারে জমা হয়েছে জুতো-চটি-স্লিপার। এক বৃদ্ধ সে সবের জিম্মাদার। কেউ স্নানে যাওয়ার আয়োজন করছে। কেউ স্নানশেষের আড়ম্বর। আট থেকে আশি বছর অবধি নারীপু(ষের জটলা। এর মধ্যে প্রস্রবণ কোথায়? কুলকুল করে বয়ে চলেছে যে পাহাড়ী ঝর্ণা, সে কোথায়! নিশ্চয়ই ধারেকাছে হবে কোথাও।

নীতাদি হাঁকলেন — এই যে এদিকে কুণ্ড, দেখে যাও।

এক চত্বরের গহ্বর থেকে আহ্বান আসছে। গোটাদশেক সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেলাম। সপ্তর্ষি কুণ্ডের গহ্বরে। নয়ন মেলে তো চ(স্থির! যাহা দেখিলাম তাহা জন্মজন্মান্তরে ভুলিব না। এর নাম উষ(প্রস্রবণ! আমাদের কল্পনায় সে যে কত রঙিন ছিল! সেখানে উচ্ছল জলতরঙ্গ ছিল। উষ(জল বেশ ঝিরঝির করে বয়ে যাবে। এক মিঠে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ছড়িয়ে। হৃদয় ভরে উঠবে কলতানে।

চিত্র-৩। সপ্তর্ষি কুণ্ড।

ইতিমধ্যে রাঁচির হুড্রু আর জোনহা ফলস দেখে এসেছি বলে কল্পনা লাগামছাড়া হওয়া তেমন দোষের ছিল না। তাই আমরা ভেবেছি তপোদ উষ(প্রস্রবণ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উর্ধগামী হবে। কখনো মহাদেবের জটার মতো, কখনো মেঘপুঞ্জের মতো। এরকম নানা রোমাঞ্চকর সাদৃশ্য ভেবে রেখেছিলুম। আমরা পাথরে-নুড়িতে বহমান সেই আনন্দপ্রবাহে অবগাহন করব।

সাধের সমস্ত আশা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। পেলাম ইট-বালি-সিমেন্টের তৈরী সাদা হাড়ের মতো কুড়ি-বাইশ ফুট উঁচু চারটে দেয়াল, পাথর বাঁধানো আয়ত(াকার মেঝে আর মাথার উপর খোলা আকাশ।

চত্বরে তখন অনেক মানুষের জটলা। প্রস্রবণের জলধারা নল-বাহিত হয়ে পাঁচটি সিংহমুখ থেকে ঝরছে। সিংহমুখের নিচে মানুষের জটলা। ভিড়ে ঝাপিয়ে পড়ছে লোকজন। অনেকটা কোলকাতার রাস্তার কলে সকাল নটার দৃশ্য। লোকজন গামছা-নেংটি পড়ে বসে আছে। এর মাথার ওপর দিয়ে ও জল নিচ্ছে। এ ওকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। তবে কোন কলহ নেই। হাতাহাতি হচ্ছে না।

উত্তর-পূর্ব কোণায় ব্রহ্মকুণ্ড। ভূগর্ভস্থ জলে পূর্ণ। অনেকটা চৌবাচ্চার মতো ব্যাপার। সপ্তর্ষি কুণ্ডের চত্বর থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে হয় ব্রহ্মকুণ্ডে।

নীতাদিকে জিজ্ঞেস করলাম — এই আস্তাবলে স্নান করতে হবে?

কমলেন্দু বলল — না না লাইফে এ সবের কোন দরকার নেই। স্নানঘরটা কি গোয়ালঘর হয়ে উঠল নাকি!

খুব বিরক্তি(হচ্ছিল। তবু স্নান বাতিল করা যাচ্ছিল না। সকলেই কুণ্ডে স্নান করতে আসে। আমরা এড়াই কি করে! প্রথমে সুরমাদি আর নি(মাসিকে বিশ্রী স্নানপর্ব সারতে

পাঠানো হল। ওনারা চলে গেলেন। মেয়েদের জন্য আলাদা কুণ্ড আছে সেখানে। সেই অবসরে আমরা চারজন পাহাড়ে চড়ার পথ ধরেছি।

এই পাহাড়টির নাম বৈভার। শুধু উষ(প্রস্রবণ নয় আরো অনেক বৈভব ছড়িয়ে আছে এখানে। সে সব ত্র(মশ জানা হয়েছিল। পাথরে-সিমেন্টে বাঁধানো সিঁড়িপথ। লম্বা, বেঁটে, খাটো নানা ছাদের সিঁড়ি। এক দুই করে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে যেতে হবে?

— দূর ছাই! চলো সিঁড়ি ছেড়ে পাথর ডিঙিয়ে যাই। বলে কমলেন্দু পথ ছেড়ে বেপথে চলল।

কমলেন্দুর সঙ্গে আমিও যোগ দিলাম। সেসব দেখে নীতাদি আর অদিতি নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছিল।

আমরা কিছুটা উপরে উঠে বসে অপে(া করছিলাম ওদের জন্যে। ওরা এলে আবার পাথর ডিঙোতে ডিঙোতে এগিয়ে গেলাম।

চিত্র-৪। জরাসন্ধ বৈঠক।

পথে পড়ল জরাসন্ধের বৈঠক। জরাসন্ধ মানে তো সেই মহাভারতের যুগের অতি পরাত্র(মশালী রাজা। মথুরার কংসরাজের (শ্বশুর ছিলেন মগধদেশের রাজা জরাসন্ধ। তাঁর দাপটে কৃষ(-বলরামকে পর্যন্ত মথুরা ত্যাগ করে দূর দ্বারকায় পালাতে হয়েছিল। এই পলায়ন কৃষ(-বলরামের পে(মর্যাদাহানিকর বলেই আমাদের মনে হয়েছিল। এদিকে মধ্যম পাণ্ডব যুবক ভীমসেন পর্যন্ত পালোয়ানি কসরতে ঘায়েল করতে পারেননি জরাসন্ধকে। এমনই শক্তি(মান ছিলেন তিনি। পরে শ্রীকৃষে(র ইঙ্গিতে জরাসন্ধের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে বয়সের ভারে পীড়িত মগধরাজকে হত্যা করেন কৌশলে। সেই জরাসন্ধের বৈঠক এখানে? সত্যি জরাসন্ধ এখানে বৈঠক দিতেন? নাকি এসব পুরাণ যুগের বানানো গল্পকথা?

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পাথর বিছোনো খানিকটা সমতল জায়গা। বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই সাজিয়ে তৈরী। অনেকে বলেন, এটি আসলে ছিল প্রতির(ার জন্য নির্মিত ওয়াচ-টাওয়ার। ষোলো-সতেরো হাত উঁচু হবে। উপরের আয়তন একদিকে প্রায় পঁচাশি ফুট তো অন্যদিকে আশি ফুট। নিচের দিকে কয়েকটি গুহা রয়েছে। সাধু-সন্ন্যাসীরা একদা গুহায় বসবাস করতেন। তখন থেকে এর নাম হয়ে গেল পিপ্পল গুহা। হয়তো কাছাকাছি কোন পিপ্পল (অশ্বত্থ) গাছ ছিল। আজ আর নেই। যদি সত্যি এটি বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত পিপ্পলী গুহা হয়, তবে এখানে বৌদ্ধভি(মহাকাশ্যপ বাস করতেন।

— আমি আর পারছি না, এখানে একটু বসছি। তোমরা যাও। নীতাদি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন। বেশিদূর যেওনা কিন্তু। সুমিরা স্নান করে বসে থাকবে।

অদিতি আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো উচ্ছ্বাসে কলকল করতে করতে।

এদিকে কয়েকটি জৈন মন্দির রয়েছে। একটিতে জৈনগু(আদিনাথের আসন। শীত-ভেজা রোদটা বেশ মিষ্টি। বাতাসে এখনো ঠাণ্ডার সূচালো তী(তা রয়েছে। একজন বিত্রে(তা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছে। অদিতিকে জিজ্ঞেস করলাম — চা খাবেন?

— না, আমি চা বিশেষ খাই না।

— তবে থাক। আমাদেরও তেমন প্রয়োজন নেই।

আমরা অবলীলায় চা-এর প্রতি প্রবল আকর্ষণও উপে(া করলাম। কখনো কখনো উদার হতে বেশ লাগে।

— চলো না পাহাড়ের চূড়োয় যাই। কমলেন্দু বলল।

অদিতি বলল — অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। আর উপরে যাবো না।

— আমি দেখে আসি? বলে কমলেন্দু চলে গেল।

ওর সাধ পাহাড়ের বনপথে হারিয়ে যেতে। আমাদের ফেলে ছুটতে লাগল। সবুজ গাছগাছালির মধ্যে। তারপর ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়েটিকে একা ফেলে আমি ওর সঙ্গী হই কী করে?

চুপচাপ থাকা যায় না। টুকটাক কথা বলতে হয়। কাজটা কঠিন। কথা না থাকলেও কথা চালু রাখার মুন্সিয়ানা নেই। নির্জন পাহাড়ে নিতান্ত এক অপরিচিতার সামনে নীরবে বসে থাকা আরো কঠিন।

বাক্যালাপের ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াল।

— দেখছেন, পাহাড়ের এদিকটায় কেমন ঢাল। অদিতি বলল।

— হ্যাঁ, তেমনি ঘন গাছপালা। আমার উত্তর।

— এদিক দিয়ে নিচে নেমে যাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। তাই না?

— সত্যিই অসম্ভব।

— আচ্ছা, একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?

— হ্যাঁ পাচ্ছি।

— চুপ করে দাঁড়ান তো দেখি। ঝর্ণার শব্দ বলে মনে হচ্ছে।

— হয়তো হবে।

— এত যে ছুটোছুটি করছেন দু'জনে মিলে, পড়ে গেলে কি হবে?

— আরে দূর! পড়ে যাব কি কথা!

— আমাকে বাড়ি থেকে কি বলে দিয়েছে জানেন? বলেছে আমি যেন পাহাড়ে বেশি ছুটোছুটি না করি।

— ঠিকই তো বলে দিয়েছেন। কোথায় পড়ে যাবেন, কখন কি হবে, সে সব ঝঞ্ঝাট কি ভালো?

— ভেবেছেন কি পাহাড়ে ছুটতে পারব না? দৌড়তে গেলেই পড়ে যাব? মোটেই তা নয়।

তারপর হঠাৎ কেমন চুপ করে গেল। মনে হল একটু বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। অপে(া করছি। এক সময় নিজেই বলে উঠল — আচ্ছা মানুষ মরে গেলে কী হয়?

— কি জানি কি হয়। সত্যি কিছু হয় নাকি? ঠিক জানি না। আসলে ভূতপ্রেত সেসব আমি মানি না।

— আমিও মানি না। পুরোনো লোকেরা কিন্তু বলে মানুষ মরে গেলেও তার পিছুটান থাকে। বিশেষ করে যাকে সে ভালবাসত তার উপর টান থাকে। আমাকে আমার দিদিমা খুব ভালবাসতেন। দিদিমাই আমার সব ছিলেন।

— তিনি কি আর নেই?

— না তিনি গত হয়েছেন। এই তো কিছুদিন হল তাঁর ত্রি(য়াকর্ম সারা হল। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছিল না সেই থেকে। বাড়িতে একমুহূর্ত টিকতে পারি না। খাওয়াদাওয়ার পাট প্রায় বন্ধই হয়ে যাচ্ছিল। সেজন্যেই জোর করে সকলে নীতাদির সঙ্গে আমাকে বেড়াতে পাঠিয়ে দিল।

বুঝলাম ওর বিশেষ প্রিয়জন ছিলেন ওর দিদিমা। মৃণালিনী দেবী। তাঁর বিয়োগব্যথায় নিতান্ত কাতর হয়ে পড়েছে মেয়েটি। চুপ করে কথা শোনা ছাড়া কিছু করার ছিল না।

অদিতি ওর ভালোলাগা-না-লাগার কথা বলতে লাগল আরো। ওর দিদিমার কথা। দাদামশায় গত হয়েছেন কয়েক বছর আগে। দিদিমা পুরোনো যুগের মহিলা। তেমন করে লেখাপড়া শেখা হয়নি। নারীশি(ার চল ছিল না বলে। নামধাম সই করতে পারতেন। অদিতি বলতে লাগল — কিন্তু দিদিমা মানুষ হিসেবে একেবারে অন্যরকমের ছিলেন। একেবারে অন্যরকম। কি রকম বলব? এই যেমন মেয়েমহলের অতি (চিকর ব্যাপার হল পরনিন্দা পরচর্চা(না তার বালাই ছিল না একদম। পাড়ায় সকলের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। সৎ জীবনযাপন সৎ ভাবনার কথাই বলতেন সকলকে। সম্ভব হলে মানুষকে সাহায্য করতেন কিন্তু পারতপ(অন্যের (তি করতেন না। আর মানুষকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন খুব। দা(ণ রান্নার হাত ছিল। তাঁর ভাবনাচিন্তার ধরণটাই ছিল আলাদা। নীচতার লেশমাত্র ছিল না। সুন্দর (চির মানুষ ছিলেন।

অদিতি বলছিল তাঁর শেষদিনটির কথা — মাস কয়েক আগেকার ঘটনা। মহালয়ার আগের দিন ভোরবেলা দিদিমা চলে গেলেন। রাতে বুকে ব্যথা হচ্ছিল। আমাকে ডাকেন নি। ভোররাতে বললেন — জল দে তো ...। ব্যস ওই তাঁর শেষ কথা। মুখে জল দিলাম। জল মুখে নিয়ে আমার দিদিমা অনন্ত নিদ্রায় ঢলে পড়লেন। একলা ঘরে তাঁর মাথা

কোলে নিয়ে বসে আছি। কখন ভোর হবে? বসে থাকতে হয়েছিল অনেক(ণ। ভোরের অপে(ায়। তখন কেবল আমরা দু'জন, আমি আর দিদিমা। তার মধ্যে একজন মৃত। সকালবেলা সকলকে খবর দেওয়া হয়েছিল।

তিনি ছিলেন নাকি অদিতির উপর একান্ত নির্ভর। খেতে বসলে নাতনির হাতের জল না হলে তাঁর জল খাওয়াই হত না। নাতনির বিয়ের জন্য সমস্ত গহনা তৈরী করে রেখেছেন। নিজের ব্যবহার করা যা কিছু তার বেশির ভাগটাই নাতনির জন্য গুছিয়ে রেখে গিয়েছেন। অদিতিও তাঁকে কেন্দ্র করে বেঁচে ছিল। তিনিই ছিলেন স্নেহে বাৎসল্যে অদিতির মাতৃসমা। দাবী জানানোর মতো একান্ত নির্ভরযোগ্য একটা আশ্রয়। তাঁর জায়গাটা শূন্য হতে একটা বিরাট ফাঁক হয়ে গেল অদিতির জীবনে। মানসিকভাবে মৃত্যুটা মেনে নিতে মুস্কিল হচ্ছিল। শেকড় আলগা হয়ে গিয়েছিল যেন। অদিতির বাবা-মা ভাইবোন সবই আছে। ভাইবোনেরা বাবা-মার কাছে থাকে অন্যত্র। ও সেখানে থাকে না। দিদিমা মারা যাওয়ার পরেও থেকে গিয়েছে ঐ বাড়িতে। মাসির কাছে। কেন এমন ব্যবস্থা সে প্র্ন করা সমীচীন মনে হয়নি।

কী যে সহানুভূতি জানাব ওকে! যে যায় সে তো আর ফিরে আসে না। কোন মূল্যেই নয়। এই চলে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই। দু'বছর আগে আমার মা গত হয়েছেন। সংসারে হাল ধরার কেউ ছিল না। এমন দুরবস্থায় পড়তে হয়েছিল যে এক ভাইকে লেখাপড়া শিকেয় তুলে রান্নাবান্না করতে হচ্ছে। তবু মানুষকে একদিন পরপারে যেতেই হবে। যে যায় সে চলেই যায়। রেখে যায় তাঁর প্রিয়জন। প্রিয়জনেরা হারায় সেই মানুষকে। তাঁর জন্যে শোকার্ত হয়। কাতর হয়।

এই সব কথা বলতে বলতে আমরা উভয়ে উভয়ের সমব্যথী হলাম। কিছু(ণের জন্যে। তখন অল(্যে কেউ হেসেছিল কিনা কে জানে!

ভারী পরিবেশটা বদলাতে হবে। বললাম — কমলেন্দু অনেক(ণ হল উপরের দিকে গেল। দেখেছেন এখনো ফিরল না?

— তাই তো এত দেরি করছে কেন?

চিৎকার করে ডাকলাম — ক-ম-লে-ন্দু-উ-উ।

না কোন সাড়া নেই। বাতাসে-পাতায় মর্মরধ্বনি ছাড়া।

বৈভার পাহাড়ে শিবমন্দির আছে। কালো পাথরের সোমনাথ আর সাদা পাথরের সিদ্ধিনাথের মন্দির। কাছে পড়ে রয়েছে কিছু স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ। এখানে একদা মণ্ডপ ছিল। ছয় শ্রেণিতে ত্রিশটি স্তম্ভ ছিল। চারদিক ঘিরে ছিল দেয়াল। লোকে বলে এখানে জরাসন্ধ শিবপূজা করতে আসতেন। জরাসন্ধ শৈব ছিলেন বলেই কি কৃষে(র সঙ্গে তাঁর বিরোধ? যেমন রাবণ শৈব তো রাম বৈষ(ব।

বৈভারের উত্তর ঢালে রয়েছে বিখ্যাত সপ্তপর্ণী গুহা। সেখানে তথাগত বুদ্ধের নির্বাণ লাভের মাস ছয়েক পরে প্রথম বৌদ্ধসভা আহুত হয়েছিল। জৈনমন্দির চত্বর থেকে ঐ গুহায় যাওয়ার পথ ছিল। এখন নেই। একদা সেখানে সাতটি গুহা ছিল। বর্তমানে কেবল দুটি গুহা নজরে পড়ে। একটি গুহায় সুড়ঙ্গ আছে। গুহার সামনে প্রশস্ত অঙ্গন। প্রায় ১৩০ ফুট লম্বা। আর একদিকে ৩৬ ফুট অন্যদিকে ১৩ ফুট চওড়া। চারদিকে একদা দেয়াল ছিল। অজাতশত্রু ধর্মসভার জন্য এই অঙ্গন নির্মাণ করে দেন।

বৌদ্ধসঙেঘর নিয়ম ও কার্যসূচী সঙ্কলনের উদ্দেশে সেই সভা বসেছিল। প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতি। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ত্রিপিটক রচনার সূচনা হয়েছিল তখন। অন্যতম শিষ্য মহাস্থবির কাশ্যপ পাঁচশত ভি(নিয়ে সেই ধর্মসভার আয়োজন করেছিলেন। ভি(আনন্দ কর্তৃক আবৃত্ত-বচন ধর্মপিটক এবং ভি(উপালি কর্তৃক আবৃত্ত-বচন বিনয় পিটক আখ্যা পায়।

দ্বিতীয় ধর্মসভা আহুত হয়েছিল মহাস্থবির যশের নেতৃত্বে আরো একশ' বছর পরে। বৈশালীতে রাজা কালাশোকের আনুকূল্যে। তখন সেখানে সাতশ' ভি(সমবেত হয়েছিলেন। বুদ্ধের নির্বাণলাভের দু'শ বছর পরে প্রিয়দর্শী অশোক এক হাজার ভি(জড়ো করে আয়োজন করেছিলেন তৃতীয় ধর্মসভার। তখনকার মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রে। মৌদগল্য-পুত্র তিষ্য পৌরহিত্য করেছিলেন। সেই সভায় সর্বসম্মতিত্র(মে তিনটি শাস্ত্র প্রণীত হয়। বিনয়পিটক, সুত্তপিটক আর অভিধম্মপিটক। মাগধী তথা পালি ভাষায় লেখা হয় সেসব। সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল ২৭৩ থেকে ২৩২ খৃষ্টপূর্বাব্দ। পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্র সেই শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে গেলেন সিংহলদেশে। সম্ভবত ২৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। সেখানে রাজা বট্টগামিনীর নির্দেশে ত্রিপিটক সঙ্কলিত হল। অথবা আবার লিপিবদ্ধ হল। কালের চত্র(ান্তে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধশাস্ত্র প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। র(া পেল সিংহলে। মাগধী মহেন্দ্র ২০৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে সিংহলেই দেহর(া করেন।

চতুর্থ সম্মেলন হয়েছে সম্রাট কনিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় জলন্ধরে অথবা কাশ্মীরে। কনিষ্কের রাজত্বকাল বোধ হয় ৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে শু(। অনেকে তাঁকে ১২০ থেকে ১৬২ খৃষ্টাব্দের মানুষ বলে মনে করেন।

— কই এবার নামুন। অনেকটা বেলা হয়েছে কিন্তু। অদিতি তাড়া লাগাল।

সিঁড়িপথ ধরে নামতে শু(করেছি। একটু নিচে এসে দেখা হল নীতাদির সঙ্গে। অনেক কষ্ট স্বীকার করে তিনি তখনো শ্রান্ত শরীর টেনে টেনে উপরে তুলছিলেন। অদিতি তা দেখে আনন্দে চিৎকার করে বলল — ওমা! দিদি আপনি শেষ পর্যন্ত এতটা উঠে এলেন?

— আর পারি না। বয়স হয়েছে তো। তোমাদের মতো অমন ছুটোছুটি করতে পারব কেন বল? বেলা হয়েছে। নামো এবার। আরেকজনকে দেখছিনা যে।

– চূড়োয় উঠবে বলে দৌড়েছে। অদিতি বলল।

– দেখেছ কাণ্ড। ইতিমধ্যে ওদের স্নানটান সব সারা হয়ে গেল বোধ হয়। বসে থাকবে আমাদের জন্যে।

একটু পরে কমলেন্দু ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল। বলল – এত চিৎকার করে ডাকলাম তোমাদের, শুনতে পাও নি?

– কই শুনিনি তো। আমরাও ডেকেছিলাম তোমাকে।

– মিথ্যে কথা।

– আরে বাপু না। শুধুমুধু মিথ্যেকথা বলতে যাব কেন? যাকগে পা চালিয়ে নামো দেখি। সত্যি দিদি, অনেক বেলা হয়ে গেল। একেবারেই খেয়াল ছিল না। সুরমাদিরা হয়তো রাগ করবেন।

– রাগ করলেই হল। দ্যাখোনা, আমিও কেমন চেঁচামেচি করে বলব, এত তাড়াতাড়ি স্নান হয়ে গেল? ভালো করে স্নান করতেই তো এখানে আসা। আরেকটু সময় নিয়ে স্নান করতে পারতে। নীতাদি বললেন।

– ঠিক বলেছেন। সেই কথা বলা হবে। ওদের কিছু বলার আগে উল্টে আত্র(মণ। অদিতি খুশিতে ছেলেমানুষ হয়ে উঠল।

নীতাদি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিলেন। একটা জবরদস্ত পরিকল্পনা করে আমরা নিচে নামছি। নিজেদের র(া করতে বেশ জোরালো কূটনৈতিক অস্ত্র যোগাড় করা গিয়েছে ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। কে জানত আমাদের সকল পরিকল্পনা সামান্য সময়ের ব্যবধানে কেমন ভেস্তে যাবে!

ব্রহ্মকুণ্ড ঘুরে এসে অদিতি খবর দিল – দিদি, সুরমাদি-মাসিমা কাউকে দেখছি না তো? কোথায় গেলেন ওনারা?

– দেখছ না? সে কি কথা! পাশের মেয়েদের স্নান করার জায়গাটা দেখেছ ভালো করে? ওইদিকের চত্বরে?

– হ্যাঁ দেখলাম তো।

– সেখানেও পেলে না। তবে তুমি দাঁড়াও এখানে। আমি একবার দেখছি। নীতাদি ওনাদের খোঁজে চলে গেলেন।

মনে মনে ভাবছি দেরি হয়েছে বলে রাগ করে সুমিদি-নি(মাসিরা ঘরের দিকে চলে গেলেন না তো? অদিতিকে সেই আশঙ্কার কথা জানালুম। ও বলল – তা কী করে হবে। ঘরের চাবি তো দিদির কাছে। বোধ হয় এদিক ওদিক কোথাও বসে আছেন। স্নান সেরে শীতের রোদ পোহাচ্ছেন।

আমরাও একটু ঘুরেফিরে দেখলুম। কাউকে দেখা গেল না। অপে(া করছি নীতাদির জন্য। কী খবর আনেন দেখা যাক।

বৈভার পাহাড়ে রয়েছে এই যে সপ্তধারা বা সপ্তর্ষি কুণ্ড, তার প্রত্যেক ধারার নামকরণ হয়েছে এক একজন ঋষির নামে। তাঁরা হলেন গৌতম, ভরদ্বাজ, বি(ামিত্র, জামদগ্ন্য, দুর্বাসা, বশিষ্ঠ এবং পরাশর। দ(ণদিকের প্রাচীরে ছোট গর্ভমন্দিরে এঁদের মূর্তি আছে। মন্দির এবং মূর্তি নির্মাণ করে দেন গয়া জেলার জনৈক বাবু সীতারাম। পুরাণ-কথিত মহর্ষি গৌতমের অধিষ্ঠানও ছিল নাকি রাজগৃহে।

একটু নিচে পবিত্র ব্রহ্মকুণ্ড। তার জল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উষ(তায় উত্তপ্ত। সপ্তধারায় স্নান না করে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করা যায় না। পাণ্ডাদের নিষেধ আছে। উপরের চত্বরে আরো অনেক কুণ্ড আছে – ঋষিকুণ্ড, ব্যাসকুণ্ড, মার্কণ্ডেয় কুণ্ড, কামাখ্যা কুণ্ড ইত্যাদি। মেয়েদের স্নানের জায়গা ব্যাসকুণ্ডে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক মন্দির আছে – বরাহ, শিব, বিষু(, দ(াদেবী, গৌরীশঙ্কর ও গণেশের মন্দির।

চিত্র-৫। ব্যাস কুণ্ড।

নীতাদি ফিরে এলেন। সকলে সমস্বরে প্র(করে উঠলাম – ওনাদের পেয়েছেন?

– হ্যাঁ পেয়েছি। তোমরা স্নান করবে না? নাও, চটপট করে নাও। আমরাও যাচ্ছি।

নীতাদি চলে গেলেন প্রথমে। যেতে যেতে আরো বলে গেলেন – বেশি(ণ বসে থাকব না কিন্তু। মাংসের দোকানে বলে এসেছি। বেলা দশটার মধ্যে না গেলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

এ তল্লাটে স্নানের অন্য কোন সুব্যবস্থা সম্ভব নয় বুঝতে পারছি। সকলের সামনে গা থেকে জামাকাপড় খুলে ফেলা পছন্দ হচ্ছিল না। এমন প্রশস্ত ব(যে মুক্ত(করতে লজ্জা হচ্ছিল। সকলে এখানে দিব্যি জামাকাপড় খুলে নেংটি পড়েই স্নান করছে। অবলীলায়। আমরা অন্যরকম আশা করি কী করে? কমলেন্দুকে বললাম – স্নানের জন্যে কিছুই আনিনি যে।

– যাহোক ম্যানেজ করতে হবে। আমি চললাম। কমলেন্দু চলে গেল স্নানে।

ব্যাসকুণ্ডের পাশে বসে জামাকাপড় আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সঙ্গে অদিতি। পাশে যে ছেলেটি বসেছিল, আলাপ হল তার সঙ্গে। নাম রানা। কোলকাতার ভবানীপুরে থাকে। রাজগৃহ দর্শন ওদের সমাপ্তপ্রায়। আগামীকাল চলে যাবে।

– কী কী দেখলে তোমরা?

– অনেক কিছু। বিম্বিসার জেল, অজাতশত্রু দুর্গ, অজাতশত্রু স্তূপ, মণিয়ার মঠ, শোনভাণ্ডার, গৃধকূট, বেণুবন, সপ্তপর্ণীগুহা, ঐতিহাসিক প্রাচীর, বাণগঙ্গা আর অনেক।

— সবথেকে দূরে কি রয়েছে?

— বাণগঙ্গা। মাইল তিনেক দূরে। আমরা তো এক্কা চড়ে গিয়েছিলাম। এক্কাওয়ালা নিজেই ঘুরে ঘুরে সব দেখাল।

অদিতিকে জিজ্ঞেস করি — নালন্দা কবে যাবেন? আজ যাবেন?

— কী করে বলব? দিদিকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

— আজ যদি একান্ত না হয় তবে কাল কিন্তু যেতেই হবে। তাহলে আজ বিকেলে রাজগৃহ ঘুরে নেব।

কমলেন্দুর স্নান শেষ হল। নীতাদি ফেরেন নি এখনো। কুণ্ডের চত্বরে নেমে গেলাম। সপ্তধারার এক ধারার নিচে বসে পড়লাম। শীতের কাঁপুনি ছিল এত(ণ। তপ্ত জলধারা গায়ে পড়তে প্রথমে ছেঁকা লাগল যেন। ছিটিয়ে ছিটিয়ে উষ(জল গায়ে নিতে আস্তে আস্তে উত্তাপ সহনীয় হয়ে এল। তারপর ধারার নিচে বসে থাকতে বেশ লাগছিল। একটু পরে পরে মৌজ করে শরীর ভিজিয়ে নিচ্ছি। অন্যকেও জলধারা নিতে দিচ্ছি। ঝগড়াঝাটি নেই। বেশ গণতান্ত্রিক পরিবেশ।

— মাথার উপর গরম জল বেশি নেবে না কিন্তু। একজন সাবধান করল।

আহ্ কী আরাম! কয়েক ঘন্টা তোফা কাটানো যায়। কত(ণ বসেছিলাম হুঁস নেই। উঠব উঠব করছি। ওঠা হচ্ছে না। একটু আগে স্নানের ব্যবস্থাপনায় ে োভ প্রকাশ করেছিলাম। সেটা এখন আর নেই।

হঠাৎ দেখি সামনে কে যেন প্রবলবেগে রণহুঙ্কার দিচ্ছে। চোখ মুছে তাকিয়ে দেখি কমলেন্দু। হাতপা নেড়ে বলে চলেছে — কখন থেকে ভূতের মতো হা করে দাঁড়িয়ে আছি, ওঠার নামগন্ধ নেই। আমি কত চটপট স্নান করে নিলাম আর তুমি?

— চেঁচাচ্ছ কেন? কত(ণ আর স্নান করছি, এই তো এলাম একটু আগে।

— এই তো এলাম? অ্যাঁ, বলছ কী? এই তো এলাম? বলি ডেডবডি ফেলে দেব নাকি!

— ঠিক আছে বাবা এ(ণি উঠছি। দিদিরা চলে গিয়েছেন?

— সে কী আজ নাকি? বছর গড়াল তারপর। ওঠ ওঠ আর এক সেকেণ্ডও নয়।

অগত্যা। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করব না। শুনেছি চর্মরোগীরা ওখানে আকণ্ঠ জলে ডুবে বসে থাকে। সুতরাং পুণ্যার্জন বাদ দিতে হল। জামাকাপড় পরে নিলাম। পাশে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। স্ত্রী স্নান থেকে উঠে এসেছেন জামাকাপড় নিতে।

তাকে দেখে ভদ্রলোক হৈহৈ করে উঠলেন — ওফ, তোমাকে নিয়ে পারা গেল না। আচ্ছা কারো স্নান করতে এত সময় লাগে? বলুন তো মশাই, এতটুকু যদি সময়জ্ঞান থাকে। আরে আরে করছ কী? সব জল পড়ে ভিজে গেল যে। কী মুস্কিল, ভিজে কাপড়ে এখানে দাঁড়ালে কেন?

— আমাকে কাপড়টা বার করে দাওতো, তারপর বকবক কোরো। ভদ্রমহিলা তার জামাকাপড় নিয়ে চলে গেলেন।

নিচু স্বরে কমলেন্দুকে জিজ্ঞেস করলাম — তোমার সঙ্গে এনাদের চেনাজানা আছে নাকি? তোমাকেই ডেকে ডেকে কথা বলছিল মনে হল।

— এগোও, সব বলছি।

পথে নেমে ও তো হেসেই খুন।

বলল — জানো না তো, কী সঙ্গীন অবস্থায় পড়েছিলাম। ভদ্রলোক স্নানে গেলেন তো ভদ্রমহিলা বকবক করতে লাগলেন। আর ভদ্রমহিলা যখন গেলেন, তখন ভদ্রলোক বকে বকে কান ঝালাপালা করে তুলল। দু'জনের মিডলম্যান হলাম আমি। কিছু না বুঝে স্রেফ হু আর হা করে গেলাম।

— এই ব্যাপার, মানে দাম্পত্য কলহ। আমি ভাবলাম সিরিয়াস কিছু।

সুজন সিং-এর ডেরায় এসে যখন পৌঁছেছি, দেখি নীতাদি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। অতি ব্যস্ত। সুরমাদি শয্যায় শুয়ে। নি(মাসি চৌকির কোনে চুপচাপ বসে। অদিতি রান্নার কাজে নীতাদিকে সাহায্য করছে। চালচিত্রটা এই। কিন্তু না, কোথায় যেন কিছু ঘটে গিয়েছে। ঘরের সহজ প্রফুল্লতা উধাও। একটা অস্বাভাবিক নীরবতা বিরাজ করছে। কী হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না বটে কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে চলছে না, এটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে।

নিজেদের মধ্যে কোন মতান্তর হল নাকি? বিষয়টা আবার আমাদের নিয়ে নয়তো? সত্যিই তো আমরা এনাদের কেউ নই। এই মহিলামহলে আশ্রিত হয়েছি। সম্পূর্ণ অচেনা অজানা দু'জন যুবক। এমনটা হওয়া সহজ নয়। মেয়েদের নিরাপত্তা বলেও তো একটা ব্যাপার থাকে। আমাদের মনে হল আসলে এই ব্যাপার নিয়ে আমাদের অনুপস্থিতিতে কোন মনোমালিন্য হয়ে থাকবে। আর কথাটা যেই মনে হল, গৃহচ্যুত হওয়ার আশঙ্কাও দ্রুত বাড়তে লাগল। মাথার মধ্যে ত্র(মাগত ঘুরতে লাগল আমরাই এনাদের মনোমালিন্যের কেন্দ্রবিন্দু। কেন্দ্রবিন্দু।

কী করে ব্যাপারটা জানা যেতে পারে? একমাত্র অদিতিই পারে খোলসা করতে। বারান্দায় একা পেয়ে ধরলাম ওকে — কী ব্যাপার বলুন তো? কী হয়েছে?

— কি আবার হবে? কিছুই হয়নি। সুরমাদি এমনিতেই অসুস্থ। তার উপর এতটা পথ হেঁটে যাতায়াত করেছেন, তাই শুয়ে আছেন। একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

— এমনি মনে হল তাই।

বাড়ির সামনে ফাঁকা মাঠ সূর্যের উদার আলোয় ঝলমল করছে। সিংজীর একখানা চৌকি বাইরে পড়েছিল রোদের মধ্যে। এখন ঘরের বাইরে থাকাই আমাদের প(সমীচীন। চৌকিতে বসে রোদ পোহানো যাক। দুটো টাঙ্গায় করে আরেক পরিবার এল।

পাশের বাড়িতে উঠেছে মনে হচ্ছে। নির্ভেজাল বঙ্গপরিবার। বাবা মা ছেলেমেয়ে। একজন ঠাকুমাও আছেন। মেয়েটি বেশ সুশ্রী।

সকালের জলখাবার কিছু পেটে পড়েনি। মাথায় তাই আদিমতম চিন্তা — ভোজন। (ুধার নিবৃত্তি কি করে করা হবে? খুব ভালো হত যদি আমরা হোটেলে খেয়ে নিতে পারতাম। তাহলে এনাদের অন্তত আমাদের উটকো ঝামেলা একটু কম পোয়াতে হত। হ্যাঁ, যে আশ্রয়টুকু পাওয়া গিয়েছে, সেটা পেলেই আকাশের চাঁদ পাওয়া হবে। তেমন ব্যবস্থাটা বাস্তবে সম্ভব নয়। তবু মনে উঠল সেকথাই — এনাদের সঙ্গে থাকা আর বাইরে খাওয়া। এখন এমন প্রস্তাব নিয়ে নীতাদির কাছে যাবে কে?

— সেটাই তো সমস্যা হে, সেটাই তো সমস্যা। বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?

— একটা কাজ করলে হয়, অদিতিকে ধরলে হয়।

— হ্যাঁ, ওকে বলে দেখা যেতে পারে।

— আমি কিন্তু ওসব বলা-কওয়ার লাইনে নেই। যা বলার তুমিই বোলো।

একরাশ ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে অদিতি আমাদের দিকে আসছে। একরাশ চুল। হাতে ট্রের মতো কিছু। নিশ্চয়ই তাতে নাস্তার আয়োজন। আরেকবার কমলেন্দুর কাছে সানুনয় নিবেদন রাখলাম — প্লিজ তুমি একবার চেষ্টা করে কথাটা বোলো। দেখ ঠিক গড়গড় করে কথা বেরিয়ে আসবে। তোমার অসীম (মতা।

কমলেন্দু শুধু মুচকি হাসল।

অদিতি চায়ের বাটি এনেছে সেই সঙ্গে ডিমসেদ্ধ। ভদ্রতা করে বললাম — ইস, একেবারে বাইরে বয়ে নিয়ে এলেন। ভিতরে ডাকলেই তো পারতেন।

— না না ঠিক আছে, রোদে বসা হয়েছে। আবার ডাকাডাকি কেন?

খাবারের ডিসের দিকে তাকিয়ে কমলেন্দু বলল — করেছেন কি? এত সব খাবার, ভয় পাইয়ে দিলেন যে।

ডিস নামিয়ে চলে যেতে যেতে পেছনে ফিরে চিমটি কেটে বলে গেল — তাই নাকি? দেখি কেমন ভয় পান?

কমলেন্দুকে বলি — কী কথা এখন নীতাদিকে বলবে বল।

— জ্বালালে দেখছি। খেয়ে নাও আগে। কমলেন্দু বলল।

কথা না বাড়িয়ে খাদ্যে মনোনিবেশ করাই যুক্তি(যুক্ত(মনে হল।

অনেক(ণ রোদে বসে শরীর রীতিমতো তেতে উঠেছে। এবার ঘরের দিকে পা বাড়ানো যেতে পারে। নালন্দা যেতে হবে। আমাদের হাতে সময় কম। সবাই মিলে যেতে পারলে খুবই ভালো হয়। তা না হলে আমদেরই যেতে হবে।

রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত নীতাদি। অদিতি সাহায্য করছে। ভিতরে ঢুকে নীতাদিকে জিজ্ঞেস করি — দিদি, আজ নালন্দা গেলে হয় না?

— নালন্দা? আজই যেতে চাইছ তোমরা? বাসটাস কখন ছাড়ে জানি না তো। তোমরা জানো?

— না আমরাও জানি না। তবে জেনে আসা যায়।

অদিতি ফস করে বলে উঠল — আমি এ(ুনি জেনে দিতে পারি।

উত্তরের অপে(া না করে একছুটে বাইরে চলে গেল। নীতাদি বললেন — কোত্থেকে জেনে আসতে গেল জানো? পাশের বাড়িতে একটি ছেলে থাকে। ওর সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছে। তোমাদের বয়সী হবে। তার কাছে জানতে গিয়েছে। ছেলেটার খুব ইচ্ছে আমার সঙ্গে আলাপ করার। আমি পাত্তা দিচ্ছি না। যেচে আলাপ করার সাহসও পাচ্ছে না। আমি নির্বিকার। ইচ্ছে হলে নিজে এসে আলাপ করবে। আমি কেন যাব, বল?

— ঠিকই তো। নীতাদির এই সিদ্ধান্তে আমাদের পূর্ণ সমর্থনের কথা জানালাম।

ইতিমধ্যে অদিতি ঘুরে এসে বলল — আজ নালন্দা যাওয়া হবে না। কারণ আর কোন বাস নেই। নালন্দার বাস ছাড়ে সকাল দশটা নাগাদ।

খবরটা যে নেহাৎ মনগড়া সেটা তখন বুঝিনি। পরে জেনেছিলাম।

নিরামিষ ভোজনপর্ব মিটল। মাংস পাওয়া যায়নি। কুণ্ড থেকে ফিরে আসতে বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে। তা হক। কথাটা হল উদরপূর্তির। সেটা হলেই হল। আমিষ কি নিরামিষ সেটা এখন আর কোন বিষয়ই নয়। ঘরের আবহাওয়া কি একটু ভালোর দিকে? ভালো হলেই ভালো হয়।

একটু পরে রাজগীরের পথে নেমে এসেছি চারজনে। বাড়িতে চিঠিপত্র পাঠাতে হবে। এখানে পিকচার-কার্ড পাওয়া যায় কি না খোঁজ করলাম। পাওয়া গেলে বন্ধুদের সেই কার্ড পাঠিয়ে চমকে দেওয়া যেত। কেমন হুট করে একশ সত্তর মাইল পথ পাড়ি দিয়েছি আমরা সেই রাঁচি থেকে, সেটা না জানালে চলবে কি করে?

নীতাদি চলতে চলতে বললেন — একটা কাণ্ড হয়েছে। সুরমা-নি(মাসি দু'জনেই খুব রেগে আছেন।

মনে মনে বললাম, সে তো ঘরে পা দিয়েই টের পেয়েছিলাম। সব মানুষেরই একটা তৃতীয় নয়ন আছে। এবং সেটা কাজ করে। বিস্তারিত ঘটনা জানা না গেলেও চুম্বক পরিস্থিতিটুকু জানান দেয়। জিজ্ঞেস করলাম — রাগ করলেন কেন? আমরা পাহাড় থেকে নেমে আসতে দেরি করেছি তাই?

— হ্যাঁ ঠিক সেজন্যে। বল, কোন মানে হয়? আসলে সুরমা খুব অসুস্থ তো। নানা রোগে ভুগে ওর কেমন ধারণা হয়েছে যে এই বুঝি ওকে ঠিক যত্ন করা হল না, ওর উপর নজর দেওয়া হচ্ছে না।

— এ তো ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লে-ক্স!

— ওই আর কী। সেজন্যে সারা(ণ ওকে বুঝেসুজে চলতে হয়। একটা কথা শুধু বুঝতে পারি না, সুরমার না হয় সেন্টিমেন্ট বেশি আর সেটা স্বাভাবিকও। কিন্তু মাসিমার তো তা নয়। তাঁর একটু বোঝা উচিৎ ছিল। তা তিনিও রাগ করে রইলেন! এটা ওনার ঠিক শোভা পায় না।

— সুরমাদি তবু শেষের দিকে হাল্কা হতে পেরেছিলেন। মাসিমা হতে পারেন নি। অদিতি বলল।

— কুণ্ডে স্নানের সময় কি হয়েছিল জান? আমি ওই যে একবার ওদের খুঁজতে গেলাম, দেখি, ওরা তখন এক্কা ঠিক করছে বাড়ি যাবে বলে। ঘরের চাবি আমার কাছে তবু ওরা বাড়ি যাবে। কত বারণ করলুম। কিছু শুনতে চাইল না। রাগে ফুলে ঢোল একেবারে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে ওদের সঙ্গে চললাম। কী পরিমাণ রেগে গিয়েছিল দেখ, ওরা যখন ভুল রাস্তা ধরে বাঁদিক দিয়ে যাচ্ছে, বারণ করলুম, ওদিকে নয়, তবু শুনল না। ঘুরেফিরে শেষে যেদিক দিয়ে যেতে বলেছিলুম সেদিকেই গেল। তবু আমার কথা কানে তুলতে চাইল না। কি রাগ বোঝ!

সবে তো গতকাল এখানে আসা হয়েছে। এর মধ্যে এমন ঝগড়াঝাটি হলে তো বাকি বেড়ানো মাটি। সেই আশঙ্কার কথা বললাম — এরকম চললে আজকালের মধ্যে চলে যেতে হবে নাকি?

— দাঁড়াও দেখি। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। তারপর তো। নীতাদি আ(েস্ত করলেন আপাতত।

— আচ্ছা সে যেতে হয় যাবেন। কিন্তু রাজগৃহ থেকে নালন্দা না-দেখে ফিরে যাবেন, সে তো হতে পারে না।

কমলেন্দু চুপচাপ ছিল অনেক(ণ। বলল — এই এত(ণে পরিষ্কার হল ব্যাপারটা। আমাকে বেড়োনোর সময় তাই নি(মাসি বলে দিয়েছিলেন এখানকার স্টেশন থেকে ট্রেনের খোঁজখবর নিয়ে আসতে।

শ্বেতাম্বর জৈন ধর্মশালার পাশ দিয়ে বাস ঘুমটি বাঁ হাতে রেখে বড় রাস্তা ধরে এগোচ্ছি। বিহারশরিফের দিকে। সামান্য এগিয়ে বাঁদিকে রাস্তা গেয়েছে। তারই প্রান্তে রাজগৃহ রেলস্টেশন।

স্টেশন চত্বরটি বেশ। এখানকার সবকিছুর মধ্যে যেন ইতিহাসের গন্ধমাখা। তথাগত বুদ্ধ মহারাজ বিম্বিসার এমন অনেকের স্মৃতি ছড়ানো। সেই প্রাচীন ঐ(র্যময় হিন্দুসভ্যতার উপযুক্ত(ভাস্কর্য শোভা পাচ্ছে জনমানবহীন স্টেশন চত্বরেও।

কিন্তু স্টেশনমাস্টারের দেখা পাচ্ছি না। ঘসঘসিয়া-কা-ডাব্বাখানায় একজন চালাকচতুর রেলকর্মচারিকে পাওয়া গেল। তার দেহাতী রাষ্ট্রভাষা থেকে যা উদ্ধার করা সম্ভব হল, তা হল এই যে, দিনেই বল আর রাতে, সবেধন নীলমণি একটিমাত্র ট্রেন

বেলা তিনটের সময় এই রাজগীর স্টেশন থেকে বক্তি(য়ারপুর যায়। ওখান থেকে দুন বা মোগলসরাই এক্সপ্রেস ধরা যায় হাওড়া যাওয়ার জন্যে। এই তথ্য কতটা নির্ভুল তা নিয়ে একটু সন্দেহ থেকে গেল। (বলে রাখি, এসব অতি পুরাতন তথ্য। এখন আর কোন কাজে আসবে না। বর্তমানে অবস্থাটা বদলেছে। রাজগীর থেকে আস্ত তিনখানা ট্রেন ছাড়ে — পাটনা, দিল্লি এবং সারনাথের দিকে। অদূর ভবিষ্যতে সোজাসুজি রাজগীরও যেতে পারে।)

নীতাদি দুশ্চিন্তার কথাটা গোপন রাখলেন না। বললেন — কে জানে, সুরমা আর মাসিমা আবার নিজেরা ট্রেনে চেপে বসার মতলব করছে কিনা। সুরমা যতই বি(েবিদ্যালয়ের তকমা নিয়ে ঘুরে বেড়াক না কেন, ওর প(ে একা একা এখান থেকে হাওড়া অবধি যাওয়া প্রায় অসম্ভব। পথে যদি কোন আপদবিপদ ঘটে তার জন্যে সবাই কিন্তু আমাকেই দুষবে। কেমন বিশ্রী ঝঞ্ঝাট হল বলোতো!

হাঁটতে হাঁটতে আবার বাস আড্ডার কাছে পৌঁছেছি। বাজারের দিকে না ঘুরে বড় রাস্তা ধরে কুণ্ডের দিকে পা চালাতে চালাতে নীতাদি বললেন — সত্যি ওরা যদি ফেরার বায়না তোলে, তবে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ি ফেরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

অদিতি বলল — এখন কদিন যাওয়ার কোন ট্রেন নেই বললেই তো হয়!

নীতাদি বললেন — ঠিক বলেছ। হাবা দি গ্রেট হলে কি হবে, বুদ্ধি আছে। কমলেন্দু, একটা কাজ করতে পারবে? তুমি ওদের বলবে শনিবার নাগাদ স্পেশাল ট্রেন ছাড়ে এখান থেকে। তাতে করে হাওড়া পৌঁছোনো যায় সহজেই। কোন অসুবিধা হবে না। অন্যান্য দিন ট্রেন আছে বটে কিন্তু সেসবে অনেক হাঙ্গামা। বক্তি(য়ারপুরে নেমে তিন-চার ঘন্টা বসে থাকতে হবে। ওখানে আবার ভয়ানক শীত। মাঝরাতে স্টেশনে বসে থাকাই দায়। বুঝতে পেরেছো তো? এইসব বলেটলে ভয় পাইয়ে দিতে হবে আর কি। নিজেরা নিজেরা যাতে কোলকাতা ফিরে যেতে সাহস না করে। সেই ফাঁকেআমরা রাজগৃহ ঘুরে দেখে নেব।

এত(ণ ধরে এক গভীর সমস্যা আমাদের খুব ভোগাচ্ছিল। তার এমন সরস সমাধান খুঁজে পেয়ে সকলে হো হো করে হেসে উঠল। হাল্কা হওয়া গেল।

নীতাদি বললেন — চল, একটু ঘুরেফিরে বাড়ি যাওয়া যাক। থাক-না ওরা বসে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে।

৭। বিপুলাচল

বক্তি(য়ারপুর পতিতপাবণী গঙ্গার দ(িণ তীরে। পশ্চিমদিকে পাটনা আর পূর্বদিকে ল(ীশরাই। ল(ীশরাই থেকে দ(িণপশ্চিমে নওয়াদা-গয়ার দিকে রেলপথ গিয়েছে। আরো পুবদিকে কিউল জংশন। এখান থেকে রেলপথ গিয়েছে জামালপুর-ভাগলপুর হয়ে সকরিগলিঘাট। আর মেনলাইন মধুপুর-জসিডি হয়ে কোলকাতা।

আমাদের সহপাঠী সুশান্ত সান্যাল আর চিত্ত সাহা রাঁচি থেকে বেড়িয়েছিল রাজগৃহ হয়ে চুনার যাবে বলে। ওদের বোধ হয় ঠিক জানা ছিল না যে চুনার কতো দূরে। পাটনা থেকে দানাপুর-আরা-বক্সার-মোগলসরাই হয়ে এলাহাবাদ। মোগলসরাই থেকে রেল গিয়েছে বিন্ধ্যাচল-মীর্জাপুর লাইনে চুনার। আমরা নিশ্চিত যে সুশান্ত-চিত্ত চুনার পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু রাজগৃহেও তো ওদের দেখা পেলাম না। ওরা গেল কোথায়?

হাঁটতে হাঁটতে কুণ্ডের কাছে এসে পৌঁছোনো গেল। সকালবেলা বৈভার থেকে দেখেছি উল্টোদিকে বিপুলাচলে সোপানপথ এঁকেবেঁকে উপরে উঠে গিয়েছে। সূর্যের আলোয় ঝকমক করছিল পথরেখা। ঐ সব পাহাড়-চূড়োর মন্দির কোন ঐতিহাসিক স্মারক-মন্দির হয়তো নয়। তবু উঁচু চূড়োর সেই নির্জন জনমানবশূন্য মন্দিরে গিয়ে একটু বসতে চাই আমরা। ওখানে পৌঁছলে যেন সব জায়গাটা আমাদের খাস দখলের হয়ে যাবে। পাহাড়-চূড়ো-মন্দির সব আমাদের অধিকারে এসে গেলে ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর হবে ।

মন্দির বলতে আমরা বুঝি কাঁসর-ঘন্টা আর কলরোল। কেমন এক উন্মত্ততা। সত্যিকারের আরাধনার জায়গা হতে পারে কোন বিজন স্থান। একমাত্র নির্জনতায় হতে পারে সাধনপীঠ। কে জানে ওই সব মন্দিরে সাধু-সন্ন্যাসী আছেন কিনা। সোপানপথের পাদদেশে আমরা চারজনে এসে দাঁড়ালাম। একাধিক হোটেল-রেস্তোরার পাশ দিয়ে এগিয়ে।

বিপুলাচলের পাদদেশেও কয়েকটি কুণ্ড রয়েছে। তার মধ্যে সিদ্ধফকির মখদুম শাহ সরফুদ্দিন মনেরীর নামে যে মখদুম কুণ্ড রয়েছে, তারই প্রাচীন নাম ঋষ্যশৃঙ্গ কুণ্ড। পাশ দিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে দেবদত্ত গুহায় যাওয়ার পথ। শাক্যপুত্র দেবদত্ত এখানে বাস করেছিল নাকি। ইনি সম্পর্কে বুদ্ধের ভ্রাতা অথবা শ্যালক হবেন। তাঁর মৃত্যু হয় এই গুহায়। ফকির মখদুম শাহ এই গুহায় বাস করতেন। তাঁর দরগা আছে বিহারশরিফে। গুহার আরেকটু উপরের দিকে পাথরে লাল রঙের দাগ আছে। কেউ কেউ বলে তা জনৈক বৌদ্ধভি(ুর আত্মহত্যার স্বা(র। অন্যরা বলে অলৌকিক শক্তি(বলে ঐ ফকিরের বাঘ হত্যা করার নজির। সামান্য লালচিহ্নে(র ব্যাখ্যা নিয়েও দেখছি বেশ মতভেদ আছে। যে যেমন পারে কাহিনী জুড়ে দেয়।

এদিককার কুণ্ডের প্রায় কোন মানমর্যাদা নেই। সমস্তটাই যেন আস্তাকুঁড়। পর্যটকরা স্নান করতে আসে না এখানে। স্থানীয় লোকজনরা অবশ্য ব্যবহার করে।

নীতাদি সিঁড়ি ভাঙতে পারছিলেন না। বারবার বলছিলেন — তোমরা এগোও। আমি আস্তে আস্তে উঠছি।

অদিতিকে প্রস্তাব দেওয়া হল চূড়োয় ওঠার। হৈ হৈ করে রাজী হয়ে গেল। যেন এটাই চাইছিল। আমরা তিনজনে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে শু(করলাম। একটু একটু করে নীতাদির সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বাড়ছিল।

সকালবেলা যখন বৈভারে উঠছিলাম তখন অদিতিকে বলেছিলাম — আপনি কি আমাদের মতো পাহাড় চড়তে পারবেন? কখন পড়েটড়ে গিয়ে আছাড় খাবেন। শেষকালে একটা কেলেঙ্কারি হবে!

কথাটা ও মনে রেখেছিল। তাই কমলেন্দু যখন বলল 'সিঁড়ি ছেড়ে পাথর ডিঙিয়ে যাবেন নাকি', ও তখন সকালের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে ছাড়ল না।

সিঁড়ি ছেড়ে আমরা পাথর ডিঙোতে শু(করেছি। এতে কৃতিত্ব বেশি বলে মনে হচ্ছিল। যাত্রাপথ এমন কিছু দুর্গম ছিল না। কিন্তু আমাদের মনে তখন অনেক কল্পনা। পথের দুর্গমতার সবটাই আমাদের মনে। সামনে এসে দাঁড়াল বিশাল প্রস্তরখণ্ড। 'যেতে নাহি দিব' ভাব করে। তিনজনেই অবলীলায় সে কঠিন পথ পার হলাম। এমনধারা অনেক পাথুরে বাঁধাবিঘ্ন ঝোপঝাড় অতিত্র(ম করে চলেছি। সামান্য কসরত করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু আমাদের কাছে সেসব কিছুই নয়। এক বঙ্গললনার কাছে অবশ্য অনেক কিছু। শাড়িটাড়ি সামলে পথচলা বেশ দুষ্কর। তবু অদিতির চোখে খুশির ঝিলিক। মেয়েটা সকালের বিষণ্ণতা যেন এবার পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। কয়েকবার শাড়ির বেয়াদপি সামলে শেষকালে (ুব্ধস্বরে বলে উঠল — এজন্যেই স্ল্যাক্স্ পরে আসা উচিত ছিল। শাড়ি পড়ে পাহাড়ে চড়া যায় নাকি?

স্ল্যাক্স্ পরে এলে অদিতির সঙ্গে আমাদের এই পর্বতারোহণটা সম্ভবত বাস্তবায়িত হত না। তাই মনে মনে বলছিলাম, ভাগ্যিস পড়ে আসেনি। মানছি, পাহাড়ের উপরের দিকে কাঁটাগাছের ঝোপঝাড় যা শু(করল তাকে আর ভদ্রতা বলা যায় না। আমরাও নাজেহাল হয়ে যাচ্ছিলাম। শরীরের উপর শাসন করে গেল বারকয়েক। আর কত(ণ? অদিতির শাড়ি ছিঁড়ল দেখে বললুম — চলুন এবার সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া যাক।

— ঠিক আছে, কিছু হবে না, চলুন তো।

আমাদের উৎসাহ খানিকটা স্তিমিত হলেও, ওর উৎসাহে তখনো ভাঁটা পড়ে নি। সত্যি মেয়েটার অদম্য জীবনীশক্তি(র প্রশংসা করতে হয়।

হঠাৎ শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠতেই হল। জনমানবহীন চারিদিক। বনজঙ্গলে ভরা। বিশাল পাইথন নেই তো এখানে? কোনো বাঘ? নিদেনপ(একটা ভালুক?

— দাঁড়ান একটু। অদিতির গলা।

চমকে পেছনে ফিরে তাকাই। সত্যি সত্যি কোন জন্তুজানোয়ার এল নাকি? তাহলে বীরত্বপ্রদর্শন না পৃষ্ঠপ্রদর্শন? কোন দিকে ঝুঁকব? কোন দিকে ছুটব ?

— চুল আটকে গেল। দাঁড়ান একটু। জট ছাড়ানো যাচ্ছে না। ধ্যাৎ।

কমলেন্দু চুলে জড়ানো ডালখানা ভেঙে ফেলল। এবার সত্যিসত্যি লজ্জিত হলাম। বললাম — পি-জ আর নয়। অনেক বীরত্ব হয়েছে। আপনার অসুবিধে হচ্ছে খুব।

— না না অসুবিধে কোথায়? আমার তো বেশ ভালো লাগছে। নিন চলুন।

ত্র(মাগত আমাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে গেল। অবশ্য আরো কিছুদূর যাওয়ার পরে বোঝা গেল যে এবার সিঁড়ির পথে উঠে যেতেই হবে। পাথর-বাঁধানো ধাপ ভেঙে পা ফেলতে ফেলতে অদিতি বলল — আপনাদের কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।

— এই রে, একেবারে ধন্যবাদ অবধি পৌঁছে গেলেন। এ ভারী অন্যায়।

— তা নয়। সত্যি বলছি আপনারা না থাকলে আমার তো এমন মজা করে পাহাড়ে চড়া হত না। বুড়োদের মতো সিঁড়ি বেয়ে চলায় কোন মজা নেই। ঠিক কি না বলুন?

— হ্যাঁ সে কথা ঠিক। কোলকাতার বাইরে এসে এমন হৈচৈ করে ছুটোছুটি করে না ঘুরতে পারলে বোঝাই যেত না যে আমরা পারি, আমরা ছুটতে পারি। হাঁপাতে পারি। আবার দৌড়তে পারি। আমাদের প্রাণশক্তি(বলে একটা জিনিস আছে।

প্রাণশক্তি(তে কমলেন্দু অনেক এগিয়ে। সেটা প্রমাণ করতে ও ধা করে ছুটে গেল এক দিকে। খানিক(ণ পরে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল। জিজ্ঞেস করলাম — কতটা গেলে?

— খানিকটা গিয়ে পালিয়ে এলাম। কিচ্ছু নেই দেখার মতো।

— সবটা যেতে পারেন নি তাহলে। অদিতি মন্তব্য করল।

রাজগৃহের গোটা ছবিটা এখান থেকে বেশ ধরা পড়ছে। চারদিকে পাহাড়ের রেখাচিত্র। বিপুলাচল বোধ হয় রাঁচি হিলের থেকেও উঁচু। দুটি পাহাড়ের মাঝে উষ(কুণ্ডের চত্বর, কয়েকটি এক্কাগাড়ি দেখা যাচ্ছে সেখানে। অল্প মানুষজন রয়েছে। মানুষগুলোকে লিলিপুটের মতো দেখতে লাগছে। কমলেন্দু বলল — এতটাই যখন উঠে আসা গেল তখন শেষ অবধি না গেলে বড্ড গরীব মনে হবে।

চিত্র-৬। বিপুলাচল থেকে রাজগৃহ।

বন্ধুকে সমর্থন করে বললাম — হ্যাঁ বড্ড গরীব আর ক(ণ হবে ব্যাপারটা।

— ওমা তাই নাকি! বড্ড গরীব আর ক(ণ মনে হবে? তবে তো শেষ অবধি যেতেই হয়। সমান চপলতায় অদিতি হাসতে হাসতে বলল।

ওপর থেকে কয়েকজন যাত্রী নিচে নেমে এল। সকলেই বঙ্গদেশীয়। বাক্যবিনিময় হল না তাদের সঙ্গে। চারদিক নিঝুম। জমাট নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। এত বেশী নির্জনতায় আবার একটু ভয়ও হয়। আমাদের তিনজনের মধ্যেও আর কোন কথা হচ্ছে না। দিনের আলো ত্র(মশ ফুরিয়ে আসছে। অদিতি হঠাৎ বলে উঠল — একটু পথ কোথায়? এ তো চলেছি আর চলেছি।

— আপনি জানেন না, 'একটু পথ' কাকে বলে? ধ(ন, গ্রামের পথে চলতে চলতে আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করলেন — ভাই অমুক জায়গাটা কতদূর? অমনি জবাব পাবেন — দু' কোশ। খানিক(ণ পরে আবার প্র(ন ক(ন। জবাব পাবেন দু' কোশ। যতবারই জিজ্ঞেস করবেন, উত্তর সেই একই, দু' কোশ। এই হল একটু পথ বলতে কী বোঝায় তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

হাসতে হাসতে আমরা পাহাড় চূড়োর এক মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। নির্জন জনমানবহীন জায়গা। শুধু প্রকৃতিদেবী আছেন। বেশ জোরে হাওয়া বইছে। স্নিগ্ধ নির্মল বায়ু। ইচ্ছে করলে সহজেই উন্মনা হওয়া যায়। একাধিক মন্দির রয়েছে এখানে। মন্দির বলতে অবশ্য অনুচ্চ অপ্রশস্ত গর্ভগৃহ আর দীর্ঘকায় মন্দিরচূড়া। প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও আছে হয়তো। একটিতে জৈন ধর্মগু(মহাবীরস্বামীর মূর্তি দেখা গেল। মহাবীরস্বামী সিদ্ধিলাভের পরে এখান থেকে প্রথম ধর্মপ্রচার শু(করেন বলে জৈনদের বি(াস। তিনি রাজগৃহে চৌদ্দটি বর্ষাঋতু কাটিয়েছেন। তাঁর এগারো শিষ্য বা গান্ধার রাজগৃহের বিভিন্ন পাহাড়ের উপর নির্বাণ লাভ করেন। জৈনরা ঐ সকল পাহাড়ে চড়েন তীর্থের পুণ্য অর্জন করতে। তাদের জন্য ডাণ্ডি করে পাহাড়ে ঘোরার ব্যবস্থা রয়েছে। বিংশতি তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রতর জন্মও নাকি রাজগৃহে।

চারিদিকে পাহাড়। এত পাহাড় আছে এদিকে? সব পাহাড়ের মাথায় বোধ হয় একাধিক মন্দির তৈরী করা হয়েছে। বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে মন্দিরগুলো। রোদের জেল্লা আস্তে আস্তে নিভে যাওয়ার মুখে। আকাশে মালিন্য জমছে। বৈভার পাহাড়ের পিঠে সূর্যের রক্তি(ম অগ্নিবলয় কখন অস্তাচলে গিয়েছে। পশ্চিম আকাশের পলাশ রঙটা এখন পাণ্ডুর। গোধূলীসাজের ঈষৎ রক্তি(ম কালো-হরিণ-চোখের এই সন্ধ্যা। কোথাও কোন নিয়ন জ্বলল না। আলোকসজ্জায় বর্ণবিলাসে ব্যস্ত চৌরঙ্গীর মতো সন্ধ্যা এখানে অপরূপা ঝলমলে হল না। এখানে সন্ধ্যা সাজতে শু(করল প্রকৃতির সরল সাজে। গোধূলির লজ্জারাগে আরক্ত(কপোলের রক্তি(মতা মুছে গেল। রাজকুমারী দীর্ঘ কালো কেশরাশি আলুলায়িত করে দিল। নির্জন আঁধার টপ টপ করে আকাশ থেকে ঝরতে লাগল বিন্দু বিন্দু করে। ধরণী আবৃত করে। এ হল পাখিদের নীড়ে ফেরার সময়। ডানার ক্লান্তি মুছে ফেলে

আশ্রয়ে বসার পালা। কে এখন আকাশে থাকে? যে থাকে সে তো একাকী, নিঃসঙ্গ একাকী। ওই তো সন্ধ্যাতারা আকাশের জানালায় রূপোলী মুখ বাড়িয়ে রেখেছে। একাকী।

মন্দিরের পাশে একটি স্তূপ। সমতল কিন্তু অপ্রশস্ত। নীরব আত্মচিন্তায় ধ্যানমগ্ন হওয়া যায় এখানে বসে। স্মৃতিবিলাসে সময় কাটানো যায়। না, আমরা কোনটাই করতে পারব না। কেননা আমরা আমরা বলে। আত্মমগ্ন হতে হয় একাকী।

অদিতি ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফিরে যাওয়ার জন্যে। এবার নিচের দিকে পা বাড়ানো গেল। একটু নেমে দেখা হল নীতাদির সঙ্গে। তিনি তখনো উপরে ওঠার জন্যে সমানে লড়ে যাচ্ছেন। বয়সের ভারে পীড়িত শরীরকে অনেক প্রবোধবাক্যে এবং নিন্দাবাক্যে চাঙা করতে করতে। অনেক পাতা কি ঝরে গিয়েছে তাঁর জীবন থেকে? ঠিক জানা নেই। খুব ইচ্ছে থাকলেও অতীতের উদ্দাম দিনগুলোতে ফেরার কোন উপায় নেই কারো।

পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো রয়েছে ছোট ছোট সমতলখণ্ড। নীতাদি বলে উঠলেন — সুন্দর বনভোজনের জায়গা তো। এখানে বসে রান্না করে খেলে বেশ হয়।

— বনভোজন না হোক, একটু বসা যেতে পারে তো?

— না বাবা, আপাতত কোথাও বসার মতো সময় নেই হাতে। সুজন সিং-এর ডেরায় দু'জন বি(ৃদ্ধ প্রাণীকে রেখে আসা হয়েছে। সেকথা ভুললে চলবে না।

— সত্যি অনেক(ণ বাইরে কাটানো হয়েছে। এবার ঘরে ফিরতে হবে।

বৈভার-বিপুলাচলের পাদদেশে যে উঁচু চাতাল রয়েছে, তার উপর অনেক দোকানপাট। পাহাড় থেকে নিচে নেমে ওখানে রেস্তোরায় বসা হল। খোলা আকাশের নিচে। এত(ণে খেয়াল হল যে খিদে পেয়েছে কারণ বিকেলের জলখাবার খাওয়া হয় নি কারো।

অনেক(ণ ধরে পুরোনো প্র(টা ত্র(মাগত খোঁচা দিচ্ছিল। খাবার টেবিলে সুযোগ পেয়ে নীতাদিকে জিজ্ঞেস করলাম — দিদি, তাহলে আগামীকাল কি আমাদের নালন্দা যাওয়া হচ্ছে না?

— আমরা যাই বা না যাই, তোমরা যাবে না কেন? তোমাদের এমনিতেই সময় কম। ঘুরতে এসেছ, দেখেশুনে যাও। আমাদের বেরোনো তো বুঝতেই পারছো, ওদের মতিগতির ওপর অনেকটা নির্ভর করে আছে।

— হ্যাঁ, তা বুঝতে পারছি। তবু সকলে মিলে একসঙ্গে যেতে পারলেই ভালো হয়।

সত্যি কথা, আমাদের হাতে সময় মাপা। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাঁচি ফিরতেই হবে। একটা দিনও নষ্ট করা সম্ভব নয়। তাই বলে ওনাদের ফেলে আমরা ঘুরে আসি কি করে? সেটাও যে খুব জঘন্য ব্যাপার হবে। ভালোও লাগবে না।

কমলেন্দু আমাকে ইশারায় বলল যে বৈকালিক নাস্তার দামটা ও দিতে চায়। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালুম।

অনেক সাহস সঞ্চয় করে যথেষ্ট বিনয় সহযোগে ও বলল — দিদি যদি কিছু মনে না করেন, তবে এই দামটা আমি দিয়ে দিচ্ছি।

নীতাদি চোখ বিস্ফারিত করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন — ও কী কথা! আমাদের সঙ্গে খাচ্ছ বলে তার প্রতিদান দিতে হবে নাকি? আশ্চর্য ছেলে বাবা! কি সব কাণ্ড করছ?

এমনভাবে বললেন কথাগুলো যে তারপর আর কথা থাকে না। আমরা চুপ হয়ে যাই। ব্যাপারটা সেখানেই ইতি হতে পারত যদি না অদিতি মধ্যিখানে ফোঁড়ন কাটত — ও কি দিদি? আপনি অমন করে বললেন কেন? চোখ পাকিয়ে বলবেন তো, আশ্চর্য, তোমাদের স্পর্দ্ধা তো কম নয়, আমার সামনে এমন কথা বলার সাহস তোমাদের হল কী করে?

বেশ যাত্রার ঢঙে বলে গেল। আর তারপরে চারজনেই তুমুল হাসিতে গড়িয়ে পড়ল।

কমলেন্দু শুধু খোঁচা খেয়ে নিচু স্বরে বলল — হাবা দি গ্রেট!

সুজন সিং-এর ডেরায় ফিরে নীতাদি রান্না নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অদিতি ব্যস্ত তাকে সাহায্য করতে। সুরমাদি আর নি(মাসি মুখ বুজে শুয়ে রইলেন। আমরা ব্যস্ততাহীন। বাক্যালাপ সচল রাখতে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

স্টোভের সোঁ সোঁ শব্দ অগ্রাহ্য করে এলোমেলো কথাবার্তা চলছে। ভেতরে ভেতরে মনোমালিন্যের চোরা স্রোত বইছে। নতুন করে কেউ কোন বিপর্যয় ডেকে আনতে চাইছে না। সকলেই বেশ যত্ন সহকারে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছে অপ্রিয় প্রসঙ্গ। স্বাভাবিকতা বজায় রাখার প্রয়াস অব্যাহত। একটু গানের চর্চা হল। তারপর আহার পর্ব।

আমরা দুই ভাই কালহরণ না করে দ্রুত উদরের দায় সামলে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছি। ঘুম নেই চোখে। চোখ বন্ধ করে ঘুমোনোর ভান করে শুয়ে আছি। রাজগৃহে আমাদের সামনে দ্বিতীয় রাত্রিযাপন। ওদিকে অদিতিও শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে। নীতাদি সুরমাদিকে নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন। তারপর আসন বিছিয়ে নি(মাসিকে ডাকলেন — আসুন মাসীমা, খেতে বসুন।

মাসীমা বুঝি এই মুহূর্তটির অপে(ায় ছিলেন। অব(দ্ধ জলস্রোত বাঁধ ভেঙে তুমুল কলরোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন। (ৃদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন — নীতা, কালকে আমরা চলে যেতে চাই। তুমি আমাদের একটু ট্রেনে তুলে দাও। তাহলেই হাওড়া চলে যেতে পারব। আমার মনটা মোটেই ভালো লাগছে না। একেবারে স্থির নেই। তার থেকে বাড়ি ফিরে যাই। সেই ভালো। অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে বিদেশে বেড়িয়েছি। কোথায় কোন বিপদ ঘটবে, কখন অসুখ বাড়বে কে জানে? তার থেকে বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো। ঘরের মেয়ে ঘরে নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচি। তুমি আমাদের কালকের গাড়িতে তুলে দাও শুধু।

বন্ধ চোখ বন্ধ করলাম সভয়ে। শ্রবণেন্দ্রিয় ভ্যানিস করতে পারলেই ভালো হত। তা তো আর সম্ভব নয়। অপে(া করছি (দ্ধ(াসে পরবর্তী দৃশ্যের জন্যে।

নীতাদি উত্তেজনা প্রকাশ করলেন না। কণ্ঠস্বর গম্ভীর হল মাত্র। বললেন — সে যেতে হয় যাবেন। এখন তো উঠে খেয়ে নিন।

আরো দুএকটি কথার পরে নি(মাসি খেতে বসলেন। একটু পরে খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন — তুমি খাবে না নীতা?

— না আমার খিদে নেই। এই কথা বলে নীতাদি সুটকেস নিয়ে বসলেন। জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ হচ্ছিল।

মাসীমার কথা শোনা যাচ্ছে — কেন খাবে না কেন?

— আমার ইচ্ছে। ছোট্ট জবাব নীতাদির।

তার মানে নীতাদিও ভিতরে ভিতরে রেগে গিয়েছেন খুব। হওয়ারই কথা।

আমরা ভাবছি এমন মৌজ করে মহাসুখে রাজগৃহ বেড়ানোর পর্ব শেষ হয়ে গেল বোধ হয়। তাহলে ওনারা বুঝি চললেন বাড়ি। আগামীকাল ট্রেনে উঠবেন নাকি পরের দিন? মাত্র এক দিনের মধ্যে এমন সুখশয্যার সমাপ্তি হয়ে যাবে? খুব দুর্ভাবনা হচ্ছে। সুখ যে পদ্মপাতার টলমলে জল, তা নিয়ে আর কোন সংশয় নেই। এখন আমরা কী করব?

আসলে রাজগৃহ পাড়ি দিতে আমরা খানিকটা বাধ্য হয়েছিলাম। রাঁচির যে মেসে আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেখানে মেসের সদস্যরা একে একে এসে পড়ছিল বলে শয্যার অভাব উপস্থিত হল। অন্তত কয়েকটা দিন অন্যত্র বাস করতে হবে। নয়তো কোথাও পালাতে হবে। রাজগৃহে বেড়ানোর ভাবনা তখন মাথায় আসে। অনন্যোপায় হয়ে অশোক মোতায়েদের কাছে টাকা ধার করেছি। ওরা তখন রাঁচিতে সার্ভে ক্যাম্প করতে এসেছে। কোলকাতায় অশোক তথা কাজল দাস আর মুজাফফর আহমেদের কাছে জ(রী চিঠি পাঠিয়ে অর্থের ব্যবস্থা করতে অনুরোধও করা হয়েছে।

বিহারের ওদিকটায় শীতের প্রকোপ বেশী। গরম জামা কাপড় প্রয়োজন। ক্যাম্পের বন্ধুদের একজনের কাছে সোয়েটার, আরেকজনের কাছে গ-াভস, জুতো, টুপি ইত্যাদি সংগ্রহ করে মেসের পাততাড়ি গুটোতে হয়েছিল আমাদের। সুশান্ত সান্যাল আর চিত্ত সাহা আগেই রাজগৃহের দিকে বেরিয়ে পড়েছে। 'জয় মা কালি' বলে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। পরের শনিবার আমাদের রাঁচি ফিরতেই হবে। রাতে কোলকাতা ফেরার ট্রেন ধরতে হবে।

সবই বেশ ভালোয় ভালোয় চলছিল। এমন কি অশোকের আমপাড়ার উপযোগী হাতঘড়িটা পর্যন্ত ঠিক ঠিক সময় দিয়ে যাচ্ছিল রাজগৃহে এসে। না, ওটার আর কান

মুলতে হচ্ছিল না। কেমন মানুষ হয়ে যাচ্ছিল। তারপর কোথা থেকে কি আশ্চর্যভাবে আমাদের দেখা হল এই চারজন মহিলার সঙ্গে। জুটল আশ্রয়। সুজন সিং-এর ডেরায়। তা কি কয়েক ঘন্টার জন্য? হঠাৎ কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল! সুখের সাম্রাজ্য যেন ধুলায় মিলায়ে যায়! কমলেন্দু ফিস ফিস করে বলল — কপাল পুড়ল আমাদের। আর ভেবে লাভ নেই। ঘুমোও এবার। কাল দেখা যাবে।

একবার মহারাজ বিম্বিসার সরস্বতী নদীতে অবগাহন করে ফিরছিলেন রাজপ্রাসাদে। সন্ধ্যা নেমেছে। যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছে প্রাসাদে ফিরতে। ইতিমধ্যে রাজপুরীর অন্তঃপ্রাচীর-সংলগ্ন প্রবেশদ্বার (দ্ধ হয়ে গিয়েছে যথাসময়ে। মহারাজেরই নির্দেশমতো। ফলে রাজনির্দেশে রাজাই বন্দী হয়ে পড়লেন। রয়ে গেলেন প্রাসাদের বাইরে। কি আর করেন! সেদিন বেনুবনে চলে গেলেন রাত্রিযাপন করতে। ভগবান বুদ্ধের সান্নিধ্যে। আচ্ছা, রাজার নিজের নির্দেশে রাজা কি কখনো এমন দৈন্যদশায় পড়তে পারেন। রাজনির্দেশ প্রজাদের জন্য। রাজার জন্য নির্দেশ নেই। কেননা রাজাই তো স্বয়ং নির্দেশ।

৮। গৃধকুটের পথে

শেষরাতে ঘুম ভাঙল। বুঝতে পারছি কমলেন্দুও জেগে রয়েছে। কথা বলছি না। কথা বলছে না। নীতাদি-অদিতির ঘুম ভেঙেছে। ওরা কিছু বলাবলি করছিল। বোধ হয় ট্রেনের সময় নিয়ে। ঠিক বোঝা গেল না।

হাতমুখ ধুয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বাইরে এসেছি। অদিতিকে বারান্দায় পেয়ে জিজ্ঞেস করা হল — আজ আপনারা চললেন নাকি?

— জানি না, কিছুই জানি না। কি হবে না হবে একমাত্র দিদি জানেন।

ঘরে বসে কী আর করি? সেই রানা নামক ছেলেটির পরামর্শ মতো এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে বেরিয়ে পড়লাম সাতসকালে। নীতাদি বেরোলেন না। মনে হচ্ছে ওনাকে কিছু অপ্রিয়কার্য করে যেতে হবে সুরমাদি এবং নি(মাসির সন্তোষ বিধানের জন্যে। বড্ড বিশ্রী লাগল। অদিতি আমাদের সঙ্গিনী হল। শীতের দাপট মোটেই অগ্রাহ্য করার মতো নয়। তো ক্যা হুয়া! পরোয়া করব না কাউকে?

উষ(কুণ্ডের আগে পাকা সড়কের উপর পড়ল রাজধানী রাজগৃহের ঐতিহাসিক প্রাচীর। আসলে এটি অজাতশত্রু গড়ের প্রাচীর। বৈশালীর লিচ্ছবি গণতন্ত্র ধ্বংস করে সেই কীর্তি অম্লান রাখতে মগধরাজ অজাতশত্রু নতুন এক দুর্গনগরীর পত্তন করেছিলেন। মতান্তরে বিম্বিসার দুর্গের নির্মাতা। তবে অজাতশত্রুর দুর্গ নামেই বেশি প্রচলিত। গড় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায় অবস্থিত প্রাচীন রাজগৃহের বাইরে। একদা তিন মাইল লম্বা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পশ্চিম দিয়ে বয়ে যেত সরস্বতী নদী। বর্তমানে প্রাচীর ছাড়া আর কোন স্মারক চিহ্(নেই। প্রাচীরের দ(ণদিকের প্রবেশ তোরণটি এখনো টিকে আছে। দু'পাশে দুটি অর্ধবৃত্তাকার বু(জে দুর্গের কলাকৌশল সুরি(ত। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় গড়ের পশ্চিমে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর সম্রাট অজাতশত্রু স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে সম্রাট অশোকও একটি স্তূপ, হস্তীশীর্ষযুক্ত(স্তম্ভ এবং দুটি সঙঘারাম নির্মাণ করেছিলেন। বর্তমানে সেসবের অবশেষ বলে কিছু নেই। মাটির উঁচু টিলা মাত্র রয়েছে।

চিত্র-৭। অজাতশত্রু স্তূপ।

চলার পথে এক ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল। খানিকটা উঁচু জায়গায়। মন্দিরের মেঝের ী(ণ আভাষ মেলে কি মেলে না। তবে অনেকগুলো শ্রেণিবদ্ধ স্তম্ভের চিহ্(আছে।

ভাঙা প্রস্তরখণ্ড চারদিকে বি(প্তভাবে ছড়ানো। কালের অনিবার্য প্রকোপের উজ্জ্বল স্বা(র। এটা কি অজাতশত্রু স্তূপ? রয়েছে আধুনিক কালের দুটি বৌদ্ধ মন্দির। একটি বর্মি মন্দির অন্যটি জাপানি মন্দির।

কুণ্ড পেছনে ফেলে আরো সামনে এগিয়ে গেলে প্রাচীন নগরের বহিঃপ্রাচীরের উত্তরদ্বার পড়ে। আরো কিছুটা এগিয়ে অন্তঃপ্রাচীরের উত্তরদ্বার পাওয়া যায়।

আধা মাইল দূরে পাওয়া যায় মণিয়ার মঠ। এটি সংরি(ত প্রাঙ্গন। মাঝখানে গোলাকৃতি মন্দির। উপরে টিনের চালাছাদ। চারদিকে ইটের তৈরী দু-তিন ফুট উঁচু ছোট ছোট গোলাকার ও বর্গাকার বেদী। সবুজ ঘাস। এ সব কী প্রাচীন কোন মন্দির? নাকি মহাভারতীয় যুগের যজ্ঞশালা?

চিত্র-৮। মনিয়ার মঠ।

অতীতে এখানে ইটের টিলা ছিল এবং তার উপরে জৈন মন্দির ছিল। ১৮৬১-৬২ সালে লর্ড কানিংহাম টিলা খনন করে তিনটি মূর্তি পেয়েছিলেন। একটিতে পালঙ্কে শায়িতা মায়াদেবী এবং উপরের দিকে তাপস বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত। দ্বিতীয়টিতে খড়্গাসনে নগ্ন পু(ষমূর্তি ছিল। তা র মাথার উপরে ছিল সাত মাথাওয়ালা সাপের ফণা। এটি জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি হতে পারে। তৃতীয় মূর্তিটি অস্পষ্ট। এরপর ১৯০৫-০৬ সাল নাগাদ ব্লক সাহেব আবার খোদাই করেন। তখন ফুট দুয়েক উচ্চতার কিছু মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। চুনবালিতে উৎকীর্ণ স্টাকো মূর্তি। যেমন, পুষ্পমাল্য বেষ্টিত শিবলিঙ্গ, মুকুটধারী চতুর্ভুজ বিষু(, শিরোপরি ফণাযুক্ত(এক নাগ ও পাঁচ নাগিনী মূর্তি, সর্পবেষ্টিত গণেশ, ভুজঙ্গভূষণ ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত ষড়ভুজ নৃত্যরত শিব। কলাকৌশল গুপ্তকালীন বলে অনুমান। গণেশমূর্তি বাদে অন্যগুলির অবস্থা ক(ণ।

মঠমন্দিরে ওঠার জন্যে উত্তরদিকে কয়েকধাপ সিঁড়ি আছে। উপরে উঠে আবার নিচের দিকে নেমে যেতে হবে। দুটি দেয়াল দিয়ে ঘেরা মন্দির। দুই দেয়ালের মধ্যবর্তী জায়গায় প্রদ(ণ পথ। জানা যাচ্ছে, প্রথমে মোটা দেয়ালের গোলাকৃতি মন্দির ছিল। তার উপর দেয়াল গাঁথা হয় এবং অলঙ্করণাদি যুক্ত(হয়। মূর্তি বসানোর জন্য তাকও তৈরী হয়। পরে মূর্তির উপরে আবার দেয়াল তোলা হয়েছিল। বর্তমানে সবকিছুর জরাজীর্ণ দশা। নিচে যে গহ্বর দেখা যাচ্ছে, তার ভিতরে কিছু নেই। তবে ইটের ইমারতের নিচে পাথরের নির্মাণ ছিল। না খুঁড়লে সেসব জানা সম্ভব নয়।

পুরাকালে দেশের অনেক জায়গায় নাগদেবতার পূজা প্রচলিত ছিল। গিরিব্রজেও মণিনাগ এবং স্বস্তিকনাগ নামে দুটি নাগদেবতার কথা মহাভারতের সভাপর্বে বলা

হয়েছে। আরো উল্লিখিত হয়েছে যে এখানে স্বস্তিক এবং মণিনাগের আলয় ছিল। মণিনাগ নগরের সংর(ক দেবতা। হয়তো তার নামেই রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই মণিয়ার মঠ। অন্যমতে মণিভদ্র নামক যে(র পূজার জন্যে এখানে মণিমালা নামের চৈত্য ছিল। তা থেকে মনিয়ার মঠ নামকরণও হতে পারে। কোনটা সত্যি কে জানে! একটি মূর্তির নিচে মণিনাগ কথাটি অবশ্য লেখা আছে। তাছাড়া প্রাঙ্গণে মাটির অনেক কলস পাওয়া গিয়েছে। কিছু কলস বহুমুখী, অনেকটা বাংলাদেশে প্রচলিত মনসাপূজায় ব্যবহৃত কলসের মতো। এসব থেকে মনিয়ার মঠ নাগদেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত এমন ভাবনাই জোরদার হয়।

চিত্র-৯। শোনভাণ্ডার।

মঠের পাশ দিয়ে ডানদিকে এগিয়ে গিয়েছে পশ্চিমমুখী পথ শোণভাণ্ডারের দিকে। শোণভাণ্ডার না স্বর্ণভাণ্ডার? একদা পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছিল দুটি গুহা। ছাদ-ভাঙা পশ্চিম গুহায় একটি দরজা ও একটি জানালা দেখা যাচ্ছে। গুহাগাত্রে প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ। জানা যাচ্ছে, এখানে তৃতীয় কি চতুর্থ শতকে জৈনসাধুদের বসবাস ছিল। পূর্বদিকের গুহার সামনে ছাদওয়ালা বারান্দা ছিল। ইটের ইমারতটি ছিল দ্বিতল। এখন নেই। তবে পাথর-কাটা সিঁড়িটা শুধু রয়ে গিয়েছে। বারান্দায় গুপ্তযুগের গ(ড়বাহন বিষু(মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। ভিতরে দ(ণ-দেয়ালে ছয়টি মূর্তি খোদিত। তার মধ্যে তিনটি মূর্তি জৈন সম্প্রদায়ের পদ্মপ্রভ, পার্শ্বনাথ ও মহাবীরস্বামীর।

চিত্র-১০। শোনভাণ্ডারের মূর্তি।

জনশ্রুতি — গুহায় মহারাজ জরাসন্ধের কোষাগার ছিল। অথবা মহারাজ বিম্বিসারের। কোনো গুপ্তদ্বার গিয়ে মহারাজা নাকি স্বর্ণভাণ্ডারে যেতে পারতেন। গুহার ভিতর দিকে আরো অনেক গুহা আছে বলে লোকের বি(্বাস। সেখানে আজো সঞ্চিত আছে কোষাগারের অমিত ধনরাশি। গুহার দেয়ালে যে শঙ্খলিপির চিত্র রয়েছে, তার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অনেকের বি(্বাস, গুপ্তদ্বারের রহস্য জানা যাবে এই লিপি পাঠ করা সম্ভব হলে।

শোনভাণ্ডার হয়ে পথ জেতিয়ান উপত্যকায় চলে গিয়েছে। বৌদ্ধসাহিত্যে তাকেই লখিবন বা জেতুবন বলা হয়েছে। শ্রাবস্তীতে রয়েছে বুদ্ধশিষ্য অনাথপিণ্ডদের জেতবন বিহার। সেটা অন্য জেতবন। ওদিকে পড়ছে রণভূমি যেখানে ভীম-জরাসন্ধের মধ্যে মল্লযুদ্ধ হয়েছিল। আমরা ওদিকটায় যাইনি। বড্ড জঙ্গল। আর খানিকটা ভয়ে।

মণিয়ার মঠ থেকে বাঁদিকের রাস্তা ধরে গৃধকূটের পথে এগোচ্ছি। পথে পড়ল বিম্বিসার কারাগার। দুশ' বর্গফুট বর্গাকার এলাকা। চার হাত মোটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা এই জেলখানা। চার কোণে চারটি বু(জ। পাথরের কুঠুরি ও লোহার হাতকড়ি-আঙটার ব্যবস্থাপনা দেখে কারাগার বলেই মনে হয়। অজাতশত্রু এখানে পিতা বিম্বিসারকে বন্দী করে রেখেছিলেন! পুত্রের হাতে বন্দী পিতা! তবু নাকি পিতার সান্ত্বণা ছিল যে কারাগার থেকে তিনি গৃধকূটে পদচারণারত বুদ্ধদেবের দর্শন পেতেন। বিম্বিসারের মৃত্যু হয়েছিল এই কারাগারে। কথিত আছে, যেদিন বন্দী বিম্বিসারের মৃত্যু হয়, সেদিনই জন্ম হয় অজাতশত্রুর সন্তানের। সন্তানস্নেহ কি বস্তু সে সম্পর্কে অবহিত হন পিতৃত্ব অর্জন করে। তারপর বন্দী পিতাকে কারামুক্ত(করার আদেশ দেন। তত(ণে বিম্বিসার ইহলোক ত্যাগ করে গিয়েছেন। আপন আচরণের জন্য পরে নাকি রাজা অজাতশত্রুর অনুশোচনা হয়। তীব্র মনস্তাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য রাজবৈদ্য জীবকের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। রাজবৈদ্যর পরামর্শমতো বৌদ্ধধর্ম বিরোধী রাজা তখন ভগবান বুদ্ধের শরণ নিলেন। এবং বৌদ্ধধর্মে দী(িত হলেন।

রাজগৃহের সুন্দরী নটী সলাবতীর পুত্র ছিলেন জীবক। প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তিনি গৃহী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। গৃধকূট যাওয়ার পথে পড়ে তাঁর আস্তানা। ছটাপাহাড়ের নিচে অন্তঃপ্রাচীরের পূর্বদ্বারের নিকটে অবস্থিত সেই জীবকের আম্রবন। আম্রকাননে বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করে তিনি বুদ্ধদেবকে উৎসর্গ করেছিলেন। একবার তিনি বুদ্ধদেবকে আম্রকাননে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসাও করেছিলেন। কাছেই মদকু(নামে এক জায়গা আছে। কথিত আছে, সেখানে রাজা বিম্বিসারের মহিষী পিতৃঘাতী সন্তানের জন্ম না দেওয়ার অভিপ্রায়ে স্বীয় গর্ভ মর্দন করেছিলেন।

চিত্র-১১। জীবকের আম্রবন।

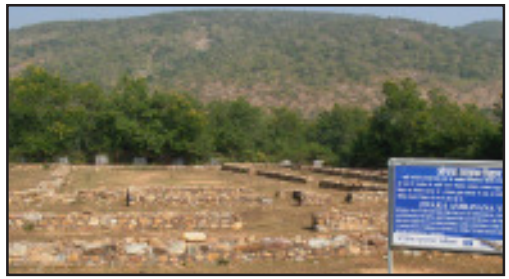

জীবকের আম্রবন ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে যাই। বিম্বিসার মার্গ ধরে গৃধকূটের দিকে।

রাজগৃহের অসামান্য ইতিহাস আছে। অনেক স্মৃতি-বিজড়িত সে সব কাহিনী। শহরের আবার ইতিহাস? ইতিহাস তো মানুষের। তা বটে।

মানুষের ইতিহাসই আসলে শহরের ইতিহাস। মানুষের বেদনাই শহরের বেদনা। আবার মানুষের আনন্দ-ঐশ্বর্যই শহরের গৌরবগাথা। রাজগৃহের ইতিহাস বলতে বোঝায় মগধ রাজবংশের কথা, তথাগত বুদ্ধ আর মহাবীরের কথা। এখানকার ধুলিকণায় তাঁদের আত্মা একাত্ম হয়ে আছে যেন। সেই সম্পর্ক কোনভাবে ছিন্ন করা যাবে না কখনো। সময়, আশ্চর্য সময়! দুর্বার প্রবাহে সবকিছু (য়ে যায়। মানুষ-বৃ(-পাথর-নদী সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে যায়। নিশ্চিহ্(হয়ে যায়। অতীতের আসনে বসে বর্তমান। অনতিকালের মধ্যে বর্তমানকেও চলে যেতে হয় অতীতের গর্ভে। এমনধারায় এই মহাপৃথিবী বর্ষিয়সী হয়েছে। অতীত রেখে যায় শুধু কিছু চিহ্(বা স্বা(র। স্মৃতি-বিধুর গন্ধমাখা কীর্তিকলাপ।

যীশুখৃষ্ট তখনো ধরাধামে অবতীর্ণ হন নি। তারো অনেক আগেকার কথা। আজ থেকে হয়তো অন্তত আড়াই হাজার বছর প্রাচীন ঘটনা সেসব। ভারতবর্ষে তখন পরাত্র(ান্ত চারটে রাজতন্ত্র ছিল — অবন্তী, বৎস, কোশল আর মগধ। অবন্তীরাজ চণ্ড প্রদ্যোত (পজ্জোত) মহাসেন। তাঁর রাজধানী শিপ্রানদীর তীরে উজ্জয়িনী নগরে। তাঁর কন্যাকে (বাসবদত্তা?) অপহরণ করে বিবাহ করেছিলেন বৎসরাজ উদয়ন (উদেনা)। বৎস রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রয়াগের কাছে কৌশাম্বীতে। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে ছিল কৌশাম্বী।

মধ্যবিহারে গঙ্গার দ(ি)ণে অবস্থিত মগধ রাজ্যের অধিপতি তখন মহারাজ বিম্বিসার। তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের কন্যার (মতান্তরে ভগ্নী) পাণিগ্রহণ করেছিলেন। যৌতুক হিসেবে লাভ করেছিলেন কাশী-ভূখণ্ড। প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল প্রথমে অযোধ্যা, পরে শ্রাবস্তীতে।

মগধরাজার রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। কোনো সূত্রমতে, কাশির শিশুনাগ বা শিশুনাক ৬০০ বা ৬৪২ খৃষ্টপূর্বাব্দে গিরিব্রজতে রাজধানী পত্তন করেন। পরে রাজধানীর নাম হয় রাজগৃহ। নতুন রাজধানীর প্রধান স্থপতি ছিলেন মহাগোবিন্দ। কুণ্ডের কাছে আমরা যে প্রাচীর দেখে এসেছি, সেই প্রাচীর-ঘেরা এলাকায় ছিল রাজধানী। বাইরের শত্রুর আত্র(মণ থেকে আত্মর(ার জন্যে পাহাড়-ঘেরা জায়গাটি ছিল স্বাভাবিক দুর্গের মতো। প্রকৃতির দ্বারা সুর(ি)ত। সামরিক কারণে রাজধানী হিসেবে তাই এই নির্বাচন উপযুক্ত(। অবশ্য জায়গাটি জলবায়ুর গুণে মনোরমও বটে।

শিশুনাগ বা হর্যঙ্ক বংশের রাজা ছিলেন মহারাজ বিম্বিসার। রাজত্বকাল নিয়ে সংশয় আছে। যথার্থ তেজদৃপ্ত পু(ষ ছিলেন নাকি। পনেরো বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আঠাশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। সিংহলী মতে বাহান্ন বছর। অজাতশত্রু তাঁর পুত্র হয়েও পিতার বি(দ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। পুত্র আরেকটি দুর্গনগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শোন, বুড়িগণ্ডক ও গঙ্গানদীর সঙ্গমের কাছে পাটলীগ্রামে। অজাতশত্রুর পরে দর্শক এবং তারপরে উদয় বা উদয়ন রাজা হন। অন্যমতে পুত্র উদয়ন রাজধানী

সরিয়ে নিয়ে যান নতুন রাজধানী পাটলীপুত্রে। তারই অবস্থান বর্তমানকালের বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনার কাছে।

ইতিহাসের সেই প্রাচীনকাল থেকে রাজগৃহ বিরাজমান। কমপ(ে আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা সেসব। একদিকে মগধরাজ বিম্বিসার রাজত্ব করছেন। আরেকদিকে ধর্মপ্রবর্তক তথাগত বুদ্ধ এসেছেন অজ্ঞানের অমানিশা দূর করতে, জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে নতুন পথের সন্ধান দিতে। সর্ব জীবে ক(ণার বাণী প্রচার করছেন। সকল মানুষের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হয়েছেন। সেই কল্যাণময় ক(ণার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রচারিত ধর্মকথায়। তাঁর আবির্ভাব কাল ৫৬৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ (মতান্তরে ৫৬৭ বা ৫৬৩ খৃষ্টাব্দ)। উনত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন এবং পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে হয় তাঁর বোধিলাভ। আশি বছর বয়সে তাঁর মহানির্বাণ হয়েছিল। এই পৃথিবীরই উদার আকাশের সুনীল চন্দ্রাতপতলে অথবা পুষ্পিত বর্ণমোহিত ত(-বীথিকায় তিনি একদা এসেছিলেন। পর্বত-কন্দরে, গিরিগুহায় বা সচ্ছসলিলা নদীতটে তিনি বিচরণ করেছিলেন। ধর্মস্থাপনায় ও ধর্মপ্রচারে। ভাবতে বসলে শিহরণ লাগে।

কোন এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে বোধিদ্রুমতলে বসে তাঁর জ্ঞানলাভ হয়েছিল। জগতের দুঃখের কারণ কি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তারপর গিয়েছিলেন ঋষিপত্তনে। পালি ভাষায় তার নাম ইষিপত্তন। বারাণসীর উত্তরে সারনাথের ঋষিপত্তনে তখন অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর সাধনভজনের আস্তানা। একাংশে মৃগদাবে ছিল মৃগযূথের স্বাধীন বিচরণভূমি। বুদ্ধদেব সেখানে পৌঁছে পূর্বপরিচিত পাঁচজনকে নতুন ধর্মে শি(া দিয়ে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। সেই পঞ্চশিষ্যের সঙ্গে পরে আরো পঞ্চান্নজন শিষ্য যুক্ত(হল। তাদের নিয়ে হল বৌদ্ধসংঘের সূচনা। তারপর তিনি এবং তাঁর অনুগত শিষ্যগণ অমৃতবাণী প্রচারের জন্যে, পার্থিব রোগ-শোক-জরা-মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে মুক্তি(র উপায় জানানোর জন্যে দেশে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

গৃধকূট যাওয়ার পথে ফলকলিপি চোখে পড়ল। জানানো হচ্ছে যে মহামানব বুদ্ধ এই গৃধকূট পাহাড়ে এসেছিলেন এবং তাঁর দর্শনলাভ করতে মহারাজ বিম্বিসার এই পথ ধরে এগিয়েছিলেন তাঁর কাছে পৌঁছতে। বিপুলাচলের দ(ি)ণ পাহাড়কে রত্নগিরি বলে। তার দ(ি)ণ অংশের নাম গৃধকূট।

— খুব আশ্চর্য লাগে যে পথ দিয়ে আজ আমরা বিশ শতকের কয়েকটি নগণ্য প্রাণী হেঁটে যাচ্ছি একদিন সেই পথে এক রাজকীয় শোভাযাত্রা যাত্রা করেছিল। মগধরাজ পাত্র-মিত্র-অমাত্যবর্গ নিয়ে রথে চড়ে এসেছিলেন।

— সত্যিই আশ্চর্য লাগে। সেদিন কত অশ্ব রথ হাতি পদযাত্রী রাজার অনুগমন করেছিল!

আড়াই হাজার বছর আগেকার কোলাহল, পদশব্দ, বাদ্যধ্বনি, রথের চাকার আওয়াজ আজো কি এই পাথরে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে? প্রতিধ্বনি সত্যি নেই বটে কিন্তু দীর্ঘ

সময়ের স্তূপাকার মেঘ সরিয়ে কান পাতলে যেন কিছু মনে হবে। সমবেত ধ্বনির প্রত্যয় আছে ঠিক, এমনটা মনে হবে। মনেমনে বা মৃদু মর্মরে। বললাম — এই দ্যাখো বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাচ্ছে, এইখানে যে স্তূপ রয়েছে, মহারাজ বিম্বিসার রথ থেকে সেখানে অবতরণ করেছিলেন। তারপর তথাগতের কাছে তাঁর পদযাত্রা শু(হয়েছিল।

এখানে হিয়াসিন স্তূপ ছিল, হিউয়েন সাঙের যেমন বলেছিলেন। সকল অমাত্যবর্গ মহারাজ বিম্বিসারের অনুগমন করছিল। আরো কিছুদূর এগিয়ে তিনি তাদের কলকোলাহল থামিয়ে শান্ত হতে নির্দেশ দিলেন। বললেন — হে অনুচরবৃন্দ! তোমরা আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর। যেখানে এই ঘটনা ঘটে, সেখানে ছিল টুইফান স্তূপ। এখনো ওই দুটি স্তূপ দেখা যায়।

তারপর মহারাজ একাকী উপরের দিকে চলতে লাগলেন। গৃধকূটে ভগবান বুদ্ধ রয়েছেন। তাঁর কাছে পৌঁছলেন। চরণবন্দনা করলেন তাঁর। সেই নয়নাভিরাম পাহাড়-চূড়োর গুহায় আশ্রিত বেদী থেকে তখন পবিত্র শান্তির স্তব তরঙ্গিত হচ্ছিল চারিদিকে। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।

আমরা তিনজনে গৃধকুটে এসে উপস্থিত হয়েছি। ডানদিকে এগিয়ে গেলাম। নিচের দিকে দুটি গুহা দেখতে পাচ্ছি। বাইরের দিকে পাথুরে দেয়ালের চিহ্(। পাথর-কাটা শীর্ণ সোপানপথ একদিকে। উপরে ছোট একখণ্ড প্রস্তরভূমি রয়েছে। সীমানার কাছে কার্নিসের মতো করে পাথর সাজানো। সেখানে উড়ছে কয়েকটি বস্ত্রখণ্ড ও পতাকা। ধূপের স(আঁকাবাঁকা রেখা বাতাসে বিলীয়মান। মোমবাতির আলো নিভে গিয়েছে। কোন ভক্ত(বুঝি একটু আগেই সেই মহামানবের প্রতি অন্তরের

চিত্র-১২। গৃধকুটে বুদ্ধের আরাধনা।

চিত্র-১৩। গৃধকুটে গুহাক(।

শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়ে গিয়েছেন। এখানে আরো নির্মাণ ছিল কি? মনে হচ্ছে ছিল। বেশ কিছু ইট আর পাথরের মন্দির ছিল। এখন আর নেই।

নিচের গুহাক(পা রাখলাম। শূন্য প্রস্তরবেদী। মনে হয় পরবর্তীকালে এখানে কোনো মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। ভাবছি এরকম কোন এক গুহায় ভগবান বুদ্ধ বসবাস করতেন? কোন গুহায় তা চিহ্(ত

নয়। অন্য কোন গুহায় বাস করতেন তাঁর প্রিয় শিষ্য ও সহচর আনন্দ। একটি গুহায় থাকতেন অন্যতম শিষ্য সারিপুত্র। আরেক গুহায় মৌদগল্যায়ন। এঁরা গল্পকথার মানুষ নন। পুরাণ বা মহাকাব্যের কল্পনা নয়। সত্যি সত্যি পৃথিবীর রক্ত(মাংসের মানুষ। গুহাকন্দরে মাটির মুদ্রা ও মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। এক ধরনের মুদ্রায়

চিত্র-১৪। গৃধকুটের চত্বর।

দু'সারিতে সাত অতীত-বুদ্ধ এবং একজন ভবিষ্য-বুদ্ধের মূর্তি অঙ্কিত। নিচে সূক্ষ্ম হরফে বৌদ্ধমন্ত্র খোদিত। অতীত-বুদ্ধ আর ভবিষ্য-বুদ্ধ? আমরা তো একজন বুদ্ধের কথাই জানি। কপিলাবাস্তুর তথাগত বুদ্ধ।

সামনের দিকে এক জায়গায় এমনভাবে পাথর সাজানো রয়েছে যে মনে হল ওখানে ভি(বা সন্ন্যাসীরা এখনো থাকেন। আমরা সেই পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর অদিতি বলল — আর যাব না। ফিরে চলুন।

দুজনে ফিরে এলুম। কমলেন্দু আরো খানিকটা এগিয়ে গেল। ফিরে এসে বলল — না হে কোন মানুষজন দেখতে পেলাম না। শুধু এক ছাগশিশুর দেখা মিলেছে।

অরণ্যের অজস্র সহস্র সবুজ পাতায় আবেগমত্ত বায়ুর গুঞ্জরণ শোনা যাচ্ছে। আর কোন ধ্বনি নেই। আর কোন কথা নেই। শুধু পত্রমর্মর। কী নির্মল শান্তি! কী সুগভীর নীরবতা! এক বুক বিস্ময় নিয়ে এখানে দাঁড়াতে হয়। এক বুক আনন্দ এখানে এসে জমা হয়। এই বন-প্রকৃতি-পাহাড়ের নির্জন সান্নিধ্যে বসে উপলব্ধি করা যায় কয়েক শতাব্দী প্রাচীন সেই মহামানবের পবিত্র জীবনকথা। হৃদয়ের গভীরে মগ্ন হলে শোনা যায় দূরাগত সঙ্গীতের মতো স্মৃতির মূর্ছনা। বাতাসে মিশে যাচ্ছে যেন মৃদু কম্পনে। তীব্র আকুতি মিশে আছে সেই সঙ্গীতে। খুব সহজে অভিভুত করে ফেলল আমাদের। বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবই যেন এখন অর্থহীন। মনে পড়ছে তথাগত বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য আনন্দের কথা। তাঁদের জীবন ও কর্ম, তাঁদের ধর্মপ্রেরণা। জীবনের নাগপাশ থেকে মুক্তি(র স্বর্গে পৌঁছতে তাঁদের শ্রম ও সাধনা। আর এই মনোমুগ্ধকর প্রকৃতির অবর্ণনীয় শোভা।

কমলেন্দু আকুল হয়ে বলল — ইচ্ছে করছে এখানে থেকে যাই।

— সত্যিই তাই। মনে হয় বাকি জীবন যদি এখানে কাটানো যেত! অদিতিও একমত।

পাহাড়ের সানুদেশে গৃধকূট সংর(ত বন। সবুজ বিস্তৃত তরঙ্গমালা। পৃথিবীকে পরম স্নেহে যত্নে সুন্দর করে আবৃত করে রেখেছে। মধ্যে দেখা যাচ্ছে ধূসর পথরেখা। সবুজের সমারোহে সিঁথির মতো বিস্তৃত। চলতে চলতে সবুজ যৌবনের মধ্যে কোথায় যেন

হারিয়ে গেল। গৃধকূট থেকে এই অরণ্যের শু(। বিস্তার ওদিকের উদয়গিরি পাহাড় ঘিরে। উদয়গিরির পাশে আরেকটি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। শোনগিরি। কালো পিচের গয়া-পাটনা সড়ক দুই পাহাড়ের ঢলে গভীর খাদে নিমজ্জিত।

বারবার বিস্ময়সূচক ধ্বনি বেরিয়ে আসছে আমাদের — দা(ণ জায়গাটা। প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো এই নিপুণ শিল্পের তারিফ না করে উপায় নেই। দুটি কঠিন পাহাড়ের সমুন্নতি আর তার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে গভীর গিরিখাত। ঘন সবুজ আস্তরণ। কল্পনার লাগাম ছেড়ে দিলে পৌঁছে দিতে পারে অনেক যোজন দূরের চন্দ্রালোকিত রজনীতে। পৃথিবীর সব কোলাহল সব উত্তাপ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে এক স্বর্ণচ্ছায়ায়, এক গভীর শান্তিতে।

আকাশে ব্যাপ্ত নীলিমা। কয়েক খণ্ড সাদা মেঘের পানসি আনমনে ভেসে যাচ্ছে। নানাপাখির কলকূজন। নানাবর্ণের সমারোহ। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। রৌদ্রের উজ্জ্বল দীপ্তিতে ধরিত্রী উদ্ভাসিত। এমন উজ্জল বর্ণাঢ্য পরিবেশ, এমন স্বপ্নময় নির্জনতা! এসব ফেলে আর ফিরে যেতে মন চায় না। চেতনায় কী যে মোহময় প্রভাব বিস্তার করল কে জানে! প্রস্তরবেদী যেন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে। গুহাগহ্বর থেকে যেন তার প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে। বৃ(লতায় ক(ণ চাহনি ল(করা গেল কী? বায়ুহিল্লোলে যৌবনতরঙ্গে মুখরিত হয়ে তারা কি বলছে — যেও না, যেও না? দু একটা পাখির উড্ডীন আনন্দ ঢেউ তুলল। নিষ্পাপ আনন্দ। আসলে তো সবই আপন উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি(।

সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল উপত্যকার নির্মল শান্তি, অদূরবর্তী পাহাড়ের যৌবনোন্মাদ স্ফীতি আমাদের বিহ্বল করে তুলেছিল। বারবার মনে হচ্ছিল, এই শান্তি, এই নির্জনতা আর কোথাও নেই, আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কখনো পাওয়া যাবে না। কোথাও যেন পাইনি এতকাল। এক বন্দী সৈনিক মুক্তি(র অপার আনন্দে অ(ারোহণে বায়ুবেগে উধাও হচ্ছে দিগন্ত ছাড়িয়ে। যেন বনের বন্দী বিহঙ্গ প্রাত্যহিক নিয়ম-শাসনের বেড়াজাল ছিন্নকরে একদিন উদার আকাশে মুক্তি(পেল। সে কী অপার আনন্দ তার! অসীম উদারতার জয়গান শুনতে পাচ্ছে। আনন্দে গান গাইছে। এখানে নয় রোদনভরা বসন্ত। বসন্তের পুষ্পিত সার্থকতা এখানে।

এ(নি বিদায় জানাতে হবে। এ(নি ফিরে যেতে হবে সভ্যতার আধুনিকতায়। যে পথ দিয়ে এইমাত্র তিনজনে উঠে এসেছি সেই পথে ফিরে যেতে হবে। তৃপ্তিতে ভরপুর একটা মন নিয়ে। না, সেই মন নিয়ে এখানে আসিনি। কিন্তু চলে যাব অন্য মন নিয়ে। আর একটু পরেই সব স্মৃতি হয়ে যাবে। ফিরে যেতে যেতে হয়তো শপথ নেব আবার আসার। কেন যে যেতে হবে আমাদের প্রাত্যহিক দিন গুজরানে। জীবনযাপনে।

এখানকার প্রস্তরপুঞ্জ বুঝি শেষবারের মতো আহ্বান জানাল আমাদের। গাছপালা বুনো ফুল মূক বেদনায় থরথর করে জানাল — যেও না।

কমলেন্দু আর অদিতি নেমে যাচ্ছে। পা চালিয়ে ওদের সঙ্গী হলাম।

অদিতিকে বললাম — একবার পেছনে ফিরে তাকান। ওই পাথরটার আড়াল থেকে এখন দৈত্য বেড়িয়ে পড়া খুব বিচিত্র নয়। তখন কী হবে?

— কী আবার হবে! ছুট দেব। অদিতি বলে।

— দৈত্যের সঙ্গে ছুটে কেউ পেরেছে বলে তো শুনিনি। কমলেন্দু বলল।

— চেষ্টাও কেউ ছাড়ে নি নিশ্চয়। বলেই দৌড়তে শু(করল। আমরা দুজনে হরিণীর অনুসরণ করতে করতে পাহাড় থেকে পাকা সড়কপথে নেমে এলাম।

গৃধকুট বিদায় জানাতে বিস্বাদ লাগছে। কমলেন্দুরও লাগছে তা ও যতই ডানপিটে উদ্দাম প্রকৃতির হোক না কেন। অদিতিকে সেভাবে চিনি না বটে, তবু মনে হচ্ছে ওরও চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। তিনজনেই মনে মনে বলেছি বুঝি — আবার আসব, নিশ্চয়ই আসব এই গৃধকুটে।

গোটা রাজগৃহ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বুদ্ধের নানা কাহিনী। তিনি তখনও বোধিলাভ করেননি। তখন সিদ্ধার্থও তার নাম নয়। সে নাম তো কপিলাবাস্তুর সীমারেখা পার করার পরেই মুছে নিশ্চিহ্(হয়ে গিয়েছে। সেই নাম সারথী ছন্দক রাজধানীতে পিতা-পুত্র-পত্নী-পরিজনের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তিনি তখন শাক্যমুনি গোতম। একদিন যে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু তাঁর মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে মুক্তি(র জন্যে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করে কত গু(র আশ্রমে ঘুরে বেড়ালেন। ঋষি আলাড় কালামের কাছে শিখলেন যোগবিধি। তারপর ঋষি রামপুত্র (দ্রকের আশ্রমে শিখলেন নানা সাধনপ্রণালী। তবু তাঁর জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর মেলেনি। কোন গু(র সাহায্যে নয়। তাঁকেই তাঁর জিজ্ঞাসার সমাধান খুঁজে বার করতে হবে। একনিষ্ঠ সাধনায়। তারপর পৌঁছলেন উ(বিল্ব গ্রামে।

গৃহত্যাগ করে বৈশালী-শ্রাবস্তী ঘুরে মুণ্ডিত মস্তকে কাষায় বস্ত্র পরে তিনি তখন রাজগৃহে উপস্থিত হয়েছেন। নগরের দ(ণে রত্নগিরি পাহাড়। সেখানে অনেক মুনিঋষি সাধনভজন করেন। এক নির্জন মনোরম গুহায় তিনি তপস্যার আসন পাতলেন।

অনতিকালের মধ্যে রাজধানীর নাগরিকবৃন্দের মুখে মুখে এক নবীন সন্ন্যাসীর কথা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তারা নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করতে এল। ক্র(মে সেই সন্ন্যাসীর কথা মহারাজের কানে গিয়ে পৌঁছল। তিনিও কৌতূহলী হয়ে একদিন পাত্রমিত্র অমাত্য নিয়ে রত্নগিরি পাহাড়ের সেই গুহাকন্দরে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন সত্যিই এক সুন্দর উজ্জ্বল যুবক সাধনামগ্ন।

বিস্মিত মহারাজ প্রশ্ন করলেন — রক্ত(চন্দনযোগ্য এই দেহকান্তিতে কাষায়বস্ত্র কেন?

শাক্যমুনি বিনীতভাবে জানালেন — সকল ঐহিক বন্ধন ছিন্ন করে পরমার্থিক সত্যলাভের আশায় এই সাধনার পথ গ্রহণ করেছি। আমার অন্তরে প্র্ে জেগেছে পৃথিবীর মানুষের মঙ্গলের জন্যে। আমি সেই সত্যলাভের জন্য ব্রতী হয়েছি।

মহারাজ বললেন — সাধনার পথ শুনেছি কঠিন। আপনি আসন ত্যাগ ক(ন। আমার রাজ্যে স্বাধীনভাবে বসবাস ক(ন।

শাক্যমুনি অবিচলিত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করলেন — মহারাজ, আপনি ধর্মজ্ঞ এবং উদার। কিন্তু আমাকে আর প্রলুব্ধ করবেন না। প্রার্থনা করি শান্তি ও সমৃদ্ধিতে আপনার রাজ্য পরিপূর্ণ হোক।

মগধ নৃপতির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। তিনি অনুভব করলেন ইনি সাধারণ সন্ন্যাসী নন। মুক্তি(র অন্বেষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ঐহিক সুখ ঐশ্বর্য বিসর্জন দিয়ে এসেছেন। ফিরে যাওয়ার সময় মহারাজ তাঁকে বললেন — হে সন্ন্যাসী, আপনার সাধনা সফল হোক। সিদ্ধিলাভের পরে আপনি একবার অবশ্যই আমার রাজ্যে গিরিব্রজতে পদধূলি দেবেন এবং আমাকে আপনার শিষ্যরূপে গ্রহণ করবেন।

শাক্যমুনি অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। সিদ্ধিলাভের পরে তিনি এসেছিলেন মগধের রাজধানী রাজগৃহে। তখন তিনি আর শাক্যমুনি নন। তথাগত বুদ্ধ।

আর একদিনের কথা। রাজগৃহের রাজপথে তিনি পায়ে হেঁটে ভি(া করছিলেন। একদল মেষশাবক তাঁকে অতিত্র(ম করে চলে যাচ্ছিল। দলের মধ্যে সবশেষে যে মেষশাবকটি যাচ্ছল, তার শরীর থেকে রক্ত(ঝরছিল। ক(ণায় বিগলিত হল শাক্যমুনির হৃদয়। পরম স্নেহে মেষশাবকটিকে কোলে তুলে নিলেন। বিস্মিত মেষপালক বলল — এ কি করছেন? রাজবাড়িতে আজ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। হাজার মেষ-বলি দেওয়া হবে সেখানে।

শাক্যমুনি (ব্ধ ব্যথিত চিত্তে ভাবতে লাগলেন — এই মূক প্রাণীটির রক্ত(দিয়ে কোন দেবতার পূজা হতে পারে? এ তো ভক্তে(র আকুলতা নয় — এ হল ভক্তে(র পৈশাচিকতা।

সন্ধ্যাবেলা। রাজবাড়িতে পূজার আড়ম্বরের শেষ নেই। কাঁসর ঘন্টার কলরোলে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত। রাজধানীর গণ্যমান্য ব্যক্তি(রা আসন গ্রহণ করেছেন। মহারাজ অমাত্যদল নিয়ে সভাসীন। শাক্যমুনি যখন সেখানে এসে পৌঁছলেন তখন নাটমন্দিরের যূপকাষ্ঠে এক ছাগশিশুর ীণ চিৎকার শোনা যাচ্ছে। শাক্যমুনি ত্র্যস্তপদে ছুটে এসে অসহায় ছাগশিশুর প্রাণভি(া প্রার্থনা করলেন। বললেন — এই অবোধ প্রাণীটির পরিবর্তে আমাকে বলি দিন।

পূজারীর দল আর্তনাদ করে উঠল — কে এই নবীন সন্ন্যাসী? কী নির্বোধ, দেবার্চনায় বিঘ্ন ঘটায়?

সমাগত নরনারী স্তম্ভিত। বিস্ময়ে কারো মুখে বাক্যস্ফূর্তি নেই। মহারাজ চিনতে পারলেন। ইনি তো সেই নবীন সন্ন্যাসী! তাঁর স্নিগ্ধ মুখাবয়ব জীবের প্রতি ক(ণার প্রস্রবণে উদ্ভাসিত। শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন সন্ন্যাসীর কাছে। এরপরে সারা মগধরাজ্যে ঘোষিত হল — এখন থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে পূজার জন্যে বলিদান অপরাধ বলে গণ্য হবে।

শাক্যমুনি প্রায় এক বছর রত্নগিরি পাহাড়ে উপাসনা করেছিলেন। অভীষ্ট ফললাভের কোন সম্ভাবনা ল(্য করলেন না। অনন্তর স্থানত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করলেন।

চললেন পূর্বদিকে। রাজগৃহ ত্যাগ করে চলে গেলেন বিষ্ণু(তীর্থ গয়া। সেখানকার এক পাহাড়ে। আজীবিক সন্ন্যাসীদের আশ্রয়স্থল সেটি। জনবহুল সে জায়গাটিও তাঁর মনোমত হল না। চলতে চলতে এসে হাজির হলেন নৈরঞ্জনা নদীতীরে উ(বিল্ব গ্রামে। দেখা হল পঞ্চবর্গীয় সন্ন্যাসী বপ্র, ভদ্রিয়, অশ্বজিৎ, মহানাম এবং কৌণ্ডিন্যর সঙ্গে। শাক্যমুনি চার বছর কঠোর সাধনায় কাটালেন। কৃচ্ছসাধনে তাঁর সুবর্ণকান্তি ম্লান হয়ে গেল। দেহ শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হল। মুক্তি(র পথ তবু তমসাচ্ছন্ন রয়েগেল। অবশেষে মহাবোধিদ্রুম তলে উপবেশন করে তিনি মহানির্বাণ লাভ করলেন। অন্তর জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হল। জ্ঞানই মহানির্বাণ। মানবজীবনে দুঃখের কারণ কী তা জানতে পারলেন। জগতবাসীকে ত্রিশরণ মন্ত্র দেখালেন। হলেন তথাগত বুদ্ধ। সেদিনের উ(বিল্ব হল আজকের বুদ্ধগয়া।

শু(হল তাঁর জীবনমন্ত্রের প্রচার। ঘুরলেন বৈশালী শ্রাবস্তী ও রাজগৃহ। মগধরাজ বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধকে আপন প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। স্বহস্তে পরিবেশন করে আহার করিয়েছেন সেই মহাভি(ুকে। আহার শেষ হলে অবসরযাপনের জন্যে এক মনোরম উদ্যান দান করলেন। রাজগৃহের অন্যতম পুণ্যতীর্থ সেই উদ্যানটি হল বেণুবন। সেই বেণুবনে বসে বুদ্ধদেব তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য সারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়নকে দী(া দিয়েছিলেন।

সেও এক কাহিনী।

নালন্দার আশ্রমে মহাপণ্ডিত সঞ্জয়ের আশ্রমে বাস করতেন অভিন্নহৃদয় দুই সখা — উপতিষ্য আর কোলিত। আশৈশব তাঁরা গভীর বন্ধুত্বে আবদ্ধ। একদিন নাট্যশালা থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁদের মনে হল — এই জগতসংসার এক ক্লান্তিকর অভিনয়। সমাজ ও জীবন চলছে কেবল গড্ডালিকা প্রবাহে।

চিত্র-১৫। বেণুবন।

তাঁদের মন বিতৃষ(ায় ভরে উঠল। আর সংসার জীবন নয়। সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনায় অধীর উঠলেন তাঁরা। এদিকে আশ্রমের

রীতিপদ্ধতিতে মন তৃপ্ত হচ্ছে না। কোথায় কী যেন অব্যক্ত(রয়ে গেল! এক শূন্যতা অনুভব করতে পারছেন কিন্তু কোন হদিশ করতে পারছেন না পরবর্তী কর্তব্য।

দুজনে ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন — অন্য কোন মহাপু(ষের কাছে দী(া নিতে হবে। এমন একজন সিদ্ধপু(ষ চাই যিনি তাঁদের উপযুক্ত(মার্গদর্শন করাতে স(ম হবেন। কোথায় পাওয়া যাবে তাঁকে? দুজনে দুদিকে বেরিয়ে পড়লেন সেই মহাপু(ষের সন্ধানে। খোঁজ পেলে একজন অপরজনকে জানাবে এবং দুজনে মিলিত হয়ে একসঙ্গে সেই মহাপু(ষের কাছে দী(া নেবে।

উপতিষ্য যাত্রা করেছিলেন রাজগৃহের পথে। মগধ রাজধানীতে এসে তাঁর দেখা হল অশ্বজিৎ এর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। জানতে পারলেন যে অশ্বজিৎ ভগবান বুদ্ধের শিষ্য। অশ্বজিৎ জানালেন — উপতিষ্য যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পথে বেড়িয়েছে তার সদুত্তর দিতে পারেন একমাত্র ভগবান বুদ্ধ।

অঙ্গীকার অনুযায়ী উপতিষ্য ফিরে গিয়ে কোলিতকে নিয়ে সেই মহাপু(ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বুদ্ধদেব তখন বেণুবনে। পাঁচ শিষ্য নিয়ে ধর্মপ্রচারে রত। অশ্বজিৎ, বপ্র, ভদ্রিয়, মহানাম আর কৌণ্ডিন্য। উপতিষ্য আর কোলিত এসে বুদ্ধের চরণ আশ্রয় করলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মে দী(ত হলেন। ভি(ু জীবনে নতুন নামকরণ হল তাঁদের। মাতা রূপসারির পুত্র বলে উপতিষ্যর নতুন নাম হল সারিপুত্র (সারিপুত্ত)। কোলিতের নাম হল তাঁর গোত্র অনুসারে মৌদগল্যায়ন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এঁরা দুই স্তম্ভস্বরূপ। জ্ঞানে, ভক্তি(তে ও নম্র ব্যবহারে এঁরা অতুলনীয় গৌরব লাভ করেছিলেন।

এদিকে রাজগৃহের ঘরে ঘরে অনতিকালের মধ্যে কান্নার রোল উঠল। হায় হায়। গৃহ শূন্য। পুত্র সংসার ত্যাগ করেছে। যুবতী বধূর বিষণ্ণ মুখখানি দেখে জননী বারবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে। ঘরে ঘরে হাহাকার। আনন্দ নেই। সুখ নেই। কেন? না, ঘর ছেড়ে মগধ যুবকেরা দলে দলে ভি(ু সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে। আর তাদের প্রিয়তমারা বিরহ কান্নায় আকুল হচ্ছে।

ভাবতে বসেছি, আজো কি এই নির্জন পাথরের বেদীতে কান পাতলে কিংবা বায়ু হিল্লোলে আন্দোলিত পাতার মর্মরে মগ্ন হতে পারলে সেদিনের অনেক যশোধরার কান্না শুনতে পাওয়া যায়? তাদের বেদনার কথা জানা যায়? তাদের বিষণ্ণ যৌবন, তাদের অশ্রুপ্লাবিত নয়ন সেদিন কত না খুঁজে ফিরতো দয়িতকে। মলিন আকাশের মতো অন্তর আচ্ছন্ন ছিল হাহাকারে। জানালার পাশে বসে থেকে থেকে সমস্ত প্রতী(া ব্যর্থ! মিথ্যা জীবনযৌবন, মিথ্যা রূপসজ্জা। কপালে চন্দনতিলক, গালে শ্বেতচন্দনের পত্রলেখা, সবই অর্থহীন। বীণার ঝঙ্কার, নর্তকীদের নূপুর নিক্কন, কেবল শূন্যতায় খা খা করছে। ভ্রষ্টকুসুমের অপর্যাপ্ত রেণু ছড়িয়ে রয়েছে যে উদ্যানপথে, সেখানে আর প্রেমিকের চরণচিহ্ন(পড়বে না। চাঁদের আলোয় চামেলী সুবাসে মুখর রজনী শুধু বেদনার। দয়িতরা

হলুদ চীবরে ভি(াপাত্র নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে। বলছে — সংঘং শরণং গচ্ছামি। গৃহ নয়, সংঘই তাদের জীবন।

রাজগৃহের আকাশেবাতাসে অণুপরমাণুতে বুদ্ধের জীবনগাথার অনাবিল মাধুর্য মেশানো। ভারি স্নিগ্ধ, ভারি সূর্যকরোজ্জ্বল মনে হয় সেই সব দিন। নির্বাণলাভের পরে একবার বেণুবনে তিনি ধর্মদেশনায় ব্যস্ত ছিলেন। রাজ-অমাত্যদের নিয়ে ধর্মসভা। সিদ্ধার্থের বাল্যবন্ধু কালুদায়ী এসেছে কপিলাবাস্তু থেকে। মহারাজ শুদ্ধোদন তাকে পাঠিয়েছেন সিদ্ধার্থকে ঘরে ফেরার আমন্ত্রণ জানাতে। শাক্যকূলবধূ তাঁর সিদ্ধিলাভের খবর পেয়ে একটিবার তাঁকে দেখার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘ আট বছর ধরে বিরহজ্বালা ভোগ করছেন।

কালুদায়ী ধর্মসভায় বসে বসে ধর্মকথা শুনতে লাগল। কয়েকটা দিন গেল। নিজের পরিচয় প্রকাশ করল না। তারপর একদিন অবসর বুঝে বসন্তের লতামঞ্জরীর সবুজ সতেজ স্নিগ্ধতায় কুসুমাস্তীর্ণ যে মনোহর পথ রাজগৃহ থেকে কপিলাবাস্তু গিয়েছে সেই পথের শোভা বর্ণনা করতে লাগল। কালুদায়ী জানত তার সখা সৌন্দর্যপ্রিয়।

বুদ্ধদেব ভাবছেন নবাগত ব্যক্তি(পথশোভা বর্ণনায় এত উৎসাহী কেন। প্র(করলেন তাকে। কালুদায়ী তখন পরিচয় দিয়ে বলল — আপনার পিতা আপনার জন্য প্রতী(া করে রয়েছেন। শাক্যকূলবধূ সজল নয়নে আপনারই দিন গুনছেন। কপিলাবাস্তুর নরনারী আপনার দর্শনলাভের আকাঙ্খায় ব্যাকুল। আপনি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক(ন।

বুদ্ধদেব বললেন — আমি যাব, নিশ্চয়ই যাব। না বললেও একবার অবশ্য যেতাম।

তারপর একদিন তিনি কপিলাবাস্তু যাত্রা করলেন। তাঁর কৈশোরের ক্রীড়াভূমি, যৌবনের রঙ্গভূমি। তাঁর পবিত্র জন্মভূমি। সেখানে অনেককে ধর্মে দী(ত করলেন। নন্দ, আনন্দ, দেবদত্ত, অনি(দ্ধ। উপালী নামের এক ৌরকার। এবং পুত্র রাহুল। দেখা হল যশোধরার সঙ্গে। তারপর আবার যাত্রা করলেন ধর্মচক্র(প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে। দেশদেশান্তরে।

বৃহত্তর জগতের ডাক যিনি শুনেছেন, তাঁকে সমাজ-সংসারের (ুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখার সাধ্য কারো নেই। বুদ্ধ চৈতন্য বিবেকানন্দ এঁরা এ জগতের হয়েও অন্য জগতের।

চিত্র-১৬। কালান্দকনিবাপ।

৯। বাসাবদল

গৃধকূট থেকে ফেরার পথে কুণ্ডের কাছে রেস্তোরায় সকালের জলখাবার খেয়ে সুজন সিংএর ডেরায় ফিরেছি। কুণ্ডস্নানের জন্যে সকলে তৈরী। সুরমাদি মাসিমাকে নিয়ে এগোলেন। নীতাদি অদিতিকে বললেন — চল চল তোমার জামাকাপড় যা দরকার সব নিয়ে নিয়েছি। তোমরা দুজনেও এস সঙ্গে।

অদিতি তৈরী হতে গেল। সেই ফাঁকে নীতাদি আমাদের বললেন — অনেক কষ্টে ম্যানেজ করেছি।

শুনে আমরা তো ভরতনাট্যম নাচব না কত্থক তা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। দু'জনে প্রায় চিৎকার বললাম — বলেন কি দিদি, ম্যানেজটা করলেন কব্জ করে?

— হুঁ হুঁ বাবা সে আছে। সকালে তোমরা তো বেরিয়ে গেলে। আমি অমনি বাক্সবিছানা গোছাতে শু(করে দিলাম। তা দেখে সুরমা-মাসিমা দুজনে একটু ঘাবড়ে গেল। ভাবল সত্যি সত্যি চলে যাব এবার। জানে তো আমিও কম জেদী নই। তখন কি হয়েছে জান? দুজনের চোখই ছলছল। আমাকে বলল সত্যি চলে যাবে নাকি? বললাম, যাব না তো কী? বলল, না ভাবছিলাম ভেবে দেখলে হত না? আমিও তেড়ে বললাম, বারে, এতে আবার ভাবাভাবির কী আছে? সেদিন পাহাড় থেকে নেমে আসতে দেরি হয়েছে বলে আপনারা রাগ করলেন। ওদিকে আমার তখন কি অবস্থা তা তো জানেন না। জানতেও চাইলেন না। শুনে দুজনে আঁৎকে উঠল। বলল, কেন কী হয়েছিল তোমার? বললাম, পেটের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছিলুম। সেজন্যেই তো নেমে আসতে দেরি হয়েছিল। ব্যস, ম্যানেজ হয়ে গেল।

— আপনি বললেন এই সব?

— বললাম। না বললে ম্যানেজ হত নাকি?

— থ্রি চিয়ার্স ফর নীতাদি। হিপ হিপ হুররে। কলকণ্ঠে বলে উঠলাম। আর নীতাদি অঢেল হাসিতে ভাসতে ভাসতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরে ঢুকে ভরতনাট্যম, সেই সঙ্গে কত্থক এবং মণিপুরি মিশিয়ে উদ্দাম নাচটা নেচে নিলাম অননুকরণীয় স্টাইলে। তারপর দু'জনে গলা জড়িয়ে মুক্ত(কণ্ঠে স্বীকার করে নিলাম — দিদিটার সত্যি এ-ক্লাস ক্যালি আছে।

রাজগৃহে প্রধান যানবাহন এক্কা। সাইকেল রিক্সা ছিল, তবে চল বেশ কম। আমাদের এক্কার উপর একটু দুর্বলতাই ছিল বলা যায়। জনবিরল এলাকা। স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা

বেশি হওয়ার কারণ নেই। অধিকাংশ ভ্রমণপিপাসুর দল। সেই শান্ত জনপদের বুকে ঘোড়ার (ুরের টকাটক শব্দ আর দুলকি চালে চলার তালে ঘণ্টার মিষ্টি টুংটাং আওয়াজে সুরেলা আমেজ, খুব ভালো লাগে আমাদের। বিম্বিসার-প্রাচীরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললাম — এখানে এলে অনেকের মনে হবে স্মৃতির জানালা খুলে ইতিহাসে উঁকিঝুঁকি দিতে। হয়তো নিজের জীবনেরও অতীত রোমন্থন করতে ইচ্ছে হতে পারে। মনে হতে পারে ঘোড়ার (ুরের শব্দ বুঝি মহাকালের অনন্ত পদধ্বনি।

একথা শুনে কমলেন্দু বলল — ওই মহাকালের কথাটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ভাই। কী করব, মানা যাচ্ছে না।

সুরমাদি অসুস্থ বলে তাকে এবং মাসিমাকে এক্কায় চড়ে যেতে হবে। সঙ্গে নীতাদি-অদিতিও সঙ্গী হতে পারে। আমাদের পদযুগলে প্রবল ভরসা। তাও এই সামান্য দূরত্বটুকু পার করা। ছোঃ।

এই তো কদিন আগে রাঁচিতে মাইলের পর মাইল দিব্যি হেঁটে বেড়িয়েছি। মোরাবাদি পাহাড়, এরোড্রাম, হাতিয়া, জগন্নাথপুর কত জায়গা! মোরাবাদি হিলের অন্য নাম টেগোর হিল। গিয়েছিলাম কমলেন্দু আর অশোকের সঙ্গে। মেস থেকে তিন প্রবাসী — শ্যামল রায়, বিনোদ হালদার এবং রবীন বলও দলে ছিল। ওরা আগে যায়নি কখনো। পাহাড়ে ওঠার আঁকাবাঁকা পথরেখা দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল। রাঁচি হিল থেকে মনে হয়েছিল মোরাবাদি পাহাড়চূড়োয় মন্দির আছে। উপরে উঠে মন্দির দেখলাম না। আয়তাকার বেদী, চারদিকে চারটি স্তম্ভ রয়েছে, মাথার উপর আচ্ছাদন। ব্যস আর কিছু নেই। চারদিকে চোখে পড়ছে প্রান্তর, আঁকাবাঁকা আলপথ, সাজানো বাগিচা, ছন্নছাড়া বসতি। আর দিগন্তে আরো পাহাড়ের স্বা(র। মোরাবাদি পাহাড়ের অন্যতম আকর্ষণ ঠাকুর বাড়ির স্মৃতি বিজড়িত নিকেতন। ঘরগুলো তালাবন্ধ। ভিতরে কিছু আছে বলে মনে হল না। আঙিনা ভরে ছেঁড়া পাতা আর ঝরা ফুল। সিমেন্ট বাঁধানো বলয়াকার বসার ব্যবস্থা। মাঝখানে বাঁধানো টেবিল। উপাসনার উপযোগী ভাঙ্গা একখানি আসনও পড়ে আছে বলে মনে হল। প্রবেশতোরণে আলোকসজ্জা ছিল এককালে। কালের (য়ে সবই গত হচ্ছে। যা কিছু রয়েছে এখনো, আর বেশিদিন টিকবে না। বি(েকবি রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে নাকি বহুদিন বসবাস করেছেন। স্মৃতিমেদুর জায়গাটি এমন অবহেলায় পড়ে পড়ে (য় পাচ্ছে দেখলে কষ্ট হয়।

উষ(জলের কুণ্ডে স্নান করতে প্রথমদিন খুব খারাপ লেগেছিল বটে কিন্তু সেই মন্দ-লাগা পরে আর থাকে নি। সপ্তর্ষিকুণ্ডের ধারাপাতে আপাদমস্তক ভিজিয়ে বসে থাকতে ভালোই লাগছিল। নিচের ব্রহ্মকুণ্ড বড়োসরো চৌবাচ্চার মতো। সকলে গা ডুবিয়ে বসে আছে। চর্মরোগীদের ওই জলে স্নান বিশেষ উপকারী। আর সেকারণেই আমাদের

ওখানে ডুব দিতে ইচ্ছে হল না। স্নান করতে করতে ভাবছিলাম। আজ আমাদের নালন্দা যেতেই হবে। নীতাদিরা স্নান সেরে ফিরে গিয়েছেন। আমরাও তাড়াতাড়ি কুণ্ড থেকে উঠে পড়লাম। ব্যাসকুণ্ডের কাছে গতকালের কলহপ্রিয় সুখী দম্পতিযুগলকে আজ আর দেখা গেল না।

ডেরায় ফিরে শুনি নতুন সমস্যার উদয় হয়েছে। মালিক সুজন সিং এত্তেলা দিয়েছে — তার মহামূল্যবান আশ্রয়টি অবিলম্বে ত্যাগ করতে হবে। উনি অন্য জাঁদরেল ভাড়াটে পেয়েছেন বোধ হয়। সুতরাং আমাদের অন্য আশ্রয়ের সন্ধানে যেতে হবে।

অদিতি আমাদের নিয়ে গেল পাশের মাধব পাণ্ডের বাড়ি। মাধব বাবাজীর হেফাজতে ঘর খালি নেই। সরকারি ট্যুরিস্ট বাংলো-রেস্টহাউস ঘুরে দেখলাম। সাজানো গোছানো সুন্দর জায়গা। কিন্তু কোন ঘর পাওয়া গেল না। এদিকে একটা ব্যবস্থা তো করা চাই এবং তা চটপট করতে হবে। না হলে নালন্দা বাতিল হয়ে যাবে। সেটি হতে দিতে চাই না।

ছুটে গেলাম শ্বেতাম্বর জৈন ধর্মশালায়। বাজার থেকে বাস টার্মিনাসের দিকে যেতে পথে পড়ে। বাঁদিকে সুন্দর জৈনমন্দির রয়েছে। দিগম্বর জৈনমন্দির। ধর্মশালা ঠিক তার উল্টোদিকে। অফিসঘরে বিশালদেহী ম্যানেজার বালাপোষে অর্ধশায়িত। এক দেশোয়ালীর সঙ্গে ঘরসংসারের গল্পগুজবে মশগুল। কমলেন্দু আমাকে সামনে ঠেলে দিল 'তুমি হিন্দিটা তবু ম্যানেজ করতে পার ভালো' বলে।

মোটেই আমি রাষ্ট্রভাষায় পারদর্শী নই। ওটা স্রেফ গ্যাস খাওয়ানো। ম্যানেজারকে হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে বললাম — দুতিনদিনের জন্যে একখানা ঘর চাই। ও মহিলা না থাকলে হবে না? না না মহিলা তো আছে। সব আপন দিদি এবং মাসিমা। তাহলে তো সব ঠিক হ্যায়? অ্যাঁ? কি বললেন — সামান লেকর আসতে হবে। সে তো আনতেই হবে। সামান কোথায় আবার রেখে আসব। বাদমে নাম আউর পাতা লিখতে হবে? সব হবে। পহেলে থাকার জায়গাটাতো ব্যবস্থা করে দিন।

ব্যস, ঘরের বন্দোবস্ত হয়ে গেল। কমলেন্দুকে বললাম — ডেরায় ফেরার আগে বাস টার্মিনাস ঘুরে চল। নালন্দার বাসের খবরটা নিয়ে রাখা যাক।

জানা গেল একটু পরেই পাটনার বাস ছাড়বে। নালন্দা হয়ে যাবে। দৌড়ে বাড়ি ফিরে ঘোষণা করলাম — দিদি, জৈন ধর্মশালায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিন।

কয়েক লহমার মধ্যে বাক্সবিছানা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বেঁধে ফেলা হল। (ধায় কাতর হয়েছি অনেক আগেই। বাটিতে করে খানিকটা খিচুড়ি চটজলদি গলাধঃকরণ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এক্কাগাড়ি ডেকে সুরমাদি-মাসিমাকে গাড়িতে তুলে দেওয়া হল। সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র। কমলেন্দু পাহারা দিয়ে সঙ্গে গেল। অন্যান্য জিনিস নিয়ে আমরা তিনজনে হেঁটে সুজন সিংএর আস্তানা ছেড়ে বাসাবদল করলাম।

ধর্মশালার কামরাটি ছোট। একতলায়। তবু সকলের পছন্দ হল। নীতাদি বললেন — চৌকি পাওয়া যায় না? মেঝেয় শুলে আবার ঠাণ্ডা না লাগে।

— সে চেষ্টা করেছি দিদি, পাওয়া গেল না। কমলেন্দু জানায়।

অগত্যা মেঝেতেই শয্যা গ্রহণ করতে হবে। দুপাশে দুটো বেডিং বিছিয়ে দেওয়া হল। বাক্স-কিটব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র ঝটপট গুছিয়ে ফেলা হল। একপাশে রান্নার ব্যবস্থাদি পর্যন্ত। চারজনে হাতে হাতে কাজকর্ম সেরে নিতে আর কত সময় লাগে? সব সারা হয়ে গেলে আমরা ঘোষণা করলাম — এবার তাহলে যাই।

— যাই মানে? কোথায় যাবে তোমরা?

— নালন্দা।

— ও বাবা তোমরা এখন নালন্দা যাবে? তোমাদের তো আবার সময়ও নেই বেশি। যাও তবে ঘুরে এস। আমরা পরে যাব সময় পেলে। আচ্ছা, একটু দাঁড়িয়ে যাও। আমরাও তো বেরোব। একসঙ্গে বেরোনো যাবে। নীতাদি বললেন।

— আপনারা কোথায় যাবেন?

— না না তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি নে। কাছাকাছি একটু ঘুরে আসব। ঘরে বসে বসে আর ভালো লাগছে না।

অদিতি অনেক(ণ ধরে ঘুরঘুর করছিল নীতাদির সঙ্গে সঙ্গে। সুরমাদি বললেন — যা না রে, ওদের সঙ্গে ঘুরে আয়। তোরা দুজনেই যা। আমি যেতে পারছি না বলে তোরাও যাবি না কেন? আমার একা থাকতে কোন অসুবিধা হবে না। মা তো রয়েছে।

পাটনার বাসটা অপে(ারত। কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে আনল কমলেন্দু। এ(নি বাসটা ছাড়বে। বললাম — আচ্ছা দিদি আপনাদের কাছাকাছি বেরিয়ে আসার মানে কি আমাদের সঙ্গে নালন্দা যাওয়া?

— তাও আবার লুকিয়ে লুকিয়ে। ওনারা জানতে পারলে কি লঙ্কাকাণ্ড হতে পারে ভাবতে পারছেন? কমলেন্দু বলল।

— ও রে বাবা, সেকথা কল্পনাই করা যায় না। নীতাদি বললেন।

পাশ থেকে অদিতি টিপ্পনি কাটল — জানতে পারলে তো।

১০। নালন্দা

রাজগৃহ থেকে সিলি হয়ে নালন্দা যেতে হয়। দূরত্ব সাত মাইল।

সমতল প্রান্তর। অনেক দূরে দূরে আকাশের পটভূমিতে পাহাড়ের চিহ্(। দিগন্তরেখায় অস্পষ্ট কুহেলীপনার মতো। চালক সিলি থেকে এক ঠোঙা খাবার কিনল। খাদ্যবস্তুটির নাম খাঁজা। সিলির খাঁজা নাকি ভুবন বিখ্যাত।

কমলেন্দু বলল – খাঁজা? সে আবার কি? খাইনি তো কখনো।

নীতাদি বলল – খেয়েছ। ভাইফোঁটার সময় খাঁজা দিতে হয়। তোমাদের ভাইফোঁটা আছে তো?

– তা আছে।

– তাহলে নিশ্চয়ই খেয়েছ।

– তাহলে খেয়েছি। আসলে বোনেরা বলে দেয়নি তো। ভেবেছি অন্য কিছু।

নালন্দা মোড়ে বাস থেকে নেমে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে আরো জনাছয়েক যাত্রীও নামল। ধ্বংসস্তূপ মাইল দেড়েক দূরে। হেঁটে যেতেই ভালো লাগত। নীতাদি আর অদিতির ইচ্ছেয় এক্কা নেওয়া হল। দুটি এক্কা সব যাত্রীকে একসঙ্গে চাপিয়ে রওনা দিল।

একটু এগিয়ে বাঁ দিকে পড়ছে নবনালন্দার পথ। ডানদিকে আমাদের পথ এগিয়েছে প্রাচীন নালন্দার ধ্বংসস্তূপের দিকে। অ(ু রধ্বনি আর ঘন্টার মৃদু টুংটাং ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে। (ে তখামারের পাশ দিয়ে, জনবসতির ধার ঘেষে, বৃ(ছায়ায় হালকা রোদে চলতে চলতে আমরা নালন্দার নিকটবর্তী হলাম। বিংশ শতকের সপ্তম দশককে অনেক অনেক পিছনে রেখে আমরা যেন সপ্তম শতকে পৌঁছে গেলাম।

শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যেন কার ললিত কণ্ঠ –

অত্তদীপা বিহরন অত্তশরণা অনএ(শরণা।
ধম্মদীপা ধম্মশরণা অনএ(শরণা।।

কি বলছেন সৌম্য পু(ষেটি? বলছেন – নিজেকেই নিজের প্রদীপ করে নিয়ে পথ চলতে হবে। ধর্মকেই অনন্যশরণ হয়ে দীপ রচনা করে সত্যের সিঁড়ি বেয়ে আরোহণ করতে হবে।

গৈরিক বসন পরিহিত কয়েকজন যুবক সমবেত হয়েছে একটি ক(। শি(াদানক(। ওরা শি(াব্রতী। আরেকজন গৈরিকবসনা আছেন। তিনি অধ্যাপক। বলছেন – নিব্বানং পরমং সুখং।

শি(াব্রতীগণ অন্তরে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে – নির্বাণে পরম সুখ। পরম শান্তি। পরম আনন্দের কালোত্তীর্ণ স্বর্গ।

অধ্যাপক বললেন –

যে তম্‌সা এব তণহায় আসেস বিরাগ নিরোধা।
চাগো পর্চি নিস্‌সগগো মুত্তি অনালয়ো।।

আমাদের মধ্যে যে তৃষ(া আছে তা অনন্ত, এর সীমা নেই। এর জন্যই মানুষের দুঃখবেদনা। এর জন্যই মানুষ বেদনাজর্জর। এই তৃষ(ার নিরোধ ও বিসর্জন প্রার্থনা কর – এখানে মুক্তি(র পথ অবলোকন কর। এভাবেই দুঃখের নিরোধ হয়। আর পার্থিব কামনাবাসনার নিরোধ হলে মানুষ স্বর্গীয় আনন্দলাভ করে।

সর্বং অনিত্যম, সর্বং অনাত্মং, সর্বং (ণিকম্‌। জগত অনিত্য। সবই অনাত্ম। সবই (ণকালের।

সব্বপাপস্‌স অকরণং কুসলস্‌স উপসম্পদা, সচিত্তপরিয়োদপনং এতং বুদ্ধানসাসনং। সকল প্রকার পাপ হতে নিবৃত্তি, পুণ্য অনুষ্ঠান এবং আপন চিত্তের বিশোধন, এই হল বুদ্ধগণের অনুশাসন বা শি(া।

ন দীঘমায়ুং লভতে ধনেন ন চাপি বিত্তেন জরং বিহন্তি, অপ্পং হি তং জীবিতমাহু ধীরা, অস্‌সসতং বিপরিণামধম্মং। ধন দ্বারা কেউ দীর্ঘ আয়ু লাভ করতে পারে না, বিত্ত দ্বারা কেউ জরা ধ্বংস করতে পারে না। প্রাজ্ঞ জনেরা বলেন – জীবন (ণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল।

এই সেই নালন্দা বি(েবিদ্যালয় যার প্রতিটি ক(দিবারাত্রি শি(ক আর শি(ার্থীবৃন্দ সাধনামগ্ন ছিল। মুগ্ধ চোখে যেন প্রত্য(করছি সেই সব দৃশ্য। একদা এখানকার একশত ক(অধ্যাপকগণ বিদ্যাদানে রত ছিলেন। এক একটি ক(এক একটি বিষয়ের পাঠ হত। কেউ ব্রাহ্মণ্যদর্শন বা বেদগ্রন্থ পড়াতেন, কেউ সাংখ্যশাস্ত্র, কেউ গণিতশাস্ত্র, কেউ সাহিত্য, কেউ বা চিকিৎসা শাস্ত্র। প্র(ে আর উত্তরের মধ্য দিয়ে চলত সেই জ্ঞানার্জনপর্ব। সূত্রপাঠ ও তার ব্যাখ্যার পটুত্ব দিয়ে শি(ার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ করা হত। সময় জ্ঞাপিত হত শঙ্খধ্বনি মারফৎ। কাল পরিমাপের জন্যে ছিল জলঘটিকা। কী অপূর্ব ঐতিহ্যময় ছিল সেদিনের গৌরবময় নালন্দা বি(েবিদ্যালয়।

শনশন করে প্রমত্ত পবন প্রবাহিত হচ্ছে। জোরে আরো জোরে। তার সঙ্গে ঝরছে অজস্র তুষাররাশি। হিমালয়ের বুকে তুষারঝড় যেন (ি প্ত অজগরের মতো আছড়ে পড়ছে। ফুঁসছে আত্রে(াশে। তার মধ্য দিয়ে ধীর পদ(েপে পথ পরিত্র(মা করে চলেছেন এক বৌদ্ধভি(ু। কতদিন গেল, কত রাত্রি ফুরাল। তবু পথের শেষ নেই। লুইয়াঙের বৌদ্ধমঠ আজ অনেক দূরে। সেই মঠ থেকে যাত্রা শু(হয়েছিল তাঁর। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে। ল(্য এখনো অনেক দূরে। তাঁর সমগ্র জীবনের স্বপ্নসাধ একটিই। তা পূর্ণ

করতে এই কঠিন যাত্রা। কত নতুন দেশ পেরিয়ে চলা — লেক ইশিককুল, তাসখন্দ, তুরফান, সমরখন্দ। কত নতুন নতুন মানুষ। অবশেষে সেই পর্যটক ভি(কা্মীরে উপনীত হলেন। ভারতবর্ষের প্রবেশদ্বারে।

তখন কা্মীরের অধিপতি ছিলেন দুর্লভবর্মন। তিনি পাত্রমিত্রসহ রাজধানী প্রবরপুরের বহির্ভাগে অপে(া করছেন — দূরাগত অতিথিকে সম্মান জানাতে। তাঁর বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট হল জয়েন্দ্রবিহার। বহির্দ্বার থেকে পুস্পাচ্ছাদিত পথে বৌদ্ধভি(কে বিশ্রামভবনে নিয়ে যাওয়া হল। রাজার আনুকূল্যে এবং আতিথেয়তায় কা্মীরে দুটি বৎসর অতিবাহিত করলেন তিনি। ইতিমধ্যে একটি কাজের কাজ হয়েছে — সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

তারপর একদিন কা্মীর ত্যাগ করে এলেন শিয়ালকোট। মথুরায় তথাগতের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন, আনন্দ এবং রাহুলের অনেক স্মারক স্তূপ ছিল। আগত ভি(মথুরা দর্শনান্তে অযোধ্যা, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, কপিলাবাস্তু, কুশীনগর, সারনাথ ও পাটলীপুত্র ভ্রমণ করলেন। ভারতবর্ষের যেখানেই বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্(রয়েছে সেখানেই তাঁর পদচিহ্(পড়ল। আশ্চর্য নিষ্ঠা সেই ভি(ুর! এশিয়া মহাদেশের কোন প্রান্ত থেকে তিনি এসেছেন পাহাড় পর্বত নদনদী অতিত্র(ম করে কত দেশ ঘুরে ঘুরে এই ভারতবর্ষে। এ দেশে এসেও তিনি দর্শন করলেন কত পুণ্যস্মৃতি। অবশেষে পাটলীপুত্র হয়ে, গয়া-বোধগয়া হয়ে বহু অভিলাষিত নালন্দার দিকে যাত্রা হল তাঁর। সেই চৈনিক পরিব্রাজকের নাম হিউয়েন সাঙ। জীবৎকাল ৬০০ থেকে ৬৬৪ খৃষ্টাব্দ। তাঁর প্রাণাধিক আকাঙ্খা ছিল ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি দর্শন করে সেখান থেকে মূল বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করে তবে দেশে ফিরবেন।

আরেক চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন এসেছিলেন ভারতবর্ষে। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। চীন থেকে তাঁর যাত্রা শু(হয়েছিল ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে। তখন দেশে গুপ্তরাজাদের রাজত্ব চলছিল। রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উত্তরভারতের তথা ভারতবর্ষের প্রবল প্রতাপান্বিত শাসক। গুপ্তরাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফাহিয়েন তিন বছর পাটলীপুত্রে বসবাস করে রাজগৃহ-গয়া হয়ে কাশী চলে যান। তিনি নাল গ্রাম সারিপুত্তের জন্মস্থান বলে উল্লেখ করেন। সেখানে সারিপুত্রের নামে এক স্তূপ ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তিনি নালন্দার কথা কিছু বলে যান নি। ঐতিহাসিকদের মনে হতেই পারে যে চতুর্থ শতকের গোড়ায় নালন্দা তেমন উল্লেখযোগ্য শি(াকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠেনি।

হিউয়েন সাঙ নালন্দা সম্পর্কে অনেক কথা বলে গিয়েছেন। রাজকীয় শোভাযাত্রা তাঁর আগমন উপল(সাদর সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে নালন্দার বহিরাংশে প্রতী(ারত ছিল। অজস্র রঙিন পতাকা, অনেক ছত্র, বাদ্য ও পুস্পমালা নিয়ে। মঠের দুশ' ভি(ু

আর সহস্রাধিক গৃহী সন্ন্যাসী শোভাযাত্রায় সমবেত হয়েছিল। আনন্দ কোলাহলে দিগন্ত মুখরিত। অতিথিকে পেয়ে তাদের প্রবল উচ্ছ্বাস বাঁধা মানছিল না। পরিব্রাজক যে মুহূর্তে নালন্দার প্রবেশ-প্রাচীর লঙঘন করলেন অমনি চারিদিকে কলরোল উঠল। শঙ্খঘণ্টার শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল। দূরদেশ থেকে এসেছেন এক নিষ্ঠাবান অতিথি এই ভারতবর্ষে — এ তো আমাদের প(অতি গৌরবের কথা। এই ভাবনা সকলকে স্পর্শ করছিল।

হিউয়েন সাঙ নালন্দাবাসীর আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। সামান্য ভি(তিনি, অথচ ক ত রাজকীয় সম্মান দেওয়া হল তাঁকে। মঠবাসীদের অকৃপণ আতিথেয়তায় ও গভীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারপর সা(াৎ করলেন নালন্দার অধ্য(মহাস্থবির শীলভদ্রের সঙ্গে। বয়োভারে আত্র(ান্ত তিনি তখন। বয়স একশ' আট বছর। ছিলেন সমতট রাজবংশের সন্তান। বৈভব বর্জন করে ভি(হলেন। জ্ঞানভি(ু। বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার তাঁর দখলে। তাঁর যশ দেশদেশান্তরে প্রচারিত হয়েছে। হিউয়েন সাঙও শুনেছিলেন সে কথা। তখন থেকে তাঁকেই তিনি গু(পদে বরণ করে নিয়েছেন। বহুবছর পরে দীর্ঘ পথপরিত্র(মার শেষে সেই বহুবাঞ্ছিত গু(দর্শন সম্ভব হল।

শীলভদ্রও আনন্দিত হলেন বহুশ্রুত চৈনিক পরিব্রাজকের সঙ্গে মিলিত হয়ে। উভয়ের নয়নে আনন্দাশ্রু বহমান। চৈনিক শিষ্য অধ্য(র চরণচুম্বন করে তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। অধ্য(তাঁকে দুহাতে ধরে তুলে নিলেন। নালন্দায় অবস্থানকালে মাননীয় অতিথির সমস্ত দায়িত্ব ও ব্যয়ভার অর্পণ করা হল ভ্রাতুষ্পুত্র বুদ্ধভদ্রের উপর। বুদ্ধভদ্র তাঁর বসবাসের জন্যে নির্দিষ্ট করলেন চতুস্তল গৃহ। সঙ্গে দিলেন একজন পাচক এবং একজন বহুভাষিক পরিচালক। স্থানান্তরে গমনাগমনের জন্যে নির্দিষ্ট হল একটি হাতি।

অধ্য(শীলভদ্রের কাছে তিনি মহাযান মতের সমস্ত মূলগ্রন্থ পাঠ করতে লাগলেন। অবসর যাপনের জন্যে মাঝে মধ্যে হাতির পিঠে করে যেতেন মগধ রাজধানী রাজগৃহে। সেখানকার পুণ্যস্থানগুলি দর্শন করতেন। বেণুবন, রত্নগিরি, সপ্তপর্ণী গুহা ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক সূত্রে নালন্দা সম্পর্কে আরো প্রাচীন তথ্য নেই বললেই চলে। সপ্তদশ শতকের তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথ যিনি নালন্দাকে সারিপুত্রের জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নি(ত করেন, তিনি বলেছিলেন — খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক নালন্দায় সারিপুত্রের নামে এক স্মৃতিচৈত্য নির্মাণ করেন এবং নালন্দা বিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন।

দ্বিতীয় শতকের মহাযানী দার্শনিক নাগার্জুন নাকি নালন্দায় শি(ালাভ করেছিলেন। পরে তিনি অধ্য(পদে অধিষ্ঠিত হন। ঐ সময় সুবিষু(নামক ব্রাহ্মণ নাকি হীনযান ও মহাযান মতের অবনমন র(া করতে এখানে একশত আটটি মন্দির নির্মাণ করেন। চতুর্থ শতকের মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের দার্শনিক আর্যদেবও নালন্দার সঙ্গে যুক্ত(ছিলেন।

পঞ্চম শতকে যোগাচার সম্প্রদায়ের দার্শনিক অসঙ্গ উত্তরজীবনের বারো বছর এখানে অতিবাহিত করেন। তাঁর পরে সহোদর ভ্রাতা বসুবন্ধু নালন্দার প্রধান পুরোহিত পর্যন্ত হয়েছিলেন। আচার্য শান্তর(ত যিনি তিব্বতে আমন্ত্রিত হয়ে ধর্মপ্রচারে যান এবং সেখানে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে মারা যান, তিনিও নালন্দার সঙ্গে সংযুক্ত(ছিলেন।

গুপ্তযুগে নালন্দার তেমন কোন উল্লেখ ছিল না। ধ্বংসাবশেষ থেকে সেরকম কোন সা(্যনিদর্শন মেলেনি। অবশ্য বীর সমুদ্রগুপ্তের (৩৪০-৩৭৫ খৃষ্টাব্দ) এক তাম্রশাসনে এবং কুমারগুপ্তের (৪১৫-৪৫৫ খৃষ্টাব্দ) এক তাম্রমুদ্রায় নালন্দার উল্লেখ ছিল। ঠিক এরপর থেকেই ল(্য করা যায় নালন্দার সর্বাত্মক উন্নতি। পশ্চিম ভারতে ত(শিলা ছিল অন্যতম শি(াকেন্দ্র। বর্বর হুনজাতির দুর্ধর্ষ আত্র(মণে সেই শি(াকেন্দ্রটি তখন বিধ্বস্ত। ফলে নালন্দা বি(বিদ্যালয় ছিল একমাত্র শি(াকেন্দ্র। দেশেবিদেশে ত্র(মশ বিখ্যাত হয়ে উঠছিল। আদিযুগের না হলেও পরবর্তীকালের গুপ্তরাজাদের অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছিল নালন্দায়। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন — শত্র(াদিত্য নামক গুপ্তরাজা এখানে বিহার নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, বালাদিত্য, বজ্র নামক গুপ্ত রাজারা বিহার নির্মাণ করে যান। একজন গুপ্তরাজা নালন্দার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্যে ছয়টি গ্রামদান করেছিলেন।

গুপ্তরাজাদের পরে হর্ষবধনের আমলে নালন্দার যেন পুন(খান হয়। কনৌজের মহারাজ হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খৃষ্টাব্দ) বি(বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহের জন্য করেছিলেন একশত গ্রামদান। তিনি পিত্তলধাতু দ্বারা একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। পালযুগেও রাজানুকূল্য অব্যাহত ছিল। ফলে নালন্দার খ্যাতিও ছিল অব্যাহত। দেবপালের (৮১০-৮৫০ খৃষ্টাব্দ) তাম্রশাসন থেকে জানা যায় — সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রা) মহারাজা বালপুত্রদেবের অনুরোধে মহারাজ কর্তৃক নির্মিত বিহারে বসবাসকারী ভি(ুদের ব্যয়নির্বাহের জন্য পাল রাজা পাঁচখানি গ্রামদান করেছিলেন। সুবর্ণদ্বীপের মহারাজা নির্মিত বিহার বর্তমানে বিহার-১ নামে পরিচিত। ঐ তাম্রপত্রটি বিহার-১এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছিল।

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। সমগ্র এশিয়ায় নালন্দার খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছে দূরদূরান্তরে। নানা দেশ থেকে শি(ার্থীরা আসছে নালন্দায়। প্রবেশ তোরণে অপে(া করছে বিপুল ছাত্রসমাজ। প্রত্যেকেই মঠে শি(ালাভের বিরল সৌভাগ্য প্রত্যাশা করছে। মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার তো সহজ নয়। দশজন পরী(ার্থীর মধ্যে মাত্র দুজন সফল হতে পারে। হিউয়েন সাঙের সময়ে নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার।

পনেরো মাস পরে তীর্থের ইশারা চৈনিক পরিব্রাজককে চঞ্চল করে তুলল। আবার তাঁর পথ চলা শু(হল। অবশিষ্ট ভারতের তীর্থস্থান দর্শন করলেন। কাঞ্চী মহাবলীপুরম

অজন্তা দেখলেন। তারপর ফিরে এলেন নালন্দায় পাঠসমাপন করতে। একদিন তাঁর শি(াও সমাপ্ত হল। অধ্য(শীলভদ্রের কাছে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। অধ্য(র মন চায় না এমন নিষ্ঠাবান শি(ার্থীকে বিদায় জানাতে। তবু বিদায় তো দিতেই হবে। স্বদেশকে মুছে দেওয়া যায় না মন থেকে। যে মাটিতে মানুষের জন্ম সেখানে ফিরে যাওয়ার সাধ মানুষের থাকবেই। এমন সময় ভাস্করবর্মন এসে তাঁকে কামরূপ রাজ্যে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে চলে গেলেন হর্ষবর্ধনের রাজ্যে। মহারাজ হর্ষবর্ধন তখন প্রয়াগে ধর্মসম্মেলন করে দান(ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে। সেই প্রয়াগ(ত্র গেলেন। তারপর আবার কাশ্মীর হয়ে কাপিশা-গান্ধারের পথে দেশে ফিরলেন। অনেক অনেক বছর পরে। ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে শীলভদ্রের পরে অধ্য(-পদে আসীন হয়েছেন আচার্য ধর্মকীর্তি।

অনতিকালের মধ্যে নালন্দার স্বর্ণোজ্জ্বল আকাশ মেঘমেদুর হয়ে উঠল। পালযুগে তা কিছুটা ফিরে এসেছিল বটে কিন্তু তারপরেই ঐতিহ্যময় উজ্জ্বলতা ধূলিধূসরতায় বিবর্ণ হয়ে গেল। কুমারিল-শঙ্করাচার্য কর্তৃক ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুন(জ্জীবন বৌদ্ধধর্মের অবনমনের আরেকটা কারণ হতে পারে। সবথেকে বড়ো কারণ হয়তো সময়। কোন কিছুই তো দীর্ঘকাল উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। নানা কারণের হাত ধরে তার অব(য় অবধারিত।

শোন, ওই অশ্ব(ুরধ্বনি। অনেক অশ্ব(ুরধ্বনি। রক্ত(াক্ত(অশ্ব(ুরধ্বনি। বিজয়গর্বের উল্লাসে বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। শোন, ওই অট্টহাস্য। সূর্যের আলোকে লৌহ তরবারী রক্ত(স্নাত মানুষের হাতে কী প্রখর কী শানিত হয়ে উঠেছে। আঘাত করছে মানুষের দেহে। যন্ত্রণা। মৃত্যু। আঘাত করছে ঐতিহ্যে। ওরা তীব্রগতিতে ধেয়ে আসছে। মদমত্ত অশ্বের মুখে ফেনা। ঐ অশ্বারোহীরা মানুষের হৃদয়ের বিচার জানে না। উদারতা বোঝে না। জানে কেবলমাত্র ধর্মান্ধ অট্টহাসিতে সবকিছু ভেঙে তছনছ করতে। লুণ্ঠন করতে। ওরা জয় করেছে মিরাট দিল্লি রণথম্বোর। জয় করেছে দুর্গম দুর্গ কালাঞ্জর। বন্দী করেছে অর্ধল(নরনারী। ওরা অগ্রসর হয়েছে পূর্ব ভারতের দিকে। ভূঁইলি চুনার ওরা দখল করেছে। আর বিলম্ব নেই। এই দুর্বার বিজয়রথ থামাবে কে? এই (দ্রতাণ্ডব পৈশাচিক আনন্দোল্লাস (দ্ধ করবে কে? সবকিছু ভাঙল। এত ঐতিহ্য, প্রাণবন্ত সংস্কৃতির মিছিল রক্ত(াক্ত(হয়ে গেল। সেই অস্ত্রাঘাতের নির্মম যন্ত্রণা আজো বহু শতাব্দীর উপান্তে মহাকালের দীর্ঘ ব্যবধান পার করে স্মৃতিপথে আমাদের আকুল করল। নালন্দার সর্বোচ্চ তলের উপরে দাঁড়িয়ে নীরবে সেই যন্ত্রণার গভীরতা অনুভব করছিলাম আমরা চারজনে।

তারপর কতদিন এই স্থানটি পৃথিবীর অন্ধকার গর্ভে নিমজ্জিত ছিল! কতকাল ধরে? কয়েক শতাব্দী হবে বোধ হয়। মুসলিম রাজত্ব শেষ হয়েছে। এসেছে ইংরেজ রাজত্ব।

তারপর উনবিংশ শতকের গোড়ায় ইংরেজ বুকানন-হ্যামিলটন এই ধ্বংসাবশেষের হদিশ পান। ঐ শতকের মাঝামাঝি ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক লর্ড আলেকজান্ডার কানিংহাম কবর খনন করে মৃত বিদ্যালয়ের নানা চিহ্(উদ্ধার করেন। বড়গাঁও গ্রামের উত্তর দিকে। ১৯১৫ সাল থেকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খোদাই কার্য পরিচালনা করে। দশ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে মাত্র বত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ একর জমি খনন করা সম্ভব হয়।

'নালান্দা' কথার অর্থ 'পদ্মপাতা'। একদা অনেক সরোবর ছিল এখানে এবং তাতে ফুটে থাকত অজস্র পদ্মফুল। তাই এর নাম নালান্দা। নালান্দা থেকে নালন্দা। হিউয়েন সাঙের বর্ণনানুসারে নালন্দার আম্রবনে এক দীঘি ছিল এবং সেখানে নালন্দা নামে এক নাগরাজ বাস করত। এসব গল্প তিনি শুনেছিলেন স্থানীয় মানুষজনের কাছে।

টিকিট কেটে ধ্বংসস্তূপে প্রবেশ করলাম। বিহার-৪ এবং বিহার-১এর মধ্য দিয়ে প্রবেশপথ। শেষ হয়েছে উত্তর-দ(িণে প্রসারিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। তার তিনদিকে জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সেদিনের নানা স্মৃতি।

চিত্র-১৭। নালন্দার প্রবেশপথে।

উত্তর-পূর্বদিকে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ-নির্দেশিত মন্দিরস্থান-৩। এটিই মূলমন্দির। আমরা তার সর্বোচ্চ স্তূপের চূড়োয় উঠেছি। শুনেছিলুম এটি ছিল সপ্ততল বিশিষ্ট মূলভবন। কথাটি ঠিক

চিত্র-১৮। নালন্দার মূলভবন।

নয়। আসলে সাতবার এই স্তূপের উপর ত্র(মান্বয়ে নির্মাণ হয়েছে। নির্মাণের উপর নির্মাণ। ফলে তার আকার ও আয়তন বর্ধিত হয়েছে।

সম্ভবত চতুর্থ শতকে আদিমন্দির ছিল বারো ফুট দীর্ঘ বর্গাকার (ে ত্রের উপর। পরবর্তী দুটি নির্মাণও তার উপর। পঞ্চম নির্মাণকার্য ব্যাপকতম ছিল। তখন চার কোনায় চারটি বু(জ গড়া হয়। ঐ বু(জের মধ্যে দেবকোষ্ঠ ছিল এবং সেখানে চুনবালি দিয়ে বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। বাইরের প্রাঙ্গণে যে অজস্র স্তূপাদি রয়েছে, তার মধ্যে পঞ্চম শতকের বুদ্ধমন্ত্র-খোদিত ইষ্টক খণ্ড পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে অনুমান দেবকোষ্ঠের মূর্তিসকলও ঐ কালের। বর্তমান স্তূপটি ষষ্ঠ ধ্বংসস্তূপের উপর গড়া সপ্তম নির্মাণ। সু-উচ্চ মহাস্তূপের চার কোণে কা(কার্যময় চারটি বু(জ রয়েছে। গর্ভমন্দিরে রয়েছে নানা দেবমূর্তি। তিনটি বু(জ নিষ্কাশিত হয়েছে। প্রাপ্ত দেবদেবীর মধ্যে দেবী তারা নালন্দার অন্যতম উপাস্য দেবী ছিলেন।

দীর্ঘ সোপানপথ তিন-চার খেপে উপরে উঠে গিয়েছে। উপরতলে উত্তরমুখী মন্দিরবেদী। বর্তমানে বিগ্রহশূন্য। নিম্ন

চিত্র-১৯। বুরুজ মূলভবন।

চিত্র-২০। বুরুজের মূর্তি।

চিত্র-২১। বুরুজ মূলভবন।

চিত্র-২২। মূলভবন।

ভূমিতলে সামনের দিকে পথ দ(ি ণদিকে চলে গিয়েছে। পথের দু'ধারে ধ্বংসাবশেষের সারি। পূর্বদিকে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আর পশ্চিমদিকে বিহারের। মোট এগারোটি বিহার বা সংঘারাম আছে। আর পাঁচটি মন্দির পাওয়া গিয়েছে।

বিহারের গঠনবৈচিত্র্য মোটামুটি একই রকমের। আয়তাকার (ে ত্রের মধ্যদেশে প্রশস্ত অঙ্গন বা সভাগৃহ। তার চারদিকে বারান্দা ও প্রকোষ্ঠাবলী। প্রবেশপথের মুখোমুখী সভাগৃহের অন্য প্রান্তে বিগ্রহাসন। সভাগৃহের মেঝে প্রস্তর-নির্মিত বা ঢালাই-করা। প্রকোষ্ঠের দেওয়াল ইটের তৈরী। আপাতত আট-দশ ফুট উঁচু দেয়াল পাচ্ছি। দেয়ালের গভীরতা থেকে বোঝা যায় এই সকল ভবন একদা বহুতলবিশিষ্ট ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্য পয়ঃপ্রণালী আছে — ভবনের পিছনদিকে চলে গিয়েছে। বিহারের প্রবেশপথে কোথাও কোথাও রয়েছে সোপানশ্রেণী। কোন কোন অঙ্গনে কূপ দেখা যাচ্ছে। কোথাও বা চুল্লি।

মূলমন্দিরের লাগোয়া পূর্বদিকে বিহার-১এ এবং বিহার-১বি। ৮১০-৮৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা দেবপালের হাতে তৈরী হয়েছিল এ দুটি উত্তরমুখী সংঘারাম। একটি ছোট, অন্যটি বড়ো আকারের। বড়োটিতে কুয়ো রয়েছে। মনে হয় একদা দ্বিতল ভবন ছিল।

তারপর পূর্বদিক বরাবর পরপর একাধিক বিহার। সব পশ্চিমমুখী। সারির সর্বদ(ি ণে বিহার-১। এর নির্মাণকাজে বর্তমানে নয়টি স্তর দেখা যাচ্ছে। ঢালাই-করা মেঝে, উপর্যুপরি গাঁথা দেয়াল ও নালার পরিকল্পনা থেকে তার সা(্য মেলে। সবচেয়ে নিচে

চিত্র-২৩। বিহারের ধ্বংসাবশেষ।

চিত্র-২৪। বিহারের ধ্বংসাবশেষ।

চিত্র-২৫। বিহারের ধ্বংসাবশেষ।

চিত্র-২৬। বিহারের ধ্বংসাবশেষ।

গুপ্তরাজাদের নির্মাণ। ছাত্রাবাসের ঘরগুলো ছোট হলেও বই-রাখার জায়গা আছে। হর্ষবর্ধনের সময়কার নির্মাণে কুঠুরিতে শয়নের ব্যবস্থা ছিল। পাল আমলের কামরায় দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি দুটি শয্যা। ভবনটি দ্বিতল তো বটেই, সম্ভবত ত্রিতল কিংবা চতুস্তলবিশিষ্ট ছিল। দ(ি ণপূর্ব কোনায় সিঁড়ি রয়েছে। বিহারের ধ্বংসস্তূপে তিনটি তাম্রপত্র পাওয়া যায় — সমুদ্রগুপ্ত, ধর্মপাল ও দেবপালের সময়ের।

চিত্র-২৭। বিহারের ধ্বংসাবশেষ।

চিত্র-২৮। অগ্নিদাহের চিহ্ন।

বিহার-১এর উত্তরপাশে বিহার-৪ এবং বিহার-৫। প্রথমটির নিম্নতলে দরজার ফ্রেমে দগ্ধকাঠ এবং কাদা-পলেস্তারায় অগ্নিচিহ্ন ল(্য করা যায়। সিঁড়ির উপর স্কাইলাইটের ব্যবহার নজর কাঁড়ে।

বিহার-৬এ দু'প্রস্থ চুল্লি দেখা যাচ্ছে। এই সকল চুল্লি রান্নবান্নার জন্য ব্যবহৃত হত নাকি রসায়নাগার হিসেবে জানিনা। ইট-বাঁধানো দুটি প্রাঙ্গণ পেলাম। নিচের প্রাঙ্গণে দুটি বিগ্রহাসন। অন্য প্রাঙ্গণে একটি।

বিহার-৭এ যেন তিন কালের স্বা(র আছে। নিচে ইটের মেঝে তো উপরের দুটি তলে ঢালাই-করা মেঝে। তৃতীয় স্তরে পাওয়া গিয়েছে সন্ন্যাসী বিপুলশ্রীমিত্রের শিলালিপি। দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে তিনি উত্ত(বিহারের তৃতীয় দফায় নির্মাণ করেন।

বিহার-৮এ দ(ি ণ-পূর্ব কোনার কুঠুরিতে দরজার উপর লিন্টেলের ব্যবহার ল(্য করলাম। বিহার-৯এ আবার অনেকগুলি চুল্লি দেখা যাচ্ছে। এখানেও স্বাইলাইট ব্যবহৃত হয়েছে। সিঁড়ির কাঠে অগ্নিদাহের স্বা(র সুস্পষ্ট। কাদা-মশলায় গাঁথা ইটের তৈরী আর্চ বা খিলান দেখা যাচ্ছে বিহার-১০এ। পরবর্তী বিহারে পাওয়া গিয়েছিল ভাঙা কলসের মধ্যে ঘরবাড়ি-তৈরির শুকনো মশলা।

পশ্চিমদিকে চৈত্যমন্দির। এদিকের সকল মন্দিরই পূর্বমুখী। দ(ি ণ থেকে উত্তর দিকে পরপর পড়ছে বারো, তেরো এবং চৌদ্দ নম্বর মন্দির-এলাকা। কেবল মন্দির-২ রয়েছে বিহার-৭ ও বিহার-৮এর পিছনে।

মন্দিরসারির প্রথমে বা দ(ি ণে রয়েছে ১২-নম্বর মন্দির। বর্গাকার ভূমিতে। দুদফায় নির্মাণ হয়েছে। প্রথম বারের নির্মাণে দেবকোষ্ঠ এবং ছোট ছোট পিলার ছিল। পরের বারের নির্মাণ সাদামাটা। মন্দিরের চারকোনায় চারটি ছোট বিগ্রহাসন আছে। মন্দিরের ভিতরে বোধিসত্ত্বমূর্তির আসন। গর্ভগৃহের এবং ছোট বিগ্রহাসনের বাইরের দেয়ালে

দেবকোষ্ঠ আছে। চুনবালির স্টাকো মূর্তি দ্বারা সজ্জিত। দেয়ালগাত্রে কিছু কিছু মূর্তি খোদিত রয়েছে এখনো। সবচেয়ে নিচের সারির মূর্তিগুলো বেশ অ(ত অবস্থায়। কয়েকটি স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে। স্তম্ভের ভগ্নদশা পীড়া দেয়। চারিদেকে আরো অনেক মূর্তি বি(প্ত রয়েছে। অনুচ্চ ইটের সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়। চারিদিকে অনেক স্মারকস্তম্ভ। অশোকচত্র(পর্যন্ত দেখা গেল। মন্দিরের উত্তর-দ(ণে দুটি পৃথকপূজাবেদী আছে। সেখানে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধমূর্তির অধিষ্ঠান।

চিত্র-২৯। মন্দির-১২, নালন্দা।

চিত্র-৩০। অলঙ্কৃত স্তম্ভ, মন্দির-১২।

মন্দির-১৩ বর্তমানে ধ্বংসাবশেষ। উত্তরদিকে ইটের তৈরী ফার্নেস পাওয়া গিয়েছে। হয়তো ধাতুদ্রব্য নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হত। মন্দির-১৪র গর্ভাসনে বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। মূর্তির পীঠে হরিণ ও সিংহের চিত্রাঙ্কন। একমাত্র এখানেই রঙিন পেন্টিংয়ের স্বা(র মেলে। মন্দির-২এর বাইরের ভিতের উপর ২১১টি স্থাপত্য-প্যানেল বসানো। শিব-পাবর্তী, ময়ূরবাহন কার্তিক, বাদ্যরত কিন্নর, ঘরোয়া নানা দৃশ্য প্যানেলে খোদিত। স্থাপত্যগুলি ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের রচনা। মন্দিরটি আরো পরবর্তীকালের।

মন্দির থেকে মন্দিরে, প্রাঙ্গণ থেকে প্রাঙ্গণে অনেক ছুটোছুটি করেছি। নালন্দায় গাইড ছাড়া জানার চেষ্টা করা প্রায় অসম্ভব। গাইড নিয়েও আমরা সামান্যই জানতে পেরেছি। যতটা জানতে পেরেছি তার থেকে অনুভব করেছি অনেক বেশি। আসলে দূরাগত মানুষের স্মৃতি ও কাল্পনিক সান্নিধ্য ভালো লাগছিল। খুব ভালো লাগছিল।

— অনেক হয়েছে, এবার ফিরতে হবে। নীতাদি ডাক দিলেন।

অদিতিও বলল — হ্যাঁ দিদি ওদিকে কি যে হচ্ছে কে জানে!

অগত্যা ফিরে যেতে হল।

দিল্লির সুলতান কুতুব-উদ্দিন আইবকের সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বক্তি(য়ার খিলজী। ইনিই হচ্ছেন সেই মুসলিম সেনাপতি যার রণহুঙ্কারে নালন্দার সব ঐ(র্য নিভে গিয়েছিল এক লহমায়। সম্ভবত ১১৯৩-১১৯৭ সালের মধ্যে। মুছে গিয়েছিল

বিস্মৃতির অন্ধকারে। তুর্কী আত্র(মণের পরে মুদিতভদ্র নামের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কিছু মন্দির-চৈত্য সংস্কার করেন। কিছুকাল পরে অগ্নিসংযোগে নালন্দা আবার ভস্মিভূত হয়। তখন রত্নোদধি নামের লাইব্রেরি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছিল বলে তিব্বতী সূত্রে জানা যায়। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার দুটি বিহারে কেবলমাত্র সত্তরজন ছাত্র ছিল। তার মধ্যে ধর্মস্বামী নামের একজন তিব্বতী শি(ার্থী ছিল। তখন নাকি আরেকবার নালন্দার উপর আত্র(মণ হয়েছিল।

আজ আর সেই কোলাহলমুখর অধ্যয়নগৃহ নেই, সেই জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপকবৃন্দ নেই। একদা এখানে ছিলেন দ্বিতীয় শতকের নাগার্জুন, পঞ্চম শতকের দিঙনাগ, সপ্তম শতকের ধর্মপাল এবং শান্তর(ত। ছিলেন পণ্ডিত পদ্মসম্ভব যিনি তিব্বতে লামা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ আর নেই তাঁরা। নেই একাগ্রচিত্ত শি(ব্রতীরা। কিছুই নেই। থাকবে কি করে? সবই যে ন(র। মানুষ এবং মানুষের সৃষ্টি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে একদিন যার প্রবল ঐ(র্য ছিল, আজ তার দীনহীন রূপ। নালন্দার গোটা এলাকাটি যেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। নিতান্ত গণ্ডগ্রাম হয়ে। মহাকাল বড়ো নিষ্ঠুর।

— সত্যি ভাবতে পারা যায় না। সেদিনের নালন্দার আজ এ কী দুরবস্থা!

— আজকালের শি(াদানের নীতিনিয়ম যা হয়েছে সে আর বলার নয়। আয়োজন আছে। কিন্তু আসলে সব বহ্বারম্ভে লঘুক্রি(য়া। আমার ইচ্ছে হয় যদি (মতা পেতাম তো নালন্দার মতো একটি শি(াকেন্দ্র গড়ে তুলতাম। শি(কা নীতাদি বলে উঠলেন।

এক পাঞ্জাবি পরিবার সারা(ণ ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত রইল। অনেক ছবি টবি তুলল। আমাদের কোন ক্যামেরা ছিল না বলে ছবি তুলতে পারিনি। সেই এক আপশোষ রয়ে গেল। মনের ক্যামেরা ভরসা করে নিশ্চিন্ত রইলাম।

পাঁচটার মধ্যে বাসস্টপে পৌঁছতে হবে। এর পরেও অবশ্য বাস আছে। কিন্তু আমাদের আর দেরি করা ঠিক হবে না। নীতাদি-অদিতি দুজনেই একটু ঘুরে আসছি বলে বেরিয়েছে ঘর থেকে। অনেকটা দেরি হলে সুমিদি-মাসিমার সন্দেহ তো হবেই। এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে বেশি(ণ থাকাও সমীচীন নয়।

এক্কার কাছে এসে দেখছি অন্য যাত্রীরা তখনো ফেরেনি। মানে তখনও খানিকটা সময় আছে হাতে। শুনেছিলাম এদিকে মিউজিয়াম আছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম কোথায় তার অবস্থান। কমলেন্দু জানতে গেল বলল — এই টিকিটেই আগামীকাল মিউজিয়াম দেখা যাবে কিনা। ওরা বলল — না দেখা যাবে না।

নীতাদিকে বললাম — দৌড়োন দিদি। এতদূরে এসে একেবার চোখের দেখা না দেখে চলে যাব? একবার অন্তত চোখ বুলিয়ে যাই চলুন।

— চল। দু'দশ মিনিটে কী আর ছাই দেখা হবে? তবু চল। সকলে দ্রুত পা চালাল।

তিন কামরার যাদুঘর। প্রথমটিতে ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া মানুষ সমান উঁচু উঁচু বুদ্ধমূর্তি। বিভিন্ন ভঙ্গীমায় মূর্তিগুলো। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কামরায় সূক্ষ্ম কা(কার্যময় নানা শিল্পকলার নিদর্শন। কিছু শীলমোহর আছে। নালন্দা মহাবিহারের নিজস্ব শীলমোহরে লেখা ছিল 'শ্রী-নালন্দা-মহাবিহারীয়ার্য-ভি(-সঙঘস্য'। যে সব রাজাদের শীলমোহর দেখা গিয়েছে তাঁরা হলেন গুপ্তরাজবংশের নরসিংহগুপ্ত ও কুমারগুপ্ত, মৌখরি বংশের সর্ববর্মন ও অবন্তীবর্মন, আসামের সুপ্রতিস্তিবর্মন ও ভাষ্করবর্মন, কনৌজের হর্ষবর্ধন। মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন রাজার — কুমারগুপ্ত-১, নরসিংহগুপ্ত, শশাঙ্ক (আঃ ৬০০-৬২০ খৃঃ), প্রতিহার-রাজ আদিবরাহ তথা ভোজ-১ (আঃ ৮৩৫-৮৮৫ খৃঃ), গাড়োয়াল বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র (আঃ ১১১৪-১১৫৫ খৃঃ)। সাজানো রয়েছে নানা রকমের যন্ত্রপাতি, পশুপাখি, ভৌতিক চেহারার মূর্তি। খুব সুন্দর লাগল (দ্রাকার গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ডের উপরে খোদিত বুদ্ধমূর্তি। আট-দশ ইঞ্চি মাপের ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তিগুলিও দা(ণ।

দেখতে দেখতে অদিতি বলল — ভারী সুন্দর এগুলো, তাই না?

— হ্যাঁ, চোখ যেন নয়ন হয়ে গেল।

— যা বলেছেন। ইচ্ছে করছে শোকেস থেকে তুলে নিই একটা।

— চুরি করা মহাবিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। চেষ্টা করবেন নাকি?

ত(ু নি দারোয়ান জানিয়ে দিল — টাইম হো গয়া।

সকলে বেরিয়ে এলাম। সন্ধ্যা হয়েছে। গাছে গাছে পাখিদের কলকূজন। পশ্চিমের সিঁদুর আকাশ আস্তে আস্তে মলিন হয়ে উঠছে। হাল্কা বাতাসে অদিতির হলুদ আঁচল উড়ছে। এক্কা চলল। টুংটাং (মঝুম করে। হলুদ আঁচল। হলদে রঙটাও যে এত উজ্জ্বল হতে পারে আগে খেয়াল হয়নি কখনো।

তথাগত একবার নালন্দা এসেছিলেন। রাজগৃহে বুদ্ধের শেষ জীবন অনেক অশান্তিতে কেটেছিল। তখন মহারাজ বিম্বিসারের মৃত্যু হয়েছে। পুত্র অজাতশত্রু মগধের রাজা হয়েছেন। দেবদত্ত এবং অজাতশত্রু চত্র(ান্ত করে বুদ্ধের বি(দ্ধাচরণ করতে লাগল।

শিষ্য মৌদগল্যায়নকে একদিন নগ্ন শ্রমণের দল হিংসায় উন্মত্ত হয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল। বিরহাতুর সারিপুত্র বুঝলেন যে তাঁরও আয়ু ফুরিয়ে আসছে। তিনি জন্মস্থান নালন্দায় ফিরে গেলেন। বুদ্ধদেবের সঙ্গে ওখানেই তাঁর শেষ দেখা হল। নালন্দার এক আম্রকুঞ্জে।

তারপর বুদ্ধদেব গেলেন পাটলীপুত্রে — অজাতশত্রুর নবনির্মিত রাজধানীতে। এদিকে সারিপুত্র নির্বাণ লাভ করলেন। বুদ্ধদেব তখন পাটলীপুত্র থেকে কোটিগ্রাম হয়ে নাদিকদের গ্রামে। সারিপুত্রের ভি(াপাত্র এবং হরিদ্রা চীবর বহন করে নিয়ে এলো তাঁর ভাই। তথাগতও শেষবারের মতো ধর্মোপদেশের জন্যে দেশে দেশে ভ্রমণরত হলেন। বৈশালী শ্রাবস্তী গেলেন। তারপর পাবা। সেখানে কর্মকার চুন্দর গৃহে সশিষ্য আহার করলেন।

হিরণ্যবতী নদী পার করে (ত্রিয় মল্লরাজার রাজধানী কুশীনগরের উপকণ্ঠে উপনীত হলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা ছিল সেদিন। অশীতিপর তথাগত শালবনে পৌঁছেছেন। জীবন অনিত্য। উত্তর দিশায় মস্তক স্থাপন করে ডানদিকে ভর করে শয্যা নিলেন। অন্তিম শয্যা। সিংহশয্যা। অনতিকালের মধ্যে সূর্য অস্তাচলে গেল। হিরণ্যবতী নদীর স্বচ্ছ জলে ধবল জ্যোৎস্নার প-াবন। সারিপুত্র নেই, মৌদগল্যায়ন নেই। তখনও আনন্দ রয়েছেন তাঁর পাশে। তাঁকে ডেকে তথাগত বললেন — আনন্দ, শোক কোরো না। সকল মানুষেরই মৃত্যু আছে।

এক্কা এসে থামল বড়ো রাস্তায়। চায়ের তৃষ(া পেয়েছে সবার। বাস এসে পড়লে আবার পড়িমরি করে দৌড়তে হবে। পরের বাসের জন্যে অপে(া করা যাবে না। চায়ের দোকানের দিকে এগোতে তাই ভরসা হচ্ছে না। এমন সময়ে নালন্দা থেকে একটি বাস এসে দাঁড়াল রাজগৃহের দিকে মুখ করে। অনেকেই ছুটে গেল। গাড়ির ভিতর থেকে জোরালো কলরবে আপত্তি ধেয়ে এল — না না এটা যাবে না, এটা প্রাইভেট বাস।

আমরাও এগিয়েছিলাম খানিকটা। একথা শুনে থমকে গেলাম। তা দেখে বাসের একজন ব্যক্তি(সদয় হলেন। আহ্বান জানালেন — আপনারা রাজগীর যাবেন তো, চলে আসুন।

উঠে পড়লাম বাসে। ভদ্রলোক কৈফিয়তের সুরে বললেন — আসলে এটা তো প্রাইভেট বাস, সেজন্যে সকলে আপত্তি করছে। আমরা বিহার সরকারের কর্মচারী। নালন্দা দেখতে এসেছিলাম।

— না না সে তো ঠিকই করেছেন। আমরা প্রথমে বুঝতে পারিনি বলে ছুটে এসেছিলাম।

আমরা চারজন ছাড়া আরো দুজনকে ওনারা গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন। কমলেন্দু হাত কচলাতে কচলাতে বলল — এও তো ছোটখাট একটা কপাল বলতে হবে। দিব্যি লোকাল বাসের ভিড় এড়ানো গেল।

নালন্দা থেকে দু' কিলোমিটার দূরে কুন্দলপুর (কুন্দনপুর) গ্রাম। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে জৈন ধর্মগু(মহাবীরের জন্মস্থান। অন্যমতে তাঁর জন্ম বৈশালীর উপকণ্ঠে। আমাদের সেখানে যাওয়া হচ্ছে না। আমরা মহাবীরের প্রতি তেমন অনুরক্ত(নই। কেন যে আমরা বুদ্ধের প্রতি যতটা অনুরক্ত(, ততটা মহাবীরের প্রতি নই, তা সঠিক জানি না। দুজনেই তো সমকালের মহাপু(ষ। তবে বুদ্ধদেব একসময় দেশেবিদেশে অনেক বেশি প্রচারিত হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মও খৃষ্টান-ইসলামের মতো আন্তর্জাতিক ধর্মের মর্যাদা পেয়েছিল। সে তুলনায় জৈনধর্ম আন্তর্জাতিক মর্যাদা না পেলেও এখনো ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে প্রচলিত। বৌদ্ধধর্মের মতো ভারত থেকে অবলুপ্তপ্রায় নয়।

একটু পরে সিলি এল। বাস থেকে নেমে দুজন ব্যক্তি(চলে গেলেন এদিককার প্রখ্যাত খাঁজা কিনতে। কমলেন্দু তাদের পশ্চাতে লম্ফপ্রদান করল। ফিরে এল এক ঠোঙা খাঁজা হাতে। গরম রসালো খাদ্যবস্তুটির তারিফ করতেই হয়। মৌজ করে কামড় বসিয়ে খাচ্ছি বাসের পিছনের সারিতে বসে। বাসের মধ্যে বিহার রাজ্যের রাজকর্মচারীরাও নিজেদের মধ্যে তাদের কিনে আনা খাঁজা বিতরণ করছেন। একটু পরে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। হাতে খাঁজার ঠোঙা। কাছে এসে বললেন — এ কি আপনারা কিনতে গেলেন কেন? আর কিনবেন তো সকলের জন্যেই না হয় কিনতেন।

ভীষণ সত্যি কথা। খুব লজ্জায় পড়ে গেলাম। মাথা নিচু করে বসে রইলাম অপরাধীর মতো। কী যে বলা যায় তখন, তার ভাষা জুটল না। শেষ পর্যন্ত উনিই পরিস্থিতি সামলে দিলেন। বললেন — যাকগে যা হওয়ার তাতো হয়েই গিয়েছে। এগুলো ধ(ন এবার। শিগগির ধ(ন। একবার খেয়েছেন তো কি হয়েছে, আরেকবার খেলে দোষ হবে না।

রাজগীর রেলস্টেশনের কাছে এসে বাসটা ডাইনে বাঁক নিল। আমরা ওনাদের প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে পড়লাম।

ঘরের কথা বেমালুম ভুলে ছিলাম এত(ণ। মনে পড়ল আবার আমাদের এক পুরোনো সমস্যার মুখোমুখী হতে হবে। সুরমাদি-মাসিমাকে ম্যানেজ করতে হবে। নীতাদি-অদিতি তো নালন্দা যায় নি। গিয়েছে অনাত্মীয় ছেলেদুটো। এ ব্যাপারটা প্রমাণযোগ্য করতে হবে। শলাপরামর্শ করে ঠিক করা হল আসন্ন নাটকে কার কী ভূমিকা পালন হবে। কে কোন কথাটা বলবে সুরমাদি-মাসিমার সামনে। হিসেব করেটরে মহিলাদলটি ধর্মশালায় ফিরে গেল। আমরা দুজন কিছু সময় পরে ঘরে ঢুকব।

কালহরণ করতে বাজারে গেলাম। সকালে শুনেছিলাম, রান্নার স্টোভ গোলমাল করছে। সারানো যায় কিনা তার খোঁজ করা হল। ঘণ্টা খানেকের মতো সময় কাটাতে হবে। এরপর কোথায় যাই! কুণ্ডের পথে পা বাড়ালাম। পথে দেখা হল সেদিনের কলহ-প্রিয় দম্পতির পতিদেবতার সঙ্গে। বললেন — আপনারা নালন্দা গিয়েছিলেন নাকি?

— হ্যাঁ, এই তো সেখান থেকে ফিরছি।

— এদিকে একজন বাঙালি ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কোলকাতার নাম-করা ডাক্ত(ার। চিনলেও চিনতে পারেন। পোস্টাফিস যাচ্ছি তার বাড়িতে টেলিগ্রাম করতে।

— এত রাতে? টেলিগ্রাম হবে?

— যাই খোঁজটা তো নিয়ে আসি। এদিকে আবার এক ঝামেলা মশাই। আমার বউটি তো একা থাকতে পারেন না। ভয়ে। উপায়ই বা কি? কী দুর্দশায় পড়া গেল বলুন তো। আচ্ছা, চলি।

ভদ্রলোক দূরে চলে গেলে আমরা হেসে খুন। সেই বৌদিদিমণির অহেতুক ভয় পাওয়া কতটা রোমাঞ্চকর প্রেমের সা(দিচ্ছে জানি না। কিংবা ভদ্রলোকের এরকম দুরবস্থায় আমাদের কিছু করার ছিল কিনা তাও জানি না। পরে মনে হল ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলে হত — আমাদের কি কিছু করার ছিল?

আটটা বাজল। শীত পড়ছে জমিয়ে। আর কত(ণ ঠাণ্ডার মধ্যে অহেতুক ঘোরা যায়? বললাম — চল, এবার ঘরে ফেরা যাক। আর ভাল্লাগছে না।

ধর্মশালা ফিরে গেলাম। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে পেছন পেছন খানিকটা শীতও ঢুকে পড়ল। সেসব ছাপিয়ে গেল আমাদের সোল্লাস চিৎকার — ওহ্ জানেন, সে কী দা(ণ জায়গা দেখে এলাম দিদি?

চারজোড়া বিস্মিত চোখ আমাদের দিকে ফিরল।

নীতাদি বললেন — তোমরা নালন্দা গিয়েছিলে নাকি?

— এই তো ফিরছি। কী অপূর্ব জিনিস দেখলাম, স্রেফ ভাবা যায় না। আপনাদের একবার দেখে যাওয়া উচিৎ। এমন সুযোগ নষ্ট করা চলে না। রাজগীর এসে নালন্দা দেখবেন না তা কী হয়? বলুন?

— ও বাবা, এই রকম অবস্থা? আগে বল কি কি দেখলে?

এমনিতে কমলেন্দু বেশ ভালো খোলোয়াড়। খেলাধুলোয় ঝোঁক ছিল চিরকালই একটু বেশি। ধর্মশালায় সেদিন নালন্দার গল্প বলার খেলায়ও বন্ধুবরটি ভালোই লড়ে গেল। ওর কথা শুনে একবার মনে হচ্ছে যেন অজন্তার চিত্রকলা নিয়ে কথা বলছে, আবার কখনো মনে হচ্ছে হোয়সাল মন্দিরের গল্প নিয়ে পড়েছে। হিউয়েন সাঙ যখন নালন্দায় এসেছিলেন তখনকার একমাত্র ঝানু রিপোর্টার ছিল তো ও। ভাবখানা সেরকম। আর নীতাদি-অদিতি হাসি গোপন করে ভালোমানুষের মতো মুখ করে শুনে যেতে লাগল।

১১। পাবাপুরী

ধর্মশালার মেঝের উপরে শুয়ে ঠাণ্ডা লাগে নি আমাদের কারো। এটাই বাঁচোয়া। চৌকি না হলেও চলে গেল যাহোক। চা খেতে খেতে সেকথা বলাবলি করছিলাম সকালে বসে।

সকালবেলা আজ আর ঘুরতে যাচ্ছি না। স্নানের জন্যে তাড়াতাড়ি কুণ্ডে গেলাম। কমলেন্দু পরনে ছিল খাটো পাজামা, তার উপর বন্ধু কাজল দাসের কাছ থেকে ধার-করে-আনা জ্যাকেট, মাথায় টুপি আর পায়ে কাপড়ের জুতো। দুজনেরই অতি সাধারণ পোষাক। পাঁচ ছটি মেয়ে কলকল করে পথ চলছিল। একটু পরে খেয়াল হল যে ওরা কমলেন্দুর পোষাক নিয়ে হাসাহাসি করছে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একজন মন্তব্যও করল — দ্যাখ দ্যাখ সাজের কী ঘটা!

কমলেন্দু বলল — চিনতে পারলে? এরা রাণার দিদি সম্প্রদায়।

কুণ্ড থেকে ফিরতে মোটেই দেরী করিনি। অদিতি ইতিমধ্যে ধর্মশালাতেই স্নান সেরে নিয়েছে। নটার মধ্যে আহারের বন্দোবস্ত করে দেওয়ার কৃতিত্ব নীতাদির। একটু পরেই পথে। আজ আমাদের সঙ্গিনী কেবলমাত্র অদিতি। নীতাদি যাচ্ছেন না পাবাপুরী।

বাস ধরে সোজা বিহারশরিফ। কমলেন্দু বলল — ওই দেখুন, সেদিন আপনারা ওখানে বসেছিলেন আর আমরা আলাপ করার জন্যে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছিলাম।

— তা বটে এখন আর লড়তে হচ্ছে না। তাই না? হাসতে হাসতে টিপ্পনি কাটল অদিতি। মেয়েটার সঙ্গে কথায় এঁটে ওঠা শক্ত।

রাঁচি থেকে হাজারিবাগ-বরহি-তিলাইয়া-কোডার্মা হয়ে পথ এসেছে বিহারশরিফ। বরহি থেকে শের শা'র গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলে গিয়েছে লাহোর-পেশোয়ার। বরহি থেকে পশ্চিম দিকে গেলে পড়ছে ঔরঙ্গাবাদ, ডেহরি-সাসারাম, মোগলসরাই। তিলাইয়াতে রয়েছে তিলাইয়া বাঁধ। রাঁচি থেকে বিহারশরিফ আসার সময় তিলাইয়া বাঁধের পাশ দিয়েই আসতে হয়েছিল। রাস্তা থেকে বাঁধ দেখা যায়নি বটে তবে জানা গিয়েছিল যে বাঁধ খুব দূরে নয়। বড়ো জোর মাইল দুয়েক। বরাকর নদীর তীর ঘেঁষেই ছিল বাসচলার পথ। নদীর জল পথের এত কাছ দিয়ে বইছে যেন বাস থেকে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। এই নদীর উজানে তিলাইয়া বাঁধ আর নিচে কল্যাণেশ্বরী-বরাকরের মধ্যিখানে মাইথন বাঁধ। কোডার্মাতে অভ্রখনি আছে।

যে বাসে উঠে বসেছি, সেটা নওয়াদা যাচ্ছে। এদিককার নামজাদা শহর। 'আরণ্যক' উপন্যাস নওয়াদার অরণ্য কেন্দ্র করে না? নওয়াদা থেকে গয়া পর্যন্ত রেলপথ ও সড়কপথ আছে। গয়া থেকে রেলে পরেশনাথ যাওয়া যায়। রাঁচি থেকেও যাওয়া যায় ১১৪ মাইল

পথ ঠেঙিয়ে। হাজারিবাগ-নেমিয়াঘাট হয়ে। ৪৪০০ ফুট উঁচু পরেশনাথ। খুব ইচ্ছে ছিল যাব। চার হাজার ফুট পাহাড়ে চড়ব। হবে না। মানুষের সব ইচ্ছে তো মেটে না।

জৈনগুরু পার্শ্বনাথের সমাধিস্থল পরেশনাথ। আর জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মহাপ্রয়াণের পুণ্যস্থান পাবাপুরী। বিরাহশরিফ থেকে পাবাপুরী বেশি দূরে নয়। সাত মাইলের মতো।

বাস আমাদের নামিয়ে দিল এক জনবিরল এলাকায়। বড়ো রাস্তার উপর গুটিকয়েক দোকানপাট। খানকয়েক এক্কাগাড়ি অপেক্ষা করছে সওয়ারীর জন্য। দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বসতি।

এক্কাচালক ডাক দিল — এক্কামে চলিয়ে না বাবুজি, আরামসে পহুঁছা দেঙ্গে।

দুপাশে সারি সারি বনস্পতি। স্নিগ্ধ ছায়াভরা পথ। আলোছায়ার জাফরি কাটা। কমলেন্দু বলল — কী লাভ? এই তো বেশ ছায়া ছায়া পথে হাঁটা যাচ্ছে। চল হেঁটেই যাই।

শুনে হা হা করে হেসে উঠলাম। কমলেন্দুর পিছনে লাগতে। এমন নির্ভেজাল কথার মধ্যে হাসির কারণ কি হল তা বোঝা অদিতির কর্ম নয়। বলল — ব্যাপার কী বলুন তো? এত হাসি কেন?

— সেটা ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।

— কোন ব্যাপার নেই। স্রেফ বাজে বকছে। কমলেন্দু হাই-মাই করে তেড়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য অদিতির কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য হল না। নিশ্চয়ই কোন মজার ব্যাপার আছে। কোথায় যেন একটু প্রেম প্রেম গন্ধ লেগে রয়েছে। প্রেম জাতীয় ব্যাপার-স্যাপার চেপে রাখাও তো মুস্কিল।

— কি ব্যাপার বলুন না। আহা শুনলে কি দোষ আছে?

— নিতান্তই শুনবেন। একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে? জানেন তো আপনার পার্শ্বসহচরটি প্রবল কীর্তিমান। অনেক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ নাম অর্জন করেছে ইদানিং।

কমলেন্দু আবার তেড়ে এল আমার দিকে। এই-মারে-তো-সেই-মারে করে। অদিতিকে বলল — একদম বিশ্বাস করবেন না ওর কথা। আমি কারো সাতেপাঁচে নেই। ও স্রেফ গুল মারছে। বানিয়ে বানিয়ে যা তা বলছে।

— সেজন্যেই তো শুনে রাখা ভালো। আজেবাজে কথা আগে থেকে জানা থাকলে গোড়াতেই সাবধান হওয়া যাবে। অদিতি বলে।

রহস্য ভঙ্গ না করে সময় নিতে বললাম — আচ্ছা পরে বলবোখন।

— পরে কেন? এখন নয় কেন? সবকথা না শুনলে কথা বলব না। হাসবও না।

যাঃ চলে। এ যে বড়ো মারাত্মক অস্ত্র প্রয়োগ করে বসল। এমন অস্ত্রে ঘায়েল না হয়ে কোন উপায় নেই দেখছি। মরেছি।

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কালের মহামানব ছিলেন জৈনদের চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্দ্ধমান। একই অঞ্চলে একই সময়ে এ দুজন আপন ধর্মপ্রচারে রত ছিলেন। পাবাপুরীতে

রয়েছে সেই মহাবীর স্বামীর মন্দির। বিশাল জলাশয় আর তার মাঝখানে একটি দ্বীপ। সেই দ্বীপের উপর শ্বেতপাথরের দা(ণ সুন্দর মন্দির। মর্মরসেতু পেরিয়ে যেতে হয় দ্বীপ-মন্দিরে। কেন যে আমরা কল্পনা করেছিলাম পাবাপুরী শালবীথি সুরভিত এক প্রান্তর হবে তা কে জানে! তার পরিবর্তে পদ্মদীঘি! সেই বা মন্দ

চিত্র-৩১। জলমন্দিরের সেতু।

কী। মন্দিরটি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের। জলমন্দির নামে সুপরিচিত। শ্রীমহাবীরের নশ্বর দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল এখানে। খৃষ্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে।

মন্দিরের পূজারী একদল দর্শনার্থী বিদায় করে আমাদের প্রতি মনোযোগী হলেন — আইয়ে, মহাবীর স্বামীকো দর্শন কিজিয়ে। শ্রীমৎ মহাবীর স্বামীজিকা এহি স্থান পর নির্বাণ হুয়া থা। ইধার যো গাড্ডা দেখ রহে হ্যায়, ইয়ে ক্যায়সে হুয়া? যব মহাবীর স্বামীকো নির্বাণ হুয়ে থে, তব বহুৎ আদমী রোতে থে, অউর স্বামীজীকো পবিত্র পরশ কা ইয়ে মিট্টি সবলোক লে যাথে থে। ইস লিয়ে ইধার ইয়ে গাড্ডা হো গয়া। অউর দেখিয়ে এহি দরওয়াজা বেনারসকা শেঠ ... ...

চাপা স্বরে কমলেন্দুকে বললাম — ও হে সাবধান! দেখছ তো পূজারী হাই ভোল্টেজে রান করছেন। আমাদের ভাঁড়ে মা ভবানী।

চিত্র-৩২। জলমন্দির।

মন্দিরের চারপাশটা ঘুরে দেখলাম। সমগ্র জলাশয় ভরে আছে পদ্মপাতায়। নি(ত্তাপ শান্ত জল। সবুজে সবুজে ছয়লাপ। প্রথমে সামান্য অপছন্দ হয়েছিল বটে, এখন আর মন্দ লাগছে না। মনে হচ্ছে অকারণে আমাদের বিরাগ জন্মেছিল। চারকোনা চত্বরের কোণে কোণে চারটি কুটির। তার গর্ভে মহাবীর স্বামী, গৌতমস্বামী এবং সুধর্মস্বামীর পদচিহ্(রি(ত রয়েছে। পাথরের উপর। এক একটি গর্ভে এক এক সংখ্যার পদচিহ্(।

জিন থেকে হয়েছে জৈন। জিন মানে জয়ী বা বিজেতা। আমরা ষড়রিপুর কথা জানি — কাম, ক্রো(ধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। এই ষড়রিপু যিনি জয় করেছেন, তিনিই জয়ী বা জিন। জৈনধর্মে প্রধান তীর্থঙ্কর চারজন। তিনজনের নাম জানি — নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর। জৈনভক্ত(রা মনে করেন সবশুদ্ধ চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর ধর্মশি(া দিতে আবির্ভূত হয়েছেন এই ধরাধামে।

২৩-তম তীর্থঙ্কর হলেন পার্শ্বনাথ। খৃষ্টপূর্ব নবম শতকে কাশীতে তাঁর জন্ম। অনেকে বলেন খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। সাড়ে তিন মাস কৃচ্ছসাধনের পরে তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়। একশ' বছর বয়সে পরেশনাথ পাহাড়ে হয় জীবনাবসান। শেষ তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরের জন্ম সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ৫৯৯ সালে। বাহাত্তর বছর বয়সে হয় তাঁর মহানির্বাণ হয়। দীপাবলী উৎসবের দিনে। ভক্ত(রা মহাবীরের নির্বাণ সম্পর্কে বলেন — ঐ দিন আসলে জগত থেকে জ্ঞানের আলোক নির্বাপিত হয়েছিল। পরিবর্তে তারা প্রদীপের আলো জ্বালিয়ে সত্য-জ্ঞানের পরম্পরা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছিল। সেই ঘটনা থেকেই নাকি কার্তিক মাসের অমাবস্যায় দীপাবলীর উৎসব প্রচলিত হয়েছে এদেশে। তাঁর পূর্বনাম ছিল বর্ধমান। বৈশালীর (ত্রিয়কুণ্ড গ্রামের (াত্রবংশীয় সিদ্ধার্থ নামক একজনের পুত্র ছিলেন তিনি। মাতার নাম ত্রিশলা। সামন্ত নৃপতির কন্যা যশোদার সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁর কন্যার নাম প্রিয়দর্শনা বা অনবদ্যা। মতান্তরে তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তিরিশ বছর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তেরো বছর পরে একদিন ঋজুবালক্য নদীতীরে জম্মীয় নামক গ্রামের বাইরে দুদিন উপবাসের পর তাঁর কেবলজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তখন মধ্যম পাবায় এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে এগারোজন ব্রাহ্মণকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। ঐ এগারোজন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রধান শিষ্য বা গুণধর রূপে পরিগণিত হন।

চিত্র-৩৩। জলমন্দির।

পার্শ্বনাথ প্রবর্তন করেন চতুর্ব্রত — জীব হত্যা না করা, মিথ্যা না বলা ও সত্য পথে চলা, চুরি না করা বা অদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা এবং পরিগ্রহ বা বিষয় সম্পত্তির উপর অনাসক্তি(র ব্রত। মহাবীর আরেকটি ব্রত যুক্ত(করেন। জৈন সম্প্রদায়ের কাছে অহিংসাই অন্যতম প্রধান ব্রত।

দেবতার নামে ভক্তি(তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করার মতো কেউ ছিল না আমাদের মধ্যে। অন্তত এই বয়সে! হয়তো ভয় বা দুর্ভাবনায় বা অনিশ্চয়তায় ভক্তি(সম্পন্ন হতে হয় কখনো কখনো। তবে চাপমুক্ত(হয়ে গেলে অমনি পুনর্মূষিকো ভব। মেয়েরা সাধারণত অধিক ভক্তি(সম্পন্না হয়। অদিতিকে অবশ্য দেখে ঠিক তেমন মনে হল না। তবে এসব ব্যাপারে মানুষকে বাইরে থেকে দেখলে সবটা ধরা যায় না।

কম বয়সে অনেকেই খানিকটা ধর্মহীন বা উদার সম্প্রদায়ভুক্ত(হতে সাহসী হয়। সবকিছু তুচ্ছ করার উন্নাসিকতা তখন প্রায় স্বাভাবিক ঘটনা। ধর্মের মধ্যে কুসংস্কারই চোখে পড়ে। সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে অবশ্য ধর্মকে মান্য করতে হয়। তাই বলে চৌত্রিশ

কোটি দেবতা আর তাঁদের হাজার নিয়মকানুন-আব্দার মেনে চলতে মোটেই রাজী নই। বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে ও সব চলে না।

মনে পড়ল বি(বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পীযূস সোমের কথা। অষ্টগ্রহ সম্মেলনে ধরণীর দশা ভয়ানক হবে। মঙ্গলকামনায় যাদবপুর বাজারে দিনরাত কদিন ধরে খুব খোল-করতাল বাজছিল। লাউড স্পিকার প্রবল বিত্র(মে উদারহস্তে হরিনাম বিলি করছে। ক্লাস(মে লেকচার দেওয়া মুস্কিল হচ্ছিল তার দাপটে। উনি দুঃখ করে বলছিলেন — বোঝো, যে দেশে মানুষ কাজকর্ম ফেলে চব্বিশ ঘণ্টা আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে এরকম খোলকরতাল বাজিয়ে গোটাকয়েক শব্দের পিছনে ছুটে সময় বরবাদ করতে পারে সে দেশের আর যাই হোক উন্নতি হতে পারে না।

পাবাপুরী ত্র(মশ ভালো লাগছিল তার সৌন্দর্যগুণে। চমৎকার পরিবেশ। নির্জন শান্ত। গর্ভগৃহের সামনে মর্মর সোপানশ্রেণী জলে নেমে গিয়েছে। জলের নিচে তার শুভ্র মহিমা সবুজাভ। আমরা তিনজনে সেই সোপানে পা ডুবিয়ে বসেছি। ভালো করে দেখলে দেখা যায় শান্ত জলে চিকন তরঙ্গমালা নেচে বেড়াচ্ছে। নিঃশব্দে। দুয়েকটা পতঙ্গ পদ্মপাতায় বসছে। আবার উড়ে যাচ্ছে। আর ঠিক তখনই শান্ত হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠছে। বৃত্ত রচনা করছে। (ুদ্র বৃত্ত বড়ো হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে কোথায়। কত কথাই তো মনে ভেসে ওঠে। কালস্রোতে তারপর এমনি করেই বোধ হয় মিলিয়ে যায়।

কমলেন্দু দুহাত পিছনে করে ভর দিয়ে আধশোয়া। কথা বলছে না। অদিতি নির্নিমেষে জলের দিকে চেয়ে বুঝি ভাবছে — এ কী অলস মায়া! জলের মধ্যে রঙিন মীনকন্যার সঞ্চার দেখছে? নাকি কিছুই দেখছে না শুধু তাকিয়ে রয়েছে। পদ্মপাতার ওপর জলবিন্দু মুক্তো(ার মতো টলমল করছে। দেখছে? নাকি মনের গভীরে আত্মমগ্ন হয়ে আছে? ও কী এক রাজকন্যা- নির্জন রাজপুরীতে বন্দিনী হয়ে আছে? রাজকন্যা হলেই তাকে বন্দিনী হতে হবে কেন? কেন যে দুখিনী হতে হবে? যেন দুখিনী না হলে ঠিক মানায় না। কেননা দুখিনী না হলে রাজপুত্রেরা স্রেফ বেকার হয়ে যায়।

হালকা রোদ। নরম ছোঁয়া। না-তাতানো মিঠে আমেজ। মৃদু বায়ু হিল্লোলে শিউলির ঝরে পড়া সুখ। গভীর নীল আকাশে মেঘের সঞ্চরণ।

অদিতি অনেক(ণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল — একটা গান হোক না?

আমরা সঙ্গীত চর্চা করি না। তবে প্রচেষ্টায় বিরাম নেই। শ্রাব্য অশ্রাব্য যে কোন সুরে লড়াই চালাতে পারি তা সে শ্রোতার কাছে যতই বিষম লাগুক না কেন। অদিতির আহ্বানে সাড়া দিলাম। একটু পরে ও অংশগ্রহণ করল। নদী নেই তবু নদী আপনবেগে পাগলপারা হতে বাধা নেই। মন চিরকাল মেঘের সঙ্গী হয়ে ঘুরে বেড়ায় দিক দিগন্তে। তা বেড়াক মন মনের মত করে। খানকয়েক পপুলার রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজ(ল ... না না ... নজ(ল

গীতি কঠিন ব্যাপার। ওসবে নেই। হেমন্তর আধুনিক ... মেজাজ এলে মানবেন্দ্রর কালোয়াতী, ব্যস দম শেষ।

চিত্র-৩৪। সমোশরণ জৈন মন্দির।

পূজারী অঙ্গনে শরীর মেলে দিয়েছে নিঝুম মধ্যাহ্নে(। অনেক(ণ বসেছিলাম মন্দির চত্বরে। তৃষ(া বোধ হল। সেতু পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এসেছি চায়ের খোঁজে।

ছায়াকে চোখে দেখিনি। ওর গল্প সবটাই শোনা। নামটাও সঠিক কিনা নিশ্চিত নই। কেননা ঘটনার শু(ফাজলামি থেকে। কিশোরী মেয়েটিকে পড়াশুনায় একটু আধটু সাহায্য করত কমলেন্দু। নির্মল পরোপকার বৃত্তিই হয়তো ছিল। আমরা মজা করতে গিয়ে জটিল করেছি। তিলকে তাল করেছি হয়তো।

বলতাম — সোশ্যাল সার্ভিস দিচ্ছ? দাও দিয়ে যাও। অশোক বলত — শি(াদান ভারী পবিত্র কাজ, লোকের কথায় একদম উৎসাহ হারিয়ো না, চালিয়ে যাও। মাঝেমধ্যে ওকে পাকড়াও করতাম — কিছু ঘটনা ঘটল কি না জানতে। ও রেগে যেত — কিছু না, তবু বলতে হবে বানিয়ে বানিয়ে, ওহ্, তোমরা পারোও বটে। সত্যেনদার ক্যান্টিনে এই সব ক্যাচাল চলত জোর কদমে।

রাঁচিতে বসে মনে হল — দালমে কুছ কালা হ্যায়। মুনিঋষিরা বলে গিয়েছিলেন না, যা রটে, তার কিছুটা অন্তত ঘটে। ব্যাপারটা আর হাসিঠাট্টা পর্যায়ে সীমিত নয় যেন। মেয়েটি নাকি দা(ণ বুদ্ধিমতী। (প্রেমে পড়লে অমন সব মেয়েকে বুদ্ধিমতী মনে হয়।) পড়াশুনায় টৌখস, চমক দিতে পারে। চেষ্টা করলেই ক্লাসে প্রথম হতে পারে। (তাহলে তো সব মেয়েদেরই ফার্স্ট হতে হয়।) দুচোখে তার অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতা। বলা বাহুল্য প্রেমিকের মাপকাঠিতে। কথা বললে কথা শোনে। একদিন পড়াতে না গেলে পড়া তৈরী করে না — ইচ্ছে করে ফেলে রাখে। রাগ অভিমান হয় এবং তা ভাঙাতে হয়। বলেছে — চিঠি লিখতে। রাঁচি থেকে চিঠি লেখা হল। বন্ধুর জন্যে কাব্য, শব্দ এবং ছন্দ অনেক যোগান দিলুম। সেই চিঠির উত্তরও এল। এমন কিছু গভীর প্রেমের ব্যাখ্যান ছিল না। কিন্তু রাইকিশোরী চিঠির জবাব দিয়েছে, সেটাই এক বৃহৎ ঘটনা। নয়?

অদিতি সম্মতি জানাল — হ্যাঁ সেটা বড়ো ঘটনাই বটে।

পায়ে পায়ে দূরের দিগম্বর জৈন মন্দিরের কাছে চলে এসেছি। বসনহীন জৈনমূর্তি এখানে। তাড়াতাড়ি কেটে পড়া ভালো। বলা হয়, মহাবীরস্বামী এখানে দেহর(া

করেছিলেন। যেখানে তিনি দেহর(া করেন, সেখানকার মন্দির পরিচিত স্থূলমন্দির নামে। কে যেন বলল একে গাঁওমন্দিরও বলে। আরেকটি মন্দির আছে সমোসরণ মন্দির নামে। দেখা হয়নি আমাদের।

চিত্র-৩৫। জৈন মন্দির।

ইচ্ছে ছিল বিহারশরিফে নেমে চপ-কাটলেট যদি কিছু পাওয়া যায় মজা করে খাওয়া যাবে। অনেকদিন রেস্তোরার মুখ দেখিনি। কফিহাউসে বসে এক পেয়ালা কফি নিয়ে কথার ঝড় তোলা নেই। একজনকে বধ করতে সবাই মিলে তাকে কাপ্তান বানানো নেই। যদি টের পাওয়া গেল আজ অমুকচন্দ্রের পকেট গরম, অমনি সকলে বোঝাতে শু(করবে — তার মতো দানবীর কমই আছে এ জগত পারাবারে। সুতরাং খাওয়া না মাইরি। অমন করছিস কেন বলত? খাওয়ানো যে তোর ছোটবেলার অভ্যেস ভাই। ছাড়তে আছে? তুইই বল। ঝামেলা বাড়াস নি, মরে যাব। নে চল। ঠিক আছে তুই খা, আমরা পাশে বসে দেখব শুধু।

সব মিলিয়ে কুড়ি বাইশ দিন হবে আড্ডা-ছাড়া। কোন হুল্লোড় নেই। খবরের কাগজ নেই, সিনেমা নেই। আছি কী করে এতদিন কে জানে! তবে ভালোই তো কাটছে। (োভ নেই তো কোন।

বিহারশরিফে তেমন রেস্তোরা চোখে পড়ল না। কমলেন্দু বলল — কি করা যায় বলো তো?

— ওই তো হোটেল দেখা যাচ্ছে। ওটাতে জিজ্ঞেস করেছিলে?

— ওখানেই তো জিজ্ঞেস করেছিলাম ভাই কাটলেট মিলেগা। বলল কি জানো? উ কৌন চিজ? বোঝ ঠ্যালা। চপ আর ডিম পাওয়া যাচ্ছে। চলবে?

প্রচণ্ড ি(দে পেয়েছিল। তিনজনে এক পিস করে চপ নিলাম। বস্তুটি গলাধঃকরণের অযোগ্য। চা খেয়ে রাজগৃহের বাস ধরলাম।

বাসে উঠে অদিতি বলল — দেখুন সেদিনের কণ্ডাক্টর লোকটা। যার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল আমদের।

মোটাসোটা একজন লোক। লালচে চোখ। বাসের পিছন দিকে টিকিট কাটছিল। তার দিকে ইশারা করে অদিতি বলল — দেখেছেন কেমন ভয় পেয়েছে।

কমলেন্দু ওকে রাগাবার জন্যে বলল — অসীম (মতা দেখছি তো আপনার। চলে হরলিক্স পান আর এদিকে কেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ। নীতাদি আবার উপাধি দিয়েছেন, কী যেন কী যেন, হাবা দি গ্রেট।

— যান বাজে বকতে হবে না। কই সেদিনের মতো চেঁচামেচি করছে না তো?

— ঠিক ঠিক। সত্যি লোকটি কোন কথা বলছে না। তা থেকে এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই নেওয়া যায় যে লোকটি ভয় পেয়েছে। তাই তো?

— জানি না যান।

ফেরার পথটা অদিতির পিছনে লাগতে লাগতে কেটে গেল।

দুপুরবেলা নীতাদি সুরমাদিরা কুণ্ডের কাছে পাহাড়ে উঠেছিলেন। একটু আগে ফিরে এসে বিশ্রাম করছেন। আর বেরোনোর ইচ্ছে নেই কারো। ঘরে বসে পাবাপুরীর গল্প হল।

রাজগৃহ থেকে আরেক বৌদ্ধতীর্থ বৈশালী যাওয়া যায়। মুজঃফরপুর জেলার বেসার গ্রামে বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বৈশালী বৃজ্জিদের রাজধানী ছিল। আটটি জাতির গণরাজ্য ছিল। তার মধ্যে লিচ্ছবিরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বুদ্ধদেব অনেকবার বৈশালী গিয়েছিলেন। একবার নগরগণিকা আম্রপালির নিমন্ত্রণও গ্রহণ করেছিলেন। তিনি পরিনির্বাণ ঘোষণা করেন বৈশালীতে বসে। কোন কোন মতে মহাবীরের জন্মস্থানও এই বৈশালী।

নীতাদি বললেন — হ্যাঁ বৈশালী যাওয়ার বাস আছে শুনেছি, তবে ওদিককার পথঘাট ভালো নয়। আমি তো যাচ্ছি না, অদিতিও যাবে না।

— কি যাবে নাকি? কমলেন্দুকে প্র(করি।

— গেলে মন্দ হত না।

নীতাদি বলে ওঠেন — রাস্তাঘাট ভালো নয়, তোমরাও যেও না। এমন কিছু নেই দেখার মতো।

আমাদের পূর্বপরিকল্পনা ছিল রাজগৃহ থেকে হাজারিবাগ হয়ে পরেশনাথ যাব। সেখান থেকে রাঁচি ফিরব। রাজগৃহে এসে মনে হল ও পথে পা বাড়ানো খুব সুবিধেজনক হবে না। প্রায় শ'খানেক মাইল বাসজার্নি করতে হবে। মালপত্র কোথায় রেখে পরেশনাথ পাহাড়ে চড়তে হবে কে জানে? মানিকদা বলেছিলেন — স্টেশনে লাগেজ রেখে যাওয়া যায়। স্টেশন থেকে পাহাড় দুতিন মাইল দূরে। আটটার মধ্যে পাহাড়ে ওঠা শু(করতে হবে। তাহলে দিনে দিনে নেমে এসে রাতের ট্রেন ধরে রাঁচি ফেরা সম্ভব হবে।

কমলেন্দুর শরীরটা ঠিক জুতসই যাচ্ছে না। পরেশনাথপর্ব এবারের মতো স্থগিত রাখাই ভালো। তার বদলে বৈশালী যাওয়া যেত কি? নীতাদিদের নি(ৎসাহে আমাদের আগ্রহেও ভাঁটা পড়ল। ধর্মশালায় বসে থাকতে ভালো লাগছে না। বেরিয়ে পড়লাম কুণ্ডের দিকে।

অদিতি বলল — চলুন, আমিও যাব। দিদি, একটু ঘুরে আসছি।

১২। আবার বিপুলাচলে

বাজার ছাড়িয়ে ডানদিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। সুজন সিং-এর ডেরা পেরিয়ে কুণ্ডের দিকে। এক বিরাট বটবৃ(ছিল ডান হাতে। অজাতশত্রু গড়ের প্রাচীর এখনো দেখা যায়। বাঁহাতে অজাতশত্রু স্তুপ।

সামান্য এগিয়ে বার্মিজ টেম্পল। বুদ্ধমন্দির। উঁচু টিলার উপর।

আর কাছেই প্রাচীন জাপানী মন্দির।

ডানহাতে বেনুবন। ও কালান্দক নিবাপ।

চিত্র-৩৬। বর্মী বুদ্ধমন্দির।

চিত্র-৩৭। বর্মী মন্দিরের বুদ্ধমূর্তি

কুণ্ডের কাছে এসে বিপুলাচল পাহাড়ের সিঁড়ি ভেঙে খানিকটা উপরে উঠেছি। চারদিকে অস্পষ্ট অন্ধকার। আকাশ অনেক ন(ত্রে উজ্জ্বল। ঘন তমসা বুকে জড়িয়ে ধূসর পাহাড়গুলো আকাশের দিকে উঁচিয়ে রয়েছে। বাঁকা চাঁদ উঠেছে। নীলাভ স্বপ্ন ছড়িয়ে দিচ্ছে। তিন খণ্ড পাথরে তিনজনে সামান্য দূরত্বে বসেছি। ত্রিভুজ রচনা করে। সামনে নির্বাক নিস্তব্ধ বৈভার। আমাদের মতো চুপচাপ। কুণ্ডের কাছে কিছু মানুষের আনাগোনা। স্নানের জন্য হুল্লোড় নেই।

অনেক শতাব্দী গত হয়েছে। সভ্যতা সমুদ্রের তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ছে সময়ের বালুচরে। বারবার নানা রূপে। এই দেখা গেল উত্তাল উৎফুল্ল — হেসে গড়িয়ে পড়ছে। পর(ণেই মিলিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। কত জীবনকুসুম ফুটে উঠল আর কত ঝরে পড়ল! মানুষের কর্মপ্রচেষ্টারও বিরাম নেই। জীবনে কী চায় তারা? সুখ চায়? মনে হয় সুখ নয়, শান্তি চায় তারা। শান্তি প্রার্থনা করে। অনেক কর্মযজ্ঞ অনেক সাফল্য লাভের পরেও শান্তির প্রার্থনা এখনো করে যেতে হচ্ছে। এবং শান্তি অধরা থেকে যাচ্ছে। অ(ম অশত্ত(হৃদয়ে দেবতার কাছে আকুতি জানিয়ে চলেছে অশান্ত মানুষ।

একদা রাজগৃহবাসিনী সিরিমা রূপনন্দা অর্ধকাশী এরাও প্রার্থনা করেছিল — হে ঈ(র, আমাদের তপ্ত হৃদয়ে শীতল বারি সিঞ্চন করো। সিরিমা, রূপনন্দা, অর্ধকাশী এরা

অসমান্যা রূপবতী ছিল। কলাবিদ্যায় প্রতিষ্ঠা ছিল। হয়তো আরো অনেক মানবিক গুণ এদের ছিল। মানুষের মনোরঞ্জন করতে করতে চাপা পড়ে গিয়েছে। তারাও রাতপোহানো নির্মল বাতাসের মতো মনে প্রার্থনা করেছে — বুভু(জীবন থেকে শান্তি পেতে চেয়েছে। হয়তো ভেবেছে — জীবনের আবির্ভাব কেন? জীবনের উদ্দেশ্য কিছু আছে কি? মানুষ আনন্দ না শান্তি না সুখ কামনা করে মরে? পথ কী? কারো পথ হৃদয়রঞ্জন, কারো স্বার্থচিন্তা। কেউ গ্রহণ করে পরোপকার বৃত্তি, কেউ দেশোদ্ধার। বিচারবুদ্ধি ও (চির তারতম্য ভেদে মানুষ কোন একটি পথ অনুসরণ করে চলে।

চমক ভাঙল অদিতির কথায় — সবাই একেবারে চুপচাপ কেন? একটা গান হোক।

— পরিবেশটি চমৎকার, গানের উপযুক্ত(ই বটে। তবে হোক।

— না মশাই চালাকি নয়। শু(ক(নে কথা না বাড়িয়ে।

— আসলে আমরা যে দরের গায়ক সেটা বাথ(মেই মানায়। এই পাহাড় নির্জনতা আকাশ ন(ত্র দিয়ে গড়া পরিবেশে বেমানান হয়ে যাবে।

— আর দাম চড়িও না। অনেক হয়েছে।

অবশেষে রফা হল। দুজনে একসঙ্গে গাইব।

গানটানের চেষ্টা হল। রাত বাড়ছে। অদিতি সচকিত হল। বলল — চলুন ফেরা যাক।

— আপনারা এগোন। আমি আসছি।

— দেরি কোরো না। ঠাণ্ডা বাড়ছে। কমলেন্দু চলে গেল অদিতির সঙ্গে।

চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হয় বসে থাকি। মনে হয় এখানে আমি বসে ছিলাম অনেককাল ধরে। সময় কী আশ্চর্য নীরবে বইতে পারে! সময় কি সত্যি বয়ে যায় — নদীর মতো? ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যায়, ঘুরে যায়। বয়স বাড়ে। সূর্য চন্দ্র আবর্তিত হয় নিত্যকার ক(পথে। সময়ের প্রবাহ তেমন করে স্পষ্ট দেখা যায় না তো। আমরা অর্থ নির্ণয় করি সময়ের। বয়স বাড়ার অর্থ করি সময় দিয়ে। পাহাড়ে একা বসে রয়েছি। একা। আমার নিরঙ্কুশ আধিপত্য এখন এই পাহাড়ের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত। কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু একা। বাঁধাবন্ধনহীন স্বাধীনতায় বেশ গর্ব অনুভব হচ্ছিল। পর(ণেই একাকীত্বের ভয় চেপে ধরল। আমরা মর্ত্যের কলকোলাহল থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। ফেনিল জনসমুদ্র নেই। গোঁয়ারের মতো ধোঁয়া উড়িয়ে বাস চলছে না। প্রাইভেট গাড়ি ছুটছে না। কৃমির মতো ট্রামের চলাফেরা নেই। দশটা-পাঁচটার ব্যস্ততা নেই। সিনেমা শো ভাঙছে না যে (দ্ধ জনসমুদ্র রাজপথ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। স্কুল নেই, কলেজ নেই, কলেজ পালানো নেই। এত কিছু নেই অথচ যেন শান্তি আর স্বস্তি আছে। ভারী একান্ত রাজত্ব এখন আমার। আমাদের।

জৈন ধর্মশালার দরজায় পৌঁছে দেখি কমলেন্দু হনহন করে চলেছে। বললাম — চললে কোথায়?

— এই তো, তোমার খোঁজে। ঘুমিয়ে পড়লে কি না দেখতে। খেতে যাবে না?

— হ্যাঁ চল। ওকে ডেকে নিয়ে এস। তত(ণ অফিস ঘরে বসছি আমি।

আজ আমরা তিনজনে বাইরে খাব। হোটেলে। সেই প্রথমদিন লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়েছিলাম বলে তার খেসারত দিতে হবে। অদিতিকে খাওয়াতে হবে। অফিসঘরের রেডিওতে হিন্দি গান হচ্ছিল। বোম্বাই ছবির পপুলার গান। সকলে খুব আগ্রহভরে শুনছিল। এরপর এখানে কাওয়ালির আসর বসবে। তার তোড়জোড় চলছে।

চিত্র-৩৮। বুদ্ধমন্দির।

বাজারের পথে পা বাড়ালাম। অদিতিকে বললাম — ওখানে কেবিন নেই কিন্তু। বাইরে বসে খেতে অসুবিধে হবে না তো?

— না কোন অসুবিধে হবে না। আপনারা পারলে আমিও পারব। মোট কথা মাংস খাওয়াতে হবে। অদিতির দাবী।

অশোক হোটেলে বসে হতাশ হতে হল। কমলেন্দু খুব বিব্রত মুখে বলল — ব্যাড লাক আপনার। আজ মাংস নেই।

— ঠিক আছে। পাওনা রইল। এখন যা পাওয়া যাবে, তাই বলে দিন। অদিতি দুরবস্থা থেকে আমাদের উদ্ধার করল।

শীতের রাতে গরম গরম (টি-সবজিও তোফা লাগল। ফেরার পথে ঠিক হল আগামীকাল বুদ্ধগয়া যাওয়া হবে। অদিতি জানাল ওর যাওয়ার খুব ইচ্ছে আর নীতাদিও হয়তো তেমন আপত্তি করবেন না। সমস্যা অন্যত্র। শোনা যাচ্ছে সুরমাদি এবং নি(মাসি গয়ার পুণ্য সঞ্চয়ের ফিকিরে আছেন। যেতে হলে সবাই যাবে। সেকথা শুনে কমলেন্দু বলল — ওরে বাবা, সে তো বেজায় ঝামেলা।

অদিতি ঘরে চলে গেল। আমরা আগামীকালের বাসের খোঁজে বাস আড্ডায় গেলাম। সাতসকালে এখান থেকে গয়ার বাস ছাড়ে। কমলেন্দুর জ্ঞানবুদ্ধি মতো গয়া থেকে বুদ্ধগয়া সাত মাইল দূরে। পায়ে হেঁটে সাত মাইল ম্যানেজ করা যাবে? এমনিতে কঠিন নয় তবে ফেরার বাস কটায় তার উপর নির্ভর করছে। রাতে ফিরতে হবে তো এখানে। বোধগয়া যাওয়া এবং ফেরার জন্য কোন বাস সার্ভিস আছে কিনা জানতে গেলাম এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে। সে বলল — টাঙ্গা হ্যায়, ট্যাক্সি হ্যায়, লেকিন কোই বাস নেহি।

অমনি আরেকজন টপ করে কোথা থেকে উদয় হল। বলল — নেহি নেহি বহুৎ সার্ভিস হ্যায়। রেগুলার বাস চালু হো গয়া।

সেকথা শুনে প্রথমজন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল — ক্যা বকবক করতা। বোধগয়া কা কোই সার্ভিস নেহি। ফালতু বাত সমঝানে লগা।

লেগে গেল দুজনের মধ্যে তর্কযুদ্ধ। আমরা তখন সাইড-লাইনে। দুজনে দুজনকে তাল দিচ্ছি। তর্কের কোন মীমাংসা হল না। শেষ পর্যন্ত কথা হল যে আমরা বোধগয়া থেকে ফিরে এসে এদের জানিয়ে যাব বোধগয়ার বাস সার্ভিস সত্যিই আছে কি না।

ধর্মশালায় খোল করতাল বাজছে। আসর বসেছে গানের। দরজা বন্ধ করে ভিতরে ঢুকতেই নীতাদি বললেন — তোমরা কাল বোধগয়া যাচ্ছ?

— হ্যাঁ। আপনারা যাবেন?

— না ভাই আমাদের হয়ে উঠবে না। ভালো কথা তোমরা ফিরে যাবে পরশু তাই না? যাওয়ার আগে আমাদের একটা ঘর দেখে দিও। বুঝলে?

— ঠিক আছে। আপনারা কদিন থাকবেন আর? অল্প কয়েকদিন হলে ম্যানেজারকে বলে এখানেই ব্যবস্থা হতে পারে। বলে দেখব?

— বেশিদিন নয়। আজ বৃহস্পতিবার। বড়ো জোর সামনের সোম-মঙ্গল পর্যন্ত।

রাতে শুয়ে একের পর এক ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে — বিম্বিসারের প্রাচীর ছুঁয়ে ব্রহ্মকুণ্ডের ছায়াঘন উঁচুনিচু সড়ক, বৈভার পাহাড়, বিপুলাচল, মন্দির, নির্জনতা। ভালো লাগার ভেলায় ভাসতে ভাসতে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন কে জানে! অভাবিত উষ(আশ্রয়ের আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে। এ সব সত্যি? নাকি স্বপ্নবৎ? এখনো স্বপ্ন!

১৩। বোধগয়া

নীতাদি খুব ভোরে উঠে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছেন। অদিতি চাদর মুড়ি দিয়ে বাইরে বের হল। ফিরে এল চায়ের দুধ যোগাড় করে। আমরা যাত্রার জন্যে রেডি হচ্ছি।

অদিতিকে চুপিচুপি বললাম — যাবেন তো চলুন।

— মাসিমাকে নিতে রাজি তো?

— মাথা খারাপ।

— তবে হল না।

গয়া-পাটনা বাস ছুটছে ঘন কুয়াশার মধ্যে। চারদিকটা রহস্যে ঢাকা। এতটা গাঢ় কুয়াশা সহসা দেখা যায় না। জব্বর ঠাণ্ডা লাগছে। হাড়মাংস ভেদ করে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিচ্ছে যেন। দাঁতে দাঁতে খটাখট শব্দ হচ্ছে প্রায়।

ব্রহ্মকুণ্ড, উদয়গিরি, শোনগিরি পার হয়ে দ(ণদিকে বাস ছুটছে। শোনগিরি পেরোতেই শীর্ণ জলধারা চোখে পড়ল। জলস্রোত নেই প্রায়। প্রশস্ত বালুকাবেলা। ভাঙাচোড়া মন্দির। পাহাড় ডিঙিয়ে প্রান্তরে এসে পড়েছি। সামনে আর পাহাড় চোখে পড়ছে না। নীতাদি-অদিতির কথা মনে পড়ছে। ওরা এমন আশ্চর্য রকমের ভালো হল কি করে?

কমলেন্দু শু(করল এক প্রলাপ। নদীর প্রশস্ত চড়া দেখলেই ও চিৎকার করতে আরম্ভ করল — ওই তো ফল্গু।

ী(ণস্রোতা জলধারা মাত্রই ফল্গু না হয়ে যায় না। কোন শিশুকালে ও একবার এসেছিল গয়াতে — সবকিছু ভুলে গিয়েছে, শুধু মাথায় রেখেছে ফল্গু নদীটা। এখন আমাকে জ্বালাচ্ছে। তর্ক জুড়ে দিল — এই দ্যাখো, এটাই সেই ফল্গু।

— ধেৎ লেখা রয়েছে জাফরী আর তুমি চেঁচাচ্ছ ফল্গু ফল্গু বলে। থামো তো, ঢের হয়েছে।

অবশেষে সত্যি সত্যি একসময় ফল্গু এল। সেতু পেরিয়ে গয়া শহরে প্রবেশ করলাম।

সেতুটি ওয়ানওয়ে। পাশে আরকটি ব্রিজ আছে রেলপথের জন্যে। সেতু পেরিয়ে একশ' পঞ্চাশ ডিগ্রি বাঁক নিয়ে বাস টার্মিনাসে এসে দাঁড়াল।

চারদিকে হৈ চৈ চেঁচামেচি। এ কোন কোলাহলমুখর রাজ্যে এসে পড়লাম। হাজার হাজার মানুষের মিছিল চলেছে। সবাই কথা বলছে, সবাই প্রাণপণে চিৎকার করছে। বাস আসছে। বাস যাচ্ছে। অন্তত সাতটা ভাষায় লোকেরা কথা বলছে। রিক্সার ভেঁপুর শব্দ। দুপাশে দোকানে কেনাকাটার তর্কবিতর্ক। মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল বোধগয়া যাওয়ার বাস আছে। একটু পরেই ছাড়বে। ওখান থেকে ফেরার বাস? আছে। সাড়ে বারটার সময় বোধগয়া থেকে গয়া ফেরার বাস

পাওয়া যাবে। আরো খোঁজ করে জানা গেল যে বেলা আড়াইটে নাগাদ গয়া থেকে রাজগীরের বাস মিলবে। মিললেই ভালো।

শহরের গলিঘুঁজি ঘুরে ঘুরে বোধগয়ার গাড়ি এক সময় ফল্গুর তীর ধরে ছুটতে শু(করল। মাইল সাতেক দূরত্ব। নদীর সমান্তরাল পথ। বেশ ছায়া সুশীতল পাকা সড়ক। গাড়ি না পেলে পায়ে হেঁটে চলা মোটেই কষ্টকর হত না। এক্কাতেও যাওয়া যেত। এই নদীটি নাকি অন্তঃস্রোতা। বালুর নিচে জলের গোপন প্রবাহ আছে। অনেকটা মানুষের মনের মতো। এই ফল্গুই কি নৈরঞ্জনা?

মনশ্চ(দেখতে পাচ্ছি এক গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী অবগাহন করে উঠলেন নৈরঞ্জনা নদীর স্নিগ্ধ জলে। শীতল বারিতে সমস্ত ক্লেদ সমস্ত অবসাদ ধুয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর অন্তর শুচিস্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘকাল ধরে কঠিন সাধনা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ব্যর্থতার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। স্নান সমাপন হলে তীরে উঠে দেখেন সামনে শাদ্বলাস্তীর্ণ সুন্দর এক অ(েত্থ ত(। নব কিশলয়ে দখিনা বাতাসে তার পুলক প্রকম্প জেগেছে। পথে দেখা হল এক তৃণ সংগ্রহকারীর সঙ্গে। তাঁর কাছে মুঞ্জতৃণ প্রার্থনা করলেন। ত(মূলে দর্ভাসন রচনা করলেন তৃণ দিয়ে। সাতবার প্রদ(ি ণ করে দর্ভাসনে বসে বাম হাতখানি কোলের উপর রেখে ডান হাতে ভূমি স্পর্শ করলেন। সমাধিস্থ হতে হতে শপথ করলেন —

ইহাসনে শোষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্যবোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।।

এই আসনে বসে যদি শরীর পাত হয়ে যায় তবে যাক। বোধিলাভ না করে আর (ান্তি নেই। আরম্ভ করলেন আবার সাধনা। স্থিরচিত্তে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে ত্র(মশ গভীর থেকে গভীরতর মগ্নতায় সমাধিস্থ হয়েছিলেন। ভাবলোকে বিচরণ করলেন। জীবের মুক্তি(কোথায়? জরা থেকে মুক্তি(কোথায়? মৃত্যুর বিকল্প কোথায়? মানুষের জীবনে এত দুঃখ কেন? এর কোন প্রতিকার হয় না? অটল হয়ে বসে রইলেন উত্তরের জন্যে।

কামনার অধী(েশ্বর ও সত্যধর্মের পরম শত্রু মার। তার আসন টলমল করে উঠল। এ কী হোল। এতদিন যা হয় নি আজ তা হল কি করে? কে তার (মতা ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে? জানলেন — এক নবীন সন্ন্যাসীর কীর্তিকলাপের জন্য এমনটা হচ্ছে।

মার সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ করতে বাহিনী পাঠাল। প্রবল বন্যায় পৃথিবী ভেসে গেল। আকাশ ভেঙে অবিরাম বর্ষণ হচ্ছে। চারিদিকে প্রবল জলোচ্ছ্বাস। তুমুল শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে, ধরায় নেমে আসছে বিদ্যুৎবহি(। অগ্নিরাশিতে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে সবকিছু। কিন্তু অবিচল সন্ন্যাসী। তাঁর বসনপ্রান্ত পর্যন্ত স্পর্শ করা গেল না। এত প্রলয় নেমে এল, এত দুর্যোগে ভেসে গেল ধরাতল, তবু কাষায় বস্ত্র পরিহিত দৃঢ়চিত্ত মানুষটির কোন ভাবান্তর নেই। অটল মূর্তির মতো স্থির। মার ত্রে(াধে দিশাহারা। তার আধিপত্য সম্মান আজ

ধূলায় লুণ্ঠিত। আমন্ত্রণ করল তিন কন্যা রতি, আরতি এবং তৃষ(াকে। সন্ন্যাসীর ধ্যানভগ্ন করতে। বি(্বিমোহিত রূপরাশি কন্যাদের। রয়েছে মোহিনী শক্তি(। পুষ্পশোভিত ধনু এবং মনোহর পঞ্চশর নিয়ে তারা সন্ন্যাসীকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট হল। সফল হল না। সন্ন্যাসীর মুদিত নয়ন অবিচলিত। মার দ্রুত পলায়ন করল। জয় হল সিদ্ধার্থর। সকল দেবতারা শূন্যমার্গে মঙ্গলশঙ্খ বাজাল। তাঁরা মর্ত্যলোকের মানবদেবতাকে অভিনন্দন জানাল।

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত।

নৈরঞ্জনার নির্ঝর তরঙ্গদোলে ছড়িয়ে পড়ছে জ্যোৎস্নার প-াবন। অরণ্য সুরভিত হয়ে উঠছে। দিকদিগন্তে মায়াবী কুহক ছড়িয়ে পড়ছে। স্নিগ্ধ পৃথিবী, শান্ত বৃ(তল। রাতের প্রথম প্রহরে সিদ্ধার্থর দিব্যজ্ঞানের উদয় হল। ধ্যানমগ্ন মুদিত নয়ন। দুঃখসুখের অতীত নির্বিকার সমাধিতে বিভোর। সেখানে কোন কোলাহল নেই।

রাত্রির দ্বিতীয় যামে উদিত হল চ্যুতোৎপত্তি জ্ঞান। জন্মমৃত্যুর রহস্য।

তৃতীয় যামে লাভ করলেন ধ্রুবপদ।

চতুর্থ যামে সমাগত হল প্রতীত্যসমুৎপাদ। গভীর উপলব্ধিতে তাঁর হৃদয় উদ্ভাসিত হল। তিনি জানলেন অবিদ্যা থেকে সংস্কার, সংস্কার থেকে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান থেকে নামরূপ, নামরূপ থেকে ষড়ায়তন, তা থেকে স্পর্শ, স্পর্শ থেকে বেদনা, বেদনা থেকে তৃষ(া, তা থেকে উপাদান, উপাদান থেকে ভব, ভব থেকে জাতি, জাতি থেকে জরা-মরণ-শোক। দুঃখের এই হল দ্বাদশ নিদান। অবিদ্যার ধ্বংসই হল দুঃখনিবৃত্তির উপায়, চিত্তনিবৃত্তির উপায়।

বোধিলাভ করে ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন –

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং, গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং। গহকারক, দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি, সব্বা তে ফাসপকা ভগ্গা গহকূটং বিসঙ্খিতং, বিসঙ্খারাগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা।

আমি দহরূপ গৃহনির্মাতাকে খুঁজতে খুঁজতে বহু জন্মান্তর ধরে সংসারে ঘুরেছি কিন্তু দেখা পাইনি। বারবার সংসারে জন্ম নেওয়া দুঃখ। হে গৃহকারক, এবার তোমাকে দেখেছি। পুনরায় তুমি গৃহনির্মাণ করতে পারবে না। তোমার গৃহনির্মাণের উপকরণ বিনষ্ট হয়েছে। আমার চিত্ত সংস্কারমুক্ত(হয়েছে, তৃষ(ার (য় হয়েছে।

কুলকুল করে নৈরঞ্জনা নদী বহমান। মুক্তি(র নির্মল আনন্দ সাধকের অন্তরে। এক সপ্তাহ একাসনে বসে রইলেন। তারপর আসন ত্যাগ করে উত্থান হল তাঁর। শাক্যমুনি বোধিলাভ করেছেন। সাধনা সফল হয়েছে। জিজ্ঞাসা প্রশমিত হয়েছে। কিন্তু এই সাধনা এই অমৃতবাণী কি শুধু নিজের জন্যে? জগতের শোকার্ত নরনারীর জন্যে তাঁর সাধনা

ছিল। তাঁকে সেই সব মানুষের কাছে যেতে হবে। দুঃখনিবৃত্তির উপায় কি তা তাদের বোঝাতে হবে। মানুষের তাপিত হৃদয় শান্ত করতে হবে নবলব্ধ জ্ঞানের অমৃতসিঞ্চনে।

অপা(তা তেসং অমতস্স দ্বারং – সকলের জন্যে উন্মুক্ত(হোক অমৃতদ্বার।

মুদিতা-মৈত্রী-ক(ণার মহারত্ন বুদ্ধ ভি(ুকের বেশ ধারণ করে পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য যাত্রা করলেন। পৃথিবীকে মুক্তি(র পথ দেখাতে পথে নামলেন তিনি।

উৎকল দেশের বণিক তপসুস্ ও ভল্লিক পণ্যসম্ভার নিয়ে যাত্রা করছিল পথ দিয়ে। সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসীকে দর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়ল। তাঁর স্নিগ্ধ মুখমণ্ডলে ভাবনার জ্যোতি বিরাজ করছে। প্রশান্ত গভীর দুটি নয়ন। মহামুনির চরণে তারা প্রণত হল। সেবা করল তাঁর। বুদ্ধত্বলাভের পরে সেই তাঁর প্রথম আহার্যগ্রহণ। তিনি তাদের মুক্তি(র পথ দেখালেন। তারা হল বুদ্ধের প্রথম দ্বিবাচিক শিষ্য। সেই পুণ্যস্থানে নির্মিত হয়েছে রাজায়তন চৈত্য। বুদ্ধ এখানে সাতদিন ছিলেন। তারপর যাত্রা করলেন সারনাথের উদ্দেশ্যে। তাঁর পঞ্চবর্গীয় শিষ্যরা তখন সারনাথে। তাঁদের জানাতে হবে নতুন ধর্মের কথা। মুক্তি(র কথা।

আমরা সেই বোধিদ্রুমতলে এসে দাঁড়িয়েছি। বর্তমান বৃ(টি নাকি অধস্তন পঞ্চম পু(ষ। ভাবছি এই বৃ(তলে একদা এক ধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল। একজন মহামানব তার সূচনা করে যান। না, তিনি একজন কল্পিত ধর্মপ্রবর্তক নন। সত্যি সত্যি এই ধরাধামে এসেছিলেন। পৃথিবীর জলবাতাসে লালিত হয়েছিলেন। মানুষের মতো তাঁরও একদা প্রয়াণ হয়েছিল। রেখে গিয়েছেন অমর কীর্তিকলাপ। রয়ে গিয়েছে ইতিহাস। সেই পুণ্যস্থানের নাম বোধগয়া।

চিত্র-৩৯। বোধগয়ার মন্দির।

বোধিবৃ(র ঠিক পিছনে অবস্থিত বোধগয়ার প্রখ্যাত বৌদ্ধমন্দির। মহাবোধি মন্দির। কথিত আছে, সম্রাট হবিষ্ক দ্বিতীয় শতাব্দীতে এখানে মন্দির নির্মাণ করেন। বিশাল আয়তনের মন্দির ছিল সেটি। একশ আশি ফুট উচ্চতা ছিল তার। কেউ বলেন এর নির্মাণ হয়েছে ২৮৯ খৃষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট অশোকের দানে। ষষ্ঠ শতকে সংস্কার হয়েছিল তার। আবার ১১০৫ সালে তৎকালীন মন্দির সংস্কার করেন ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধরা। তারপর কবে যে মাটির গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে গেল তা জানা যায় না।

মাটি খুঁড়ে মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ উদ্ধার করা হয়েছে ১৮৮০ সালে। উদ্ধার করেছেন লর্ড কানিংহাম। প্রত্নবিদ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংস্কারকাজে সাহায্য করেছিলেন। আটচল্লিশ মিটার উঁচু বর্তমান এই দ্বিতল মন্দিরটির শিখর পিরামিডের মতো। সংস্কার করে তার বর্তমান রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

রাস্তা থেকে সিঁড়ি ভেঙে নেমে যেতে হয় মহাবোধি মন্দিরের বহিরাঙ্গনে। দুপাশে অনেক স্তূপ। অনেক স্তম্ভ। মন্দিরের অভ্যন্তরে যোগাসনে উপবিষ্ট উজ্জ্বল বৌদ্ধমূর্তি। ভূমিস্পর্শ মুদ্রায়। একদা তিনি এই স্থানে এই রকম আসনে পূর্বমুখে বসেই সাধনারত ছিলেন। তাঁর পিছনে ছিল বোধিবৃ(। মহাবোধি মন্দির পিরামিড ধর্মী দ্বিতল মন্দির। ইষ্টক-নির্মিত। চার কোনায় চারটি ছোট চূড়া। মধ্যের প্রধান চূড়া সপ্ততল, পঞ্চান্ন মিটার উঁচু। অত্যন্ত শান্ত মনোরম মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ। একজন বৌদ্ধ উপাসক পাঠ করছেন। শুয়ে পড়ে এবং উঠে দাঁড়িয়ে প্রণতি জানাচ্ছে মানবদেবতার মূর্তির কাছে।

দুপাশে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায় যাওয়ার। কোন আচ্ছাদন নেই উপরে। দোতলায় রয়েছে মায়াদেবীর দণ্ডায়মান মূর্তি। মাঝখানে মূল মন্দিরের শৃঙ্গ উঠেছে। চারিদিকে আরো অনেক বুদ্ধমূর্তি। মন্দিরের পূর্বদিকে গ্রানাইট পাথরের প্রাচীন এক তোরণ আছে।

চিত্র-৪০। বোধিবৃ(, বোধগয়া।

বোধিত(আসলে পিপ্পল বৃ(। অশ্বত্থ ত(। মূল বৃ(টি আজ আর নেই। থাকতে পারেও না। বেশ কয়েকবার বৃ(টিকে ছেদন করা হয়েছে। আবার তার চারা রোপণ করা হয়েছে। অশোকের আমল থেকে। প্রথম বৃ(ছেদন হয় সম্রাট অশোকের হাতে যখন তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন নি সেসময়। আবার বৃ(র অঙ্গহানি হয় তাঁর পত্নী তিষ্যরি(তার দ্বারা। ৬০০ খৃষ্টাব্দে বাংলার হিন্দু রাজা শশাঙ্ক নাকি বোধিবৃ(ছেদন করে তাতে অগ্নিসংযোগ পর্যন্ত করেন। পরে মগধরাজ পূর্ণবর্মন ঐ বৃ(থেকে জন্মানো একটি চারাগাছ রোপণ করেন বোধিমূলে। হিউয়েন সাঙ ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ভারতভ্রমণে এসে নবীন বৃ(টি দেখতে পান। তারপর দীর্ঘকাল ধরে আর কোন তথ্য জানা নেই। শেষ খবরে প্রকাশ ১৮৭০ সালে ঝড়ে বৃ(টি ভেঙে পড়েছিল। এভাবে কতবার যে বোধিবৃ(র পতন হয়েছে আর তার চারা থেকে নতুন বৃ(জন্মেছে তার সঠিক হিসেব নেই। পালি গ্রন্থে উল্লিখিত রয়েছে যে সম্রাট অশোক বোধিবৃ(র একটি শাখা কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে দিয়ে সিংহলরাজ দেবানং প্রিয়তিষ্যের কাছে পাঠান। সেই শাখা অনুরাধাপুরে রোপণ করা হয়।

মহারাজ অশোক বোধিবৃ(র চারদিকে পাথরের প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। অশোক--প্রাচীর নামে তা প্রসিদ্ধ। বেলেপাথরের প্রাচীরের গায়ে বুদ্ধের জীবনেতিহাস খোদিত রয়েছে। জাতকের থেকে নেওয়া কাহিনী। প্রাচীরের অংশবিশেষ পরবর্তী কালের শুঙ্গ বংশের বলে অনুমান করা হয়।

বোধিবৃ(র নিচে লাল বেলেপাথরের বজ্রাসন। এক অখণ্ড প্রস্তরাসন — সাত ফুট দৈর্ঘ্যে এবং প্রায় পাঁচ ফুট প্রস্থে। কারুকার্যমণ্ডিত। এই আসনে বসে তিনি সম্বোধিলাভ করেন। পাদমূলে আমরা দুটি বড়ো প্রস্তরখণ্ড দেখেছি। দুটি পদচিহ্(আঁকা। ভক্ত(রা মনে করেন চরণদ্বয় ভগবান তথাগতের। পদচিহ্(দুটি আয়তনে বড়ো। সহজ কথায় এমন চরণচিহ্(কোন মানুষের হতে পারে না। ভক্তে(র বিশ্বাসের কাছে অবশ্য সবই সম্ভব। বৌদ্ধভি(কেরা গন্ধপুষ্প ও স্নিগ্ধ বারি দিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করছে সেই পদচিহ্নে(।

উত্তরপূর্ব দিকে উঁচু জমির উপর একটি মন্দির দেখছি। তার নাম অনিমেষলোচন চৈত্যগৃহ। বোধিলাভের পরে তথাগত এই স্থানে বসে আকুলচিত্তে এক সপ্তাহকাল অনিমেষে তাকিয়ে ছিলেন বোধিবৃ(টির দিকে। বোধ হয় ধ্যানমগ্ন অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে মর্ত্যের বাস্তবতায় নেমে আসছিলেন। তাঁর স্মরণে এই মন্দির। ভিতরে সুন্দর মূর্তি আছে।

(মহাবোধি সোসাইটির তথ্যভাণ্ডারে বলা হয়েছে ঐ মন্দিরটি আসলে অনিমেষলোচন চৈত্য নয়। প্রকৃত চৈত্যের অবস্থান হল বোধিগ্রুমের পশ্চিমে। অনেক পরে সেকথা জেনেছিলাম।)

মূল মন্দিরের উত্তর পাশে কমলপদ। ষাট ফুট দীর্ঘ এবং তিন ফুট উঁচু বেদীর উপর বুদ্ধের উনিশটি পদচিহ্(। একে চংত্র(মন চৈত্যও বলে। বুদ্ধ এখানে সাতদিন ধরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পদচারণা করেন। উত্তরের চত্বরে অনেক স্তূপের মধ্যে একটি রত্নাগার বা রত্নগৃহ চৈত্য। বর্তমানে আচ্ছাদনহীন স্মৃতিমন্দির। বুদ্ধদেব এখানেও সাতদিন ধ্যানস্থ হয়ে অভিধর্মের বিষয় চিন্তা করেন। আরো কিছু চৈত্য আছে তাদের সঠিক অবস্থান নির্ণীত নয়। যেমন অজপাল নিগ্রোধ চৈত্য যেখানে তিনি সাতদিন অবস্থান করেন এবং এক ব্রাহ্মণকে ধর্মদেশনা দেন। শ্রেষ্ঠীকন্যা সুজাতা এখানেই হয়তো তাঁকে পায়সান্ন নিবেদন করেন।

মুচলিন্দ চৈত্যেও তিনি সাতদিন অবস্থান করেন। বোধিমন্দির থেকে এক মাইল দ(ণে মুচারিন গ্রামে মুচলিন্দ হ্রদ ছিল বলে মনে করা হয়। এই হ্রদে মুচলিন্দ নামক নাগরাজ ফণা বিস্তার করে তপস্যারত বুদ্ধকে ঝড়জল হতে র(া করেন। রাজায়তন চৈত্যে দুই উৎকল বণিককে শিষ্য বলে গ্রহণ করেন। মন্দিরের দ(ণে নাতিবৃহৎ জলাশয় আছে — বুদ্ধকুণ্ড।

বোধগয়ার আরো অনেক দর্শনীয় জিনিস আছে। যেমন তিব্বতী মন্দির। নির্মাতা লাদাখের লামা খান পাউয়াঙ সোনাম। ভিতরের মূর্তিটি তিব্বতি রীতিতে গড়া। একটি দীপশিখা অনির্বাণ জ্বলছে। অনেক তিব্বতি গুনগুন করে পাঠ করছে। পাঁচশ' মণ ওজনের ধর্মচক্রে(তিব্বতী হরফে লেখা রয়েছে প্রার্থনা। বাম থেকে ডানদিকে ধর্মচক্র(ঘোরালে সেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হয়। গত জন্মের পাপ ধুয়ে যায় তাতে। যায় নাকি?

ধর্মচক্র(বোঁ বোঁ করে কয়েক পাক ঘুরিয়ে কমলেন্দু বলল — ব্যস, পুরোনো সব পাপ মুছে গেল। এখন থেকে ভাই পুরোপুরি সৎ জীবনযাপন করব।

মু(ব্বিয়ানার ভঙ্গীতে বললুম — কতদিন বলেছি মিথ্যে কথা বোলো না, আমার মতো হও। কোনদিন শুনলে না। তবু ভালো এখানে এসে সুমতি হয়েছে ছেলের।

— শালা।

মহাবোধির পশ্চিমে চিনা মন্দির। ১৯৪৫ সালের নির্মাণ। তার দ(িণে পুরাতত্ত্ব বিভাগের ম্যুজিয়াম। কাছেই থাই মন্দির ও বিহার। থাইল্যাণ্ডের মহারাজ নির্মিত ধর্মশালা। দেখা হল সন্ন্যাস-সমাধি — বাবা ভোলানাথ জীবন্ত অবস্থায় ভূগর্ভে চিরতরে শায়িত হয়েছিলেন। রয়েছে আরো দুটি মন্দির — ব্রজশিলা ও মাতা ভাগ্যদেবীর মন্দির সন্ন্যাস মঠের কাছেই। তা ছাড়া আছে প্যাগোডার গড়নে জাপানি মন্দির, ভূটানি মন্দির ও বর্মি মন্দির।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম পতনের পরে এখানে হিন্দুমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। শঙ্করাচার্যের অনুগামীদের দ্বারা। শঙ্করশিষ্য মণ্ডনের তিন শিষ্য ছিল গিরি, পর্বত এবং সাগর সম্প্রদায়ের। তাঁরা যোশীমঠের সঙ্গে যুক্ত(। ১৫৯০ সালে গোসাই ঘমণ্ডি গিরি যখন বোধগয়ায় এসেছিলেন তখন এই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ও প্রায় পরিত্যক্ত(অবস্থায় ছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বিশেষ যাতায়াত করতেন না। তিনি সেই নির্জন স্থান সাধনভজনের উপযুক্ত(বিবেচনা করে মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে চৈতন্য গিরি ১৬১৫ সালে, তারপর মহাদেও গিরি ও লাল গিরি মঠের পরিচালক হন। ১৭২৭ সালে মুঘল সম্রাট মোহম্মদ শাহর এক ফরমান বলে মহন্ত লালগিরি মুস্তিপুর এবং তারাদিহ গ্রামের মালিকানা লাভ করেন। বোধগয়ার মন্দিরের অবস্থান তারাদিহ গ্রামে। সেই সূত্রে বোধগয়ার মন্দির এলাকা মহন্ত সম্প্রদায়ের অধিকারে আসে।

১৮৭৪ সালে বার্মার রাজা বোধিমন্দির সংস্কারের জন্য ইংরেজ শাসকের অনুমতি প্রার্থনা করেন। পরে সরকার নিজেই মন্দিরের প্রয়োজনীয় সংস্কারকার্য পরিচালনা করে। পরবর্তীকালে বোধগয়া মন্দির এলাকার পরিচালনা নিয়ে বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ ও টানাপোড়েন চলতে থাকে। অবশেষে ১৯৫৩ সালে সমগ্র এলাকা বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের যৌথ পরিচালনায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসে।

হাতে অঢেল সময় নেই। সবকিছু খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে এসে রাত না কাটালে কোনদিনই তা সম্ভব হবে না। দ্রুত পায়ে যতটা দেখা সম্ভব হয় দেখে নিয়ে বাসে উঠেছি। অপূর্ণ সাধ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি ভগবান বুদ্ধকে অন্তরের প্রণাম জানিয়ে। কেননা আমাদের ফিরতে হবে রাজগীর।

বাসে করে গয়া ফিরলাম। ভীষণ জটলার গয়া শহরে। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান বিষু(পাদ মন্দির দেখে যাওয়ার সময় হবে? কতটা দূরে মন্দির বুঝতে পারছি না। তথ্যসূত্র বলছে, ইন্দোরের মহারানী অহল্যাবাঈ বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। অথবা প্রাচীন মন্দির সংস্কার করেন। ১৭৮৭ সালে। নাটমন্দির সংস্কার করেন কোলকাতার শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব।

পায়ে পায়ে এগোচ্ছিলাম। একটু পরে পিছনে তাকিয়ে চোখে পড়ল এক কিশোর বালক অনুসরণ করছে আমাদের। ধমক দিয়ে বললাম — এই কি চাই?

— কুছ নেহি।

— তাহলে পিছনে ঘুরছ কেন? যাও ভাগো।

কিন্তু সে ভাগল না। আমরা হাঁটলে সেও হাঁটে, দাঁড়িয়ে পড়লে সেও দাঁড়িয়ে পড়ে। এ তো মহা জ্বালাতনে পড়া গেল। মন্দিরই বা আর কতদূরে? ছেলেটা মন্দিরের পাণ্ডার কেউ, না দুর্বৃত্তদের কেউ, সেটাই বুঝতে পারছি না।

গলিপথ ধরে ফল্গুর বালুচরে নেমে পড়লাম। দাহকার্য হচ্ছে নদীর তীরে। শাস্ত্রমতে পিণ্ডদানপর্ব চলছে। পিণ্ডদানের জন্য গয়াতীর্থ অতি প্রসিদ্ধ। পরলোকে আত্মার শান্তির জন্যে পিণ্ডদান ইহলোকবাসীর পবিত্র কর্তব্য। রামায়ণে এক মুনি এই পিণ্ডদানের বিপ(ে জোরালো সওয়াল করেছিলেন। সেই মুনির নামটা মনে পড়ছে না।

কমলেন্দু বলল — জাবালি।

রামায়ণের ১০৮-তম সর্গে দশরথের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে ভরত রামচন্দ্রের কাছে এলে শোকার্ত রামকে জাবালি বলেছিলেন — লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করে থাকে। এতে কেবল অন্নধ্বংস হয়। কে কবে শুনেছে যে মৃত ব্যক্তি(আহার করতে পারে? যদি একজন ভোজন করলে অন্যের দেহে তা সঞ্চারিত হয় তবে প্রবাসীর উদ্দেশে কাউকে আহার করাও। দেখ, প্রবাসীর তৃপ্তিলাভ হয় কি না?

রামচন্দ্র অবশ্য জাবালির চার্বাকপন্থীয় যুক্তি(স্বীকার করেন নি। তাঁকে বেদবিরোধী, ধর্মভ্রষ্ট, নাস্তিক এবং বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ বলেছেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বেলা অনেক হয়েছে। বাস ছাড়ার জন্য সময় আর বেশি নেই। ফিরে চললাম বিষু(পাদপদ্ম মন্দির দর্শন না করেই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আবার আসব এখানে। তখন নিশ্চয়ই বিষু(দেবের পাদপদ্ম দর্শন করে যাব। আপাতত বিষু(র নবম অবতার বুদ্ধদর্শন করেই ফিরে যাচ্ছি।

স্বর্গভূমিতে দেব আর অসুর সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা সদাসর্বদা লেগেই থাকত। শেষ পর্যন্ত জয় হত দেবতাদের। তবু অসুরদের যুদ্ধ করার খামতি নেই। অসুরগণ আবার দেবতাদের পূজো-আর্চা করে তাঁদেরই আশীর্বাদে বলশালী হয়ে উঠত। ব্যাপারটা ঠিক কি হয় বুঝে উঠতে পারি না। যাই হক, শিব বধ করলেন ত্রিপুরাসুরকে। অথচ ব্রহ্মার বরে পবিত্রতম ত্রিপুরাসুর। তাঁরই পুত্র গয়াসুর। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর গয়াসুর দেবভূমি আত্র(মণ করলেন। দেবতারা তখনকার মতো যুদ্ধে হেরে গেলেন। তারপর স্বয়ং নারায়ণ এলে যুদ্ধে। একশ' বছর ধরে যুদ্ধ চলল। জয়পরাজয়ের মীমাংসা হল না। তখন গয়াসুর শান্তিপ্রস্তাব রাখলেন। প্রস্তাবের শর্ত মতো গয়াসুর পাষাণে রূপান্তরিত হবেন। তবে তিনি একটা ফ্যাকড়া তুলে বসলেন। উনি স্বর্গে যাবেন না, মর্ত্যে থাকবেন। আর তাঁর পাষাণমূর্তির মাথায় নারায়ণের পদযুগল স্থাপন করতে হবে। শুধু তাই নয়, সেই পদচিহ্নে যে মৃতব্যক্তি(র আত্মার জন্য পিণ্ডদান করবে তাঁরও স্বর্গলাভ হবে। এভাবে গয়াসুর নিজের স্বর্গবাস বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর মানুষের স্বর্গবাসের রাস্তা খুলে দিলেন এবং মহাত্মা গয় হয়ে গেলেন। সেই থেকে চালু বিষ্ণু(পাদপদ্মে পিণ্ডদান প্রথা। কালে কালে তেতাল্লিশটি বেদীতে পিণ্ডদানের রীতি প্রচলিত হল। বিষ্ণু(পাদপদ্মে শু(করে অ(য়বট পর্যন্ত। ব্রাহ্মণী বা ব্রহ্মযোনী পাহাড়ের নিচে অ(য়বট রয়েছে। আর এক হাজার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলে শিবমন্দির। রামায়ণের সীতাদেবীর আশীর্বাদে ধন্য এখানকার অ(য়বট। আবার তাঁরই অভিশাপে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী। গয়ার উত্তরে রামশীলা পর্বত। এখানে আছে প্রেতশিলা। অপঘাতে মৃত্যু হলে পিণ্ডদান করতে হয় এখানে।

তেরো মাইল দূরে সূর্যমন্দির আছে। শোণ নদীর তীরে। বত্রিশ মাইল দূরে আছে বরাবর গুহা। বৌদ্ধগুহা। পাহাড় কেটে গুহানির্মাণের যে শিল্পরীতি প্রচলিত হয়েছিল, তার প্রথমদিকের নির্মাণশৈলী এই গুহাগুলি। দুটি গুহার নির্মাতা সম্রাট অশোক। পরবর্তীকালে আরো গুহা নির্মিত হয়েছে। তিন রকমের গুহা রয়েছে। এক ধরণকে বলে নাগার্জুনশৈলীর গুহা। আছে কুটিরশৈলীর গুহা। আর আছে পঞ্চপাণ্ডবের গুহা।

গয়া-পাটনা বাস জমজমাট। ঠেলেঠুলে ভিতরে ঢুকে কোন রকমে একটু জায়গা করা গেল। নয়তো চল্লিশ মাইল পথ ঠায় দাঁড়িয়ে যেতে হত। না, নিচে নেমে হোটেলে খাওয়াদাওয়া করার কোন চান্স নেই। মিষ্টি দিয়ে (ুধানিবৃত্তির কাজটা চালাতে হল।

রাজগৃহে পৌঁছে ধর্মশালার ঘরে ঢুকতে দিয়ে দেখি তালাবন্ধ। কোথায় গেলেন ওনারা? নিশ্চয়ই কুণ্ডের দিকে। আবার হাঁটতে হাঁটতে কুণ্ডের দিকে। নীতাদিদের সঙ্গে দেখা হল কুণ্ডের কাছে। টুকিটাকি জিনিস কিনছেন। দোকানে দোকানে ঘুরতে ঘুরতে গল্প হল বোধগয়ার।

ধর্মশালায় পৌঁছে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম – আরো কটাদিন এখানে দিদিরা থাকবেন। আমরা চলে যাব। ঘর পাওয়া যাবে তো?

– মিলবে।

– এই কটাদিনের ভাড়া দিয়ে দিতে চাই।

ম্যানেজার আরো কয়েকটা দিন থাকতে দিতে রাজী হল বটে কিন্তু ভাড়া নেবে না আগে থেকে। নেবে ঘর ছাড়ার সময়। আসলে আমরা ভেবেছিলাম ঘরভাড়াটা আমরা দিয়ে যাব। তা আর হল না। নীতাদির কাছে কথাটা তোলার সাহসও হল না। থাকা-খাওয়া সবটাই কেমন পরস্মৈপদী হয়ে গেল।

রাজগৃহে এটাই আমাদের শেষ রজনী।

১৪। বাজে ক(ণ সুর

ভোরের কুয়াশার ঘোর কাটেনি। শেষবারের মতো রাজগৃহ দেখা হবে আমাদের। আজ গৃধকূট ছাড়িয়ে যাব নগরের বাইরের সীমানায় উদয়গিরি-শোনগিরির প্রান্তে। অদিতি আমাদের সঙ্গে এসেছে।

মনিয়ার মঠ-বিম্বিসার কারা ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে গিয়েছি। এক জায়গায় পাথরে উৎকীর্ণ আঁকিবুকি দেখা গেল। এ সব নাকি প্রাগৈতিহাসিক যুগের শঙ্খলিপি। প্রায় তিরিশটির মতো লিপির চিহ্(দেখা যাচ্ছে। পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি তার। কেউ কেউ বলে এগুলো ভীম-জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধের সময় হাত-পা-হাঁটুর দাগ। পাথর কেটে রক্ত(মাংসের মানুষের ঘর্ষণের দাগ? পাথরে এমন দাগ হওয়া মোটেই স্বাভাবিক ঘটনা নয়। অবশ্য মানুষ না ভেবে অতিমানব হলে অন্য কথা।

চিত্র-৪১। রথচত্র(।

পাথরের বুকে দেখা গেল রথচত্রে(র দাগ। কিছুদূর পর্যন্ত রথচত্রে(র দাগটা বেশ গভীর। অনেকে বলেন এখানে রয়েছে রণভূমি। অন্যমতে রণভূমি মনিয়ার মঠ থেকে জেতুবনের দিকে পড়ে। মধ্যম পাণ্ডব ভীম ও জরাসন্ধ কয়েকদিন ধরে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন রণভূমিতে।

মগধাধিপতি বৃহদ্রথ কাশীরাজের যমজ কন্যাদুটির পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু অনেক হোম-যাগযজ্ঞ করেও সন্তান লাভ করতে ব্যর্থ হন। একদা কা(ীবান গৌতমের পুত্র চণ্ডকৌশিক ঘুরতে ঘুরতে রাজগৃহ আসেন। রাজা বৃহদ্রথের সেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে বরদানে সম্মত হন। রাজা অপুত্রক হওয়ার জন্যে দুঃখী জেনে তিনি একটি বৃ(চ্যুত আম্রফল রাজার হাতে দিয়ে বলেন — অচিরে পুত্রলাভ হবে।

রাজা আম্রফলটি দুই রানিকে ভ(ণ করতে দিলেন। তাঁরা ফল দুটুকরো করে ভ(ণ করেন। অচিরেই রানিরা গর্ভবতী হলেন। প্রসবকালে দুজনেই দেহার্দ্ধমাত্র কলেবর প্রসব করলেন। ভীত হয়ে তাঁরা ধাত্রীদের বললেন অর্ধকলেবর দুটি পথে পরিত্যাগ করতে। সেখানে জরা নামে এক রা(সী ছিল। সে অর্ধকলেবর দুটি সংযুক্ত(করতেই শিশুর জীবন ফিরে এল। জরা রা(সী রাজাকে তাঁর পুত্র ফিরিয়ে দিল। জরা কর্তৃক সন্ধিত বলে সেই পুত্রের নাম হয় জরাসন্ধ। এসব তথ্য শ্রীকৃষে(র জানা ছিল।

এদিকে রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক হয়েছেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু জরাসন্ধকে নিহত না করতে পারলে কার্যোদ্ধার অসম্ভব। প্রবল পরাত্র(মশালী জরাসন্ধকে সোজাসুজি যুদ্ধে পরাস্ত করা যাবে না। কৃষ(-বলরামের যাদবগণকে পর্যন্ত জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হয়ে মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় চলে যেতে হয়েছে। শুধু তাই নয় মগধ নরেশ জরাসন্ধ ছিয়াশি জন রাজাকে বন্দী করে রেখেছেন। রাজার সংখ্যা একশ' হলেই তাদের বলি দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় জরাসন্ধ-নিধনে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শত্রুকে গোপন রন্ধ্রে আত্র(মণ করতে হবে। শ্রীকৃষে(র এমনটাই পরামর্শ।

স্নাতক বেশ ধারণ করে কৃষ(ভীমার্জুনকে নিয়ে গিরিব্রজ নগরে উপস্থিত হলেন। তারপর জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ হবে। তেরো দিন ধরে সমানে যুদ্ধ হল। তারপর মগধরাজ ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন শ্রীকৃষে(র ইঙ্গিতে ভীমসেন জরাসন্ধের পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গ করলেন এবং দুটি পা ধরে তাঁকে দ্বিধাবিভক্ত(করে ফেললেন। এই রণভূমিতে সেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল। ঘটেছিল নাকি?

উদয়গিরি শোনগিরি পাহাড়েও দেখা গেল রাজগৃহের প্রাচীন প্রাচীর। এদিকে তা উচ্চতায় এগারো বারো ফুট এবং প্রস্থে চৌদ্দ থেকে সতেরো ফুট পর্যন্ত। অন্যত্র হয়তো সাত-আট ফুটের মতো অবশিষ্ট আছে। সবশুদ্ধ পঁচিশ-ত্রিশ মাইল লম্বা প্রাচীর। আসলে এটি রাজধানী র(ার জন্যে নগরের বাইরের প্রাচীর। প্রাক মৌর্যযুগের স্থাপত্যরীতি। গঠন বৈচিত্র্যের জন্য এদের বলা হয় সাইক্লোপিয়ান প্রাচীর। গ্রীক রূপকথায় একচ(বিশিষ্ট সিসিলি দ্বীপের সাইক্লোপ দৈত্যরা এমন দানবীয় কাণ্ডকারখানা করতে স(ম ছিল। দু'মানুষ সমান উঁচু বড়ো বড়ো পাথরের দেয়ালগুলো দেখলে সত্যি মনে হয় মহাদানবদের নির্মাণকীর্তি।

বাণগঙ্গার কাছে নাকি কয়েকটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। আমরা তার হদিশ খুঁজে পেলাম না। চেষ্টাও করিনি। দুটি পাহাড়ের গিরিপথের মধ্যে ছিল নগরের দ(ণ সিংহদ্বার। উত্তর সিংহদ্বার বৈভার-বিপুলাচলের গিরিপথে, পূর্ব সিংহদ্বার উদয়গিরি-শৈলগিরির মধ্যে এবং পশ্চিম সিংহদ্বার বৈভার-শোনগিরির মধ্যে। বহিঃপ্রাচীরে নাকি মোট বত্রিশটি প্রবেশদ্বার ছিল। বর্তমানে ষোলোটির খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে।

উদয়গিরির পাদদেশে বাণগঙ্গা। শোনগিরি পাহাড় থেকে উৎপন্ন প্রস্রবণ। কাহিনী অনুসারে মল্লযুদ্ধের সময় মুমূর্ষু জরাসন্ধ তৃষ(ার্ত হয়ে জলপান করতে চাইলে অর্জ্জুন শ্রীকৃষে(র আদেশে বাণ মেরে পাথর ভেদ করে গঙ্গাকে নিয়ে আসেন। তাই এর নাম বাণগঙ্গা। রণভূমি থেকে জরাসন্ধ এতটা দূরে এসে জলপান করেছেন? হবেও বা। এদিকটায় লতাপাতার জঙ্গল বেশী। নির্দিষ্ট কোন পথ নেই। এমনি পাহাড়ে চড়ার আনন্দে খানিকটা পাহাড়ে চড়া।

কমলেন্দু অদিতিকে বলল — একটা চুক্তি(হওয়া খুব জ(রী।

— যথা?

— অনেক ঝামেলা গেল এ কটা দিন তুমি-আপনি করে। এবার থেকে আপনি বর্জন করা যাক। রাজি?

— হ্যাঁ তাই। আমারও মুস্কিল হচ্ছিল। কিন্তু আরেকজন কিছু বলছে না কেন?

— না না বলছি। আমিও শুধু রাজি নয়, খুব রাজি। জানিয়ে দিলাম।

— নীতাদি একটা দিদিসুলভ সম্মানের ব্যবস্থা করেছিল, তো গেল সব বানচাল হয়ে। আপনিটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না, আর তুমি বললেও বাবুদের মুখ দেখি গম্ভীর। যাক বাবা, এবার বাঁচা গেল। অদিতি বলে উঠল।

বেলা বাড়ছে। আমাদের আজই ফিরে যেতে হবে রাঁচিতে। আগামীকাল কোলকাতার ট্রেন ধরতে হবে।

কমলেন্দুকে বললাম — চল, ফেরা যাক। দিদিরা ভাববেন।

ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে এসে অদিতি বলল — খিদে পায় নি?

— তা আর পায় নি। ভীষণ খিদে পেয়েছে।

— চল, আজ আমি তোমাদের খাওয়াব।

— তাহলে হেভি সেটে দেব কিন্তু।

— সাটো তো দেখি কতটা পার।

ধর্মশালায় পৌঁছে অদিতি ভিতরে চলে গেল।

আমরা দুজনে বিহারশরিফ যাওয়ার বাসের খোঁজে গেলাম। বিহারশরিফ থেকে পাটনা-রাঁচি বাসটা ছাড়ে বেলা তিনটে নাগাদ। আমাদের তিনটের মধ্যে বিহারশরিফ পৌঁছতে পারলেই হয়। খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেল যে এদিকে রাজগৃহ থেকে কোন বাস নেই বিকেলের আগে। এখন উপায়? পায়ে হেঁটে চৌদ্দ মাইল রাস্তা তো যাওয়া যাবে না। এক্কা অবশ্য আছে। কিন্তু তাতে সময় লাগবে অনেক। আর তার ভাড়া যা পড়বে তা দেওয়ার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই। তবে উপায়?

কানে এল — বিহার যানা হ্যায় তো আইয়ে।

একজন ট্যাক্সিচালক সওয়ারি খুঁজছে। দৌড়ে গেলাম তার কাছে।

বললাম — হামলোগোকো বিহার যানা হ্যায়।

— তো বৈঠ যাইয়ে। সামান হ্যায়?

— সে তো হ্যায়।

— লে আইয়ে জলদি।

— আভি লে আতে। আপ জরা ঠহরনা।

কমলেন্দু ছুটল বেডিং আনতে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। সিট বেহাত না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করতে।

একটু পরে অদিতি এল। বলল — আমি দাঁড়াচ্ছি, দুটো খেয়ে এস।

ধর্মশালা পৌঁছে দেখি কমলেন্দু তত(ণে খেয়ে নিয়েছে। কিটব্যগ বেডিং নিয়ে ও দৌড় লাগাল। বলে গেল - আমি যাচ্ছি। জলদি এসো।

নীতাদি আমার কিটব্যাগ গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। বললেন — চট করে দুটো খেয়ে নাও। পথে কোথায় খাওয়া জুটবে না-জুটবে কে জানে!

গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। এমন সময় অদিতি কমলেন্দু দুজনেই ফিরে এল। বলল — ভয় নেই, কিটব্যগ-বেডিং রেখে এসেছি গাড়িতে। কিছু হবে না।

সুরমাদি নি(মাসিকে বললাম — চলি, এ কটাদিন অনেক জ্বালাতন করে গেলাম আপনাদের। দোষত্রুটি হলে মাপ করে দেবেন।

— না না সে কি কথা। আমাদেরও ভালো লেগেছিল তোমাদের। কোলকাতা ফিরে দেখা কোরো। ঠিকানা লিখে নাও। সুরমাদি বাড়ির ঠিকানা দিলেন।

ঠিকানা লিখে নিয়ে বললাম — যাব, নিশ্চয়ই যাব।

পথে নেমে এলাম। নীতাদিকে বললাম — আপনার ঠিকানাটা দিন তো লিখে নিই।

— না বাবা ঠিকানা দেব না। বাড়ি গিয়ে আবার কি জ্বালাতন করবে কে জানে! ঠিকানার দরকার নেই। পথের আলাপ পথেই শেষ করা ভালো। নীতাদি ঠিকানা দিলেন না।

মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ট্যাক্সিতে আটদশজন সওয়ারী চেপেছে। গত দুদিন স্নান করা হয়নি বলে বেজায় গরম লাগছে। গোটাকয়েক গরম জামাকাপড় বইতে হচ্ছে। পথে যদি দরকার হয় তাই।

নীতাদি-অদিতি সঙ্গে এসেছিল গাড়িতে ওঠাতে। নীতাদি বললেন — কি ফেলেঠেলে গেলে মনে করে দেখ।

— মনে হয় ফেলে যাইনি কিছু। সবই নিয়েছি।

মুখে বললাম বটে, মনে মনে বললাম ফেলে গেলেই বা কী। আসলে তো অনেক কিছু ফেলে যাচ্ছি আমরা। নিয়েও যাচ্ছি হয়তো।

গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। দুজনে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম ওদের। ওরাও হাত নাড়ছে। নীতাদি হঠাৎ ছুটে এসে মুখ বাড়িয়ে বললেন — সেভেনটি বাই ওয়ান ... ব্লক নম্বর ...। মনে থাকবে তো? লিখে নাও।

অবাক হওয়া বাকি ছিল এই ছেলেমানুষিতে। তাহলে স্রেফ মজা করছিলেন একটু? (োভ সরিয়ে বললাম — লেখার দরকার নেই, মনে থাকবে।

মোটর গাড়ি সামনে এগিয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলাম ওরা তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছে।

বিহারশরিফ পৌঁছে বাস ধরে রাঁচির দিকে যাচ্ছি। চারদিকে অনেক মানুষ। তবু জনমানব নেই। সবাই অজস্র কথা বলছে। আমরা কথা বলছি না। আমাদের তখনো ঘিরে আছে শান্ত নির্জনতা। কথা না বলেও কত কথা যে বলা হয়ে যায়!

বারবার মনে হচ্ছে রাজগৃহের কথা, নীতাদি-অদিতির কথা। ইন্দ্রের স্বর্গপুরী থেকে মর্ত্যের ধূলায় নামতে নামতে।

ইতি রাজগৃহ পর্ব

সারনাথ পর্ব

১।

রাজগৃহ থেকে ফিরে আসার আট মাস পরে কাশী বিশ্বনাথ ও সারনাথ যাওয়া হয়েছিল ঘটনাচক্রে। পরোপকারে সদা ব্যগ্র শ্রীযুক্ত বাবলুদার সঙ্গী হয়েছি সেবার। কাশীর থেকেও সারনাথের লোভ ছিল বেশী। বড়ো নিঃসঙ্গ ভ্রমণ ছিল — একাকীত্বে ভরা। আবার ঠিক একাও নয়। ছিল, কে যেন সঙ্গে ছিল। আবার হারিয়ে যাচ্ছিল।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাস আসছে। দিনের দ্বিতীয় বাস। কোন পথ ধরে যে যাতায়াত করে, ঠিক জানি না। খানিকটা হেঁটে মৌদাগিন মোড় পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বাসে উঠেছি। একটু পরে বসার আসন পেলাম। বাস তত্ত্বে শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে সামনের চওড়া পিচ-মোড়া সড়কপথে গর্জন করতে করতে ছুটছে।

দুপাশে আমগাছের সারি। আষাঢ় মাস। মুকুলের গন্ধ আশা করা বৃথা। মেঘের ঘনঘটা আর বৃষ্টির নূপুর নিক্কণ যদিও বা আশা করা যায় কিন্তু উত্তরপ্রদেশের কঠিন রোদে তার সামান্য সম্ভাবনাও চোখে পড়ছে না। কোলকাতা তখন অল্প বারিপাতেও ভাসছে। ডুবছে কোমর জলে। কোলকাতার চরিত্রমতো। পথের উপর ঘন ছায়া পড়েছে।

এমন বনবীথিকায় গভীর ছায়া দেখলেই অদিতি বলে উঠত — চলো হেঁটে হেঁটে যাই। তা আর বলা হল না। হল না স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে প্রগলভ হয়ে ওঠা। কথার কলতানে মুখরিত হওয়া।

আকাশবাণী পিছনে পড়ে রইল। পথে মাঝেমধ্যে হাতি চলছে। হাতি না বলে ঐরাবত বললে বেশ ভারী শোনায় না? কিংবা গজরাজ? কেমন দুলকি চালে হেলেদুলে চলেছে। কিম্ভূত চেহারার মজাহাজ উট যাচ্ছে। ধীরগতিতে। কোথাও কোন তাড়া নেই। শুধু দুরন্ত গতিতে তখন বাস ছুটছে। বারাণসী থেকে সারনাথ মাত্র দশ মাইল পথ। এটুকু পথ টাঙ্গা করেও চলা যায়।

— ফিরে গেলেই ভালো হত। অস্ফুটস্বরে অদিতি বলল।

— এই তো এলে। এখুনি যাওয়ার কথা বলবে? এ কি রকম আসা হল বলতো!

— বোম্বে মেলে যখন পা রেখেছিলে তখনও বলেছিলাম ফিরে চল। কাজ নেই পালিয়ে বেরিয়ে। বলিনি? অস্বীকার করতে পার?

— না তা পারি না।

— তাহলে?

— বেড়ানোর নেশা। সুযোগ পেলে ছাড়তে পারি না যে।

চওড়া পিচ-মোড়া রাস্তা পার হতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কৌতূহলী দুচার জোড়া চোখ ছুঁয়ে যাচ্ছে ভিনরাজ্যের নবাগতদের। একটু জলযোগ করতে পারলে ভালো হত। কথাটা বলব কি না ভাবছি। ও নীরবে পথ চলছিল। মনে হল এ(নি বলবে — ইচ্ছে হলে তুমি খেতে পার। আমার ইচ্ছে নেই।

এত গম্ভীর ভারিক্কিহয়ে চলার কোন মানে আছে? চলতে ফিরতে কখন যে মেয়েদের ভাবান্তর ঘটবে শুনেছি দেবতারাও জানেন না। ওর (ক্ষ্ম চুল বাতাসে উড়ছে। আমিও নীলনভোচারী। তালে তালে চলতে চলতে, নূপুর ছন্দে সুর মেলাতে বাধ্য যেন। অকৃত্রিম অনুরাগেই প্র্ন করি — কী ভাবছ?

উত্তর দিল না। চোখ তুলে তাকাল। যে চোখে একবার না একবার সকলেই পাখির নীড়ের সাদৃশ্য খুঁজে পায়। জলবিন্দু ছিল না। তবু মনে হল যেন এক ফোঁটা জল চিকচিক করছে।

ম্লান হেসে বলল — কী হবে বল, এখানে ওখানে এরকম কিছু দেখার তৃপ্তি বয়ে বেড়িয়ে? এই মুগ্ধতা ফুরিয়ে যেতে বেশি সময় যে লাগবে না সে তুমিও জানো। রাজগৃহের মধুর তৃপ্তি কি এতদিনে ফিকে হয়ে আসেনি? মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে?

এসেছে। সেই মধুর স্মৃতি যে এতদিনে অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে একথা সত্যি। নীতাদির কাছে ছুটে যেতে যেতে কখন যে একটু একটু করে অদিতির সঙ্গে দূরত্ব কমতে শু(করেছে তা টের পাইনি। বুঝতে পেরেছিল প্রথমে সাধনা। নীতাদির বোন। ক্র(মে অন্যান্যদের নজরে পড়েছিল। তারপর থেকে একটু একটু করে আপত্তি জমা হচ্ছিল। আনাচে কানাচে। দূর ছাই।

২।

বাবলুদার কর্মস্থল কোলকাতা হলেও দেশের বাড়ি কাশীতে। মা-বাবা আর এক ভাই সেখানে থাকে। মাঝেমধ্যে তাকে বাড়ি যেতে হয়। একদিন শুনতে পেলাম বাবলুদা বাড়ি যাবেন। ধরলুম তাকে — আমি যাব আপনার সঙ্গে। নিয়ে যাবেন?

— যাবে? সত্যি যাবে? তাহলে এক কাজ কর। হাওড়া স্টেশনে বড়ো ঘড়ির নিচে দাঁড়িও। এই ঠিক সাড়ে ছটার সময়।

চুপিচুপি কিটব্যাগে টুকিটাকি জিনিসপত্র গুছিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে বাড়িতে একখানা পোস্টকার্ড ছেড়ে দিলুম — আমি কাশী যাচ্ছি। দিনকয়েক পরে ফিরব। চিন্তা করবার দরকার নেই।

দরকার নেই বললেই কেউ চিন্তা করা বর্জন করে না। বড়ো জোর দুশ্চিন্তার মাত্রা খানিকটা কমিয়ে দিতে পারে মাত্র। আসলে রাতে বাড়ি না ফেরা মানে কোথাও কেটে

পড়া — এটা এতদিনে সকলে বুঝে নিয়েছে।

বাবলুদার সঙ্গে ট্রেনে উঠে বসলুম। সত্যি কথাটা বলে রাখি — বিনা টিকিটে। রেলের পাশ আছে এমন রেলকর্মচারীর সঙ্গে একজন করে যাত্রী নাকি ফ্রি। বিনি পয়সায় যেতে পারে তার সঙ্গে। এটা সরকারী নিয়ম কিনা বাবলুদাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এ্যাদ্দিনে বুঝেছি ওটা অলিখিত বেসরকারী মতে। এরকম অনেক বেসরকারী অ-সরকারী আধাসরকারী মতটত আছে এদেশে। বাবলুদা বলেই রেখেছেন — সমস্যা হলে সে সব আমি বুঝব।

ট্রেনে চড়তে আমার ভালো লাগে। দুলকি চাল, ঝমাঝম শব্দ, ধাবিত প্রান্তর — সবই দা(ণ ভালো লাগে। ছোটবেলার স্বপ্ন ছিল — একবার অনেক টাকাপয়সা জোগাড় করে সার্কুলার ট্রেনের টিকিট কেটে চড়ে বসব গাড়িতে। তখন ব্রাডশ'র পিছনের দিকে রেল-নির্ধারিত সার্কুলার (টের বিবরণ ছাপা থাকত। আমি তৃষ(ার্ত চোখে সেসব পড়তাম।

পুণ্যতীর্থ বারাণসী। স্টেশন চত্বরের অনতিদূরে গোধূলিয়ার কাছে বাড়ি কালুদার। পুরাণমতে, খৃষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দে সুহোত্র-নন্দন কাশ্য যে নগরীর পত্তন করেন তার নাম হয় কাশী। পরে কোন এক সময় বরণা নামে কাশীর রাজা বারাণসী দেবীর প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই থেকে কাশী হয়ে গেল বারাণসী।

নামকরণ নিয়ে অন্য মতও আছে। ব(ণা এবং অসী নামক দুটি নদীর সঙ্গমস্থলের মধ্যে অবস্থিত বলে এর নাম হয়েছে বারাণসী। গঙ্গার পারে কাশী নামে আরেকটি স্টেশন আছে। হাওড়া থেকে যাওয়ার পথে মোগলসরাই ছাড়িয়ে গঙ্গা পার হয়ে প্রথমে পড়ে কাশী, তারপরে বারাণসী জংশন। এখান থেকে রেলপথ গিয়েছে ল(ৌ, এলাহাবাদ, গোরখপুর ও প্রতাপগড়।

কাশী বিখ্যাত হয়েছে বি্বনাথ মন্দিরের জন্যে। কালোপাথরের মূর্তিতে বি্বনাথ শিবের অধিষ্ঠান এখানে। শিব কল্যাণদাতা। অহিভূষণ শিব, চন্দ্রভূষণ শিব, কৃত্তিবাস শিব — শিবের রূপভেদ কত! হিন্দুধর্মের তিন প্রধান দেবতা — ব্রহ্মা, বিষু(ও মহে্বর। আবার বলা হয় যে ত্রয়ী দেবতা একই শক্তি(র প্রকাশ। মহে্বর শিব বোধহয় প্রাচীনতম। অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে তাঁর সা(াত মেলে। হরপ্পা সভ্যতার শীলমোহরে অঙ্কিত যোগী্বর মূর্তি সম্ভবত শিবেরই মূর্তি। যোগীবর শিব কাশীতে লিঙ্গমূর্তিতে পূজিত হচ্ছেন। কিন্তু লিঙ্গমূর্তিতে কেন, সেটা জানা নেই। ভক্ত(রা পাথরের লিঙ্গমস্তকে ঘি দুধ নিবেদন করেন। ফুল বেলপাতা ধূপ আর প্যাঁড়া দিয়ে পূজো দেন।

বাবলুদার ভাই মণিদা আমার গাইড। তার নির্দেশমতো পূজোটুজো দেওয়া হল। বাবা বি্বনাথের মাথায় ঘি-দুধ ঢালা হল। চারজন সৌম্যকান্তি পাণ্ডাকে দেখলাম যত্নসহকারে পূজনকার্য পরিচালনা করছেন।

কত প্রাচীন এই মন্দির? জানি না। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় বি(েনাথ মন্দিরে তামাটে রঙের একশ' হাত উচ্চতার বিগ্রহ ছিল। হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতকের পর্যটক। মুঘলসম্রাট আকবরের রাজস্ব মন্ত্রী টোডরমল একবার (১৫৮৫ সালে) মন্দিরের সংস্কার করেন। ১৬৬৯ সালে বাদশা ঔরঙ্গজেব মূল মন্দির (মতান্তরে শৈব বি(ে(র মন্দির) ধ্বংস করেন এবং তার উপর আলমগিরি মসজিদ নির্মাণ করেন। নিদর্শন আজো বর্তমান (যদিও ১৯৪৮-এর বন্যায় মসজিদটি বিধ্বস্ত হয়)। ১৭৭৬ সালে ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ হোলকার বর্তমান বি(েনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের মূল শিখর ঘিরে অনেকগুলি ছোট ছোট চূড়া আছে। মূল শিখরের উচ্চতা একান্ন ফুট। ১৮৩৯ সালে তামার পাতের উপর সোনা দিয়ে শিখর-চূড়া মুড়ে দেওয়া হয়। তার জন্যে বাইশ মন সোনা দান করেছেন পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং। বলা হয় বর্তমান বি(েনাথ মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে ছিল আদি বি(েনাথ মন্দির। একবার ধর্মান্তরিত কালাপাহাড়ের আত্র(মণেও (তিগ্রস্ত হয়েছিল নাকি আদি মন্দির। এবং তার উপর গড়া হয় মসজিদ।

মসজিদ-মন্দিরের মাঝে রয়েছে জ্ঞানবাপী কূপ। পুরাণ কথায় বলে, (দ্ররূপী ঈশান ত্রিশূল দিয়ে এই কূপ খনন করেন। কালাপাহাড়ের আত্র(মণ থেকে মন্দিরের বিগ্রহ র(া করতে পুরোহিতগণ এই কুয়োর মধ্যে মূর্তি নি(ে প করেছিলেন। সেই থেকে কুয়োর জল অতি পবিত্র বলে গণ্য করা হতে লাগল। জ্ঞানবাপী কূপের জলপানে মৃত্যুপথযাত্রীর পর্যন্ত জ্ঞান ফিরে পান। সাময়িকভাবে হলেও নাকি পান। ১৮৩০ সালে গোয়ালিয়রের রানী বৈজাবাঈ জ্ঞানবাপীর মন্দির নির্মাণ করেন।

বি(েনাথ-গলিপথে ডানহাতে অন্নপূর্ণা মন্দির। ১৭২৫ সালে পেশোয়া প্রথম বাজীরাও এই মন্দির নির্মাণ করেন। অন্নপূর্ণা মন্দিরের অন্নকূট উৎসব বিখ্যাত।

আরো অনেক মন্দির আছে বারাণসীতে। দ(ি ণে অসিঘাটের কাছে কা(কার্য খচিত আদিশক্তি(দুর্গা মন্দির – বাংলার রানি ভবানী দ্বারা নির্মিত। বলা হয় এটি হাজার বছরের পুরোনো। এখানে বানরের উৎপাত খুব। অদূরে তুলসীমানস মন্দির। সাধককবি তুলসীদাস বাস করতেন এখানে। রামচরিত মানস রচিত হয় এখানে বসে। ১৬২৩ সালে সাধককবির মৃত্যুও হয় এখানে। রাম ও কৃষে(র লীলাদৃশ্য সাজানো রয়েছে মন্দিরে।

এছাড়া রয়েছে গণেশ মন্দির, শুত্রে(ের মন্দির, শনৈশ্চর মন্দির, সঙ্কটমোচন (হনুমান) মন্দির। গোধূলিয়ার সামান্য পশ্চিমে সারনাথের পথে পড়ে ভারতমাতার মন্দির। অন্য কোন দেবী নয়, ভারতের মানচিত্রই দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত মন্দিরে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেছিলেন।

বারাণসী বিখ্যাত গলির গলি তস্য গলির জন্য এবং গলি জুড়ে বৃষবাহন ষাঁড়ের অবাধ বিচরণের জন্য। নি:সন্দেহে গঙ্গার ঘাটের জন্যেও বটে। ঘাটে এসে দাঁড়ালেই অপরাজিত-অপুর কথা মনে পড়ে যায়। ঘাটে বসে হরিহরের কথকতা, সর্বজয়ার স্বপ্ন, অপুর কৈশোর, পিতৃহীন হয়ে কাশীবাস চুকে যাওয়া। কাশীর প্যাঁড়া, রাবড়ি আর মালাই দা(ণ সুস্বাদু। কাশীর পান আর জরির কাজ-করা বেনারসি শাড়িও বিখ্যাত। সঙ্গীত জগতে কাশীর নিজস্ব এক ঘরাণা আছে।

উত্তরদিকে গঙ্গার ওপর লোহার দোতলা সেতুর নাম মদনমোহন মালব্য সেতু। উপর দিয়ে গাড়ি চলছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে, নিচ দিয়ে ঝমঝমিয়ে চলে যায় রেলগাড়ি।

নদীর পারে দেখা যায় ঘাটের পর ঘাটের সারি – সবশুদ্ধ ৩৬৫ খানি ঘাট আছে নাকি! উত্তরে রাজাঘাট থেকে দ(ি ণে অসিঘাট পর্যন্ত। পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃতি সেসবের। প্রধান ঘাট খান পঁয়ত্রিশ মতো হবে। দ(ি ণে রয়েছে হরিশ্চন্দ্র ঘাট আর উত্তরে মণিকর্ণিকা ঘাট। মাঝখানে রানা মহল, দ্বারভাঙা মহল, মুন্সিঘাট, অহল্যা ঘাট, দশা(েমেধ ঘাট ইত্যাদি।

কাহিনী অনুসারে, একবার ব্রহ্মার বরে কাশীর রাজা হলেন দিব্যোদাস (রিপুঞ্জয়)। তাঁরই পরামর্শে দশ অ(েমেধ যজ্ঞ করেন রাজা দিব্যোদাস। (দ্রসরোবরের তীরে। ঘাটের উপর দুটি মন্দির আছে – দ(াশ(েমেধে(ের এবং ব্রজে(ের। এই ঘাটে স্নান করলে দশ অ(েমেধ যজ্ঞের সমান ফললাভ হয়। রাজাদের সে ফল কাজে লাগতে পারে আমাদের মতো আমজনতার তা কি কোন কাজে লাগে? কে জানে!

মণিকর্ণিকা ঘাটের কাছে সতীর কুণ্ডল পড়েছিল বলে এই স্থান একান্ন পীঠের এক পীঠ হিসেবে গণ্য। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে অম্বরের রাজা মানসিংহ মানমন্দির ঘাট নির্মাণ করেন। রাজপ্রাসাদের চত্বরে ১৭১০ সালে জয়পুরের রাজা তৈরী করেন মানমন্দির।

গঙ্গা সাধারণভাবে পূর্ববাহিনী হলেও এখানে উত্তরবাহিনী। বারাণসী নগরীর দুদিকে দুটি বাঁক নিয়ে এই বিচিত্র প্রবাহধারার সৃষ্টি হয়েছে। কাশীর গঙ্গার মাহাত্ম্য সীমাহীন। কাশীতে গঙ্গাস্নান করলে সর্ব রোগ থেকে মুক্তি(লাভ হয়। সর্বপাপ (য় হয়। গঙ্গাতীরে তিন রাত্রি বাস করলেও স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে। এক গণ্ডূষ জলপান করলে অ(েমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। এমনি করে পুণ্যলাভের বহুবিধ আয়োজন সুর(ি তে পুণ্যতীর্থ কাশীতে। নৌকাবিহারের ব্যবস্থা আছে. শান্ত স্নিগ্ধ জলে। ঘাটের উপর কুস্তির আখড়া আছে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি হয় দশা(েমেধ ঘাটে। ঘাটের উপর বিশাল ছাতা নিয়ে বসে আছেন পণ্ডিত-পুরোহিতের দল।

ওপারে ব্যাসকাশী। মজার কথা শুনলাম। ব্যাসকাশীতে মরণ নেই কেননা সেখানে মরলে পরজন্মে গাধা হয়ে জন্মাতে হয়। অদূরে রামনগর প্রাসাদের আলোকসজ্জা দেখা

যায়। সপ্তদশ শতকে তৈরী কাশীর রাজবাড়ি রামনগরে। অস্ত্রাগার ও প্রাচীন জিনিসের চমৎকার সংগ্রহশালা আছে। এখানে অভিনব একটি ঘড়ি আছে বলেও শুনেছি।

একদিন চলে গেলাম বেনারস হিন্দু বি(বিদ্যালয়ে। দু' হাজার একর জমির উপর গড়ে উঠেছে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর (১৮৬২-১৯৪২) আপ্রাণ চেষ্টায়। শতাধিক বিষয় পড়ানো হয়। প্রযুক্তি(, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র। অনেকটা ভারতীয় ভাবধারায় লালিত পরিবেশ। এখানে বিড়লা-নির্মিত আধুনিক বি(নাথ মন্দিরটি খুবই সুন্দর।

একবার না একবার বেনারসে এসেছেন ভারতের সকল মহামানব – বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, কবির, নানক, তুলসীদাস, চৈতন্য মহাপ্রভু, তৈলঙ্গস্বামী। আর এসেছে অনাথা হিন্দুবিধবার দল। সমাজ ও স্বজন ঘর থেকে যাদের তাড়িয়ে দিয়েছে – তারা দলে দলে ছুটে এসেছে বি(নাথের চরণে ঠাঁই পাবে বলে। আসলে দুবেলা দুমুঠো অন্নের আশায়।

একদিন চুনার দুর্গ দেখতে গিয়েছি মণিদার সঙ্গে। প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে কৈমুর পাহাড়ের উপর নির্মিত দুর্গ। চুনারের প্রাচীন নাম নাকি চরওয়াদিয়া। গঙ্গার তীরে পাহাড়ের টিলা। লাল মোরামের রাস্তা চলে গিয়েছে টিলার উপরকার বেলেপাথরের দুর্গের দিকে। মজবুত প্রশস্ত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা চারদিকটা।

উজ্জয়িনীর রাজা বিত্র(মাদিত্যর অগ্রজ শ্রীরাজ যোগী ভর্তৃহরী ৫৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে জীবন্ত সমাধিস্থ হন এখানে। স্মারকরূপে আরেক বিত্র(মাদিত্য দ্বাদশ শতকে দুর্গ নির্মাণ করেন। আবার বলা হয়, উজ্জয়িনীর রাজা পৃথ্বীরাজ রায় পিথোরা এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। তারপর নিরন্তর এর মালিকানা বদল হয়েছে। মহম্মদ শাহ, সিকান্দার লোদী বাবর। শেরশাহ এখানে বিবাহ করেছিলেন এবং সেই সূত্রেই তার দুর্গলাভ। শোনবা মণ্ডপ ওই বিবাহবাসর হিসেবে চিহ্নি(ত। তারপর হুমায়ুন দুর্গ দখল করেন। তার নামে একটি তোরণ আছে। অনেক হাত ঘুরে অযোধ্যার নবাব এর মালিকানা লাভ করেছিল। সবশেষে ইংরেজ। এখানে দ্রষ্টব্য বন্দীশিবির, ফাঁসির মঞ্চ, পাতাল ঘর, গভীর ইঁদারা যার সঙ্গে একদা গঙ্গার যোগসূত্র ছিল। চুনারের জল উদরের ব্যাধিতে খুব উপকারী।

৩।

চমক ভাঙল অদিতির কথায়। এভাবে পালিয়ে বেড়ানো ওর একবারে পছন্দ হচ্ছিল না। বলল — কেন যে এভাবে তোমরা বেরিয়ে পড়বে ঘুরতে জানিনা। বাড়িতে আড্ডা সিনেমা এসব দিয়েও তো সময় কেটে যায় বেশ। তাহলে বাড়িতে সাতপাঁচ মিথ্যে কথা বলে পালানো কেন? বাড়ির অন্যান্যদের কথা ভাবা উচিৎ ছিল। তারাও তো সংসারের বাঁধা চৌহদ্দির মধ্যে ঘুরপাঁক খাচ্ছে। নিজের বাড়ির মানুষজনের কথাও যদি একবার

ভাবতে বসতে তাহলে বোধ হয় এমন করে আর ...

রোদে ওর মুখ ঘেমে টসটসে। (মালে মুখ মুছল।

এখন ওকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা। আচ্ছা ও ঠিক কী চায়? ও কি বলতে চায় মানুষ যেখানে যেমন করে জন্মেছে সেই অবস্থাকে কেন্দ্র করেই বাঁচার চেষ্টা ক(ক? সেই একই আবর্তে ঘুরে ঘুরে পূর্বপু(ষদের আরেকজন হয়ে উঠুক? তাহলে বিস্তীর্ণ এই জগতকে জানব না? এর ব্যাপ্তিকে চিনব না? বিংশ শতকের মানুষ হয়ে তাই বা কি করে সম্ভব? একদা মানুষ দুটি পায়ে পাহাড় ডিঙিয়েছে। বরফের আত্রে(শ সয়ে পার করেছে ত্রে(শের পর ত্রে(শ। সেদিন ছিল না কোন দ্রুতগামী যানবাহন। শুধু গভীর আকাঙ্খা বুকে করে পাড়ি দিয়েছে পথ। আজ পায়ে হাঁটার পথ কমে গিয়েছে। আকাঙ্খা বাড়বে না? অন্ধকূপে মৃত্যুবরণ কে চায় বলো? এক ঢোঁক মৃত্যুর নীল পানীয় কোন বড়ো ব্যাপার নয়। বড়ো হচ্ছে হাজার মৃত্যুর সূচাগ্র ক্লেশ প্রত্যেক মুহূর্ত জুড়ে। ভাবনাচিন্তা আর সুস্থ সবল থাকে না। পাতাঝরা বৃ(ের মতো নগ্ন হয়ে যায়। তীব্র হাহাকার মথিত করে দেহমন। ঠিক তখন যদি ঈ(্বরের আশীর্বাদের মতো এরকম আহ্বান আসে পথে বেরিয়ে পড়ার তাহলে আর পায় কে! ট্রেনের কামরায় উঠে বসে দেখি মুক্তি(র পথ। সাময়িক হলেও মুক্তি(তো বটে।

– এসব কথা থাক কিছু(ণ। বরঞ্চ সারনাথ দেখি। কোথায় এসেছি আমরা।

বাস থেকে নেমে সামনে এগিয়েছি। বাঁধানো পথটা এক মন্দির অঙ্গনে এসে পৌঁছেছে। দুপাশে তার ফুলের সজ্জা। মখমলের মতো সবুজ ঘাসের আস্তরণ। স্বচ্ছ দিন। অফুরন্ত রোদ। নীল আকাশ ঝলমল করছে সোনালী হাসিতে। প্রফুল্ল ধরণী।

এই স্থানের নাম ইসিপতন। অথবা ঋষিপতন। বোধ হয় ঋষিপত্তন থেকে পরে ইসিপতন হয়েছে। অনেক মুনিঋষি এখানে বসে জপতপ করত বলেই কি এর নাম ছিল ঋষিপত্তন? বৌদ্ধ ললিতবিস্তার অনুসারে, পরিনির্বাপিত পাঁচশত বুদ্ধের তথা ঋষির পূতদেহ এখানে পড়েছিল, তাই এর নাম ঋষিপতন।

এক পাশে মৃগদাব বন। পালি সাহিত্যে মৃগদায় বলেও উল্লিখিত। বোধিসত্ত্ব একবার ন্যগ্রোধ মৃগ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন কথায় মানে জাতক কথায়।

কাশীর মহারাজ ব্রহ্মদত্ত মৃগদাব বনে এসেছিলেন শিকার করতে। রাজারা তো একা থাকেন না। পাত্রমিত্রসহ অনেকে সঙ্গে থাকেন। তারা পরম উৎসাহে অনেক মৃগবধ করে নিয়ে ফিরে গেল। রাজার আবার হরিণের মাংস না হলে ভোজন হয় না। দেশের প্রজারা সমস্ত হরিণদের জড়ো করেছে খোঁয়াড়ে। মৃগশিকারে বনে যাওয়ার দরকার নেই। একটি করে হরিণ মারা হলেই রাজার ভোজন সমস্যা মিটবে। সেখানে ন্যগ্রোধ মৃগ রয়েছে আর রয়েছে শাখামৃগ। রাজা কথা দিয়েছেন এ দুজনের কোন ভয় নেই।

এদিকে খোঁয়াড়ে শিকার করতে গিয়ে একাধিক হরিণ মারা পড়তে লাগল। বনের জন্তুরা সভা করে বলল — মানুষের এ কেমন অত্যাচার। এমনভাবে যথেচ্ছ শিকার করতে থাকলে অরণ্যপ্রাণী লোপ পাবে। একমাত্র উপায় প্রতিদিন স্বেচ্ছায় রাজার রন্ধনশালায় একটি করে জীবনদান। আত্মাহুতি।

মহারাজও তাতে সম্মত হলেন। তারপর থেকে প্রতিদিন একটি করে মৃগ সশরীরে এসে হাজির হত পাকশালায়। একদিন পালা পড়েছে এক পূর্ণগর্ভা হরিণীর। তাকে বাঁচাতে মৃগরাজ ন্যগ্রোধ স্বয়ং এসে উপস্থিত কাশী-মহারাজের দ্বারে। মৃগরাজকে দেখে মহারাজ অবাক হলেন — আপনি কেন?

মৃগরাজ বলল — এক হরিণীর পালা পড়েছিল আত্মবলিদানের। তার গর্ভে লালিত হচ্ছে আরেকটি প্রাণ। তাদের বাঁচাতেই আমার আসা।

সব শুনে মহারাজ মৃগরাজকে মুক্তি(দিলেন। রন্ধনশালায় মৃগহত্যা বন্ধ হল। মৃগবংশ মুক্তি(লাভ করল। এই মৃগরাজের অন্য নাম সারঙ্গনাথ। সেকারণে এই মৃগদাব বনটির অন্য নাম সারঙ্গনাথ বন। ভগবান বুদ্ধও অত্যন্ত মৃগপ্রিয় ছিলেন। তাঁর আরেক নাম সারঙ্গনাথ। সারনাথ তারই অপভ্রংশ।

মন্দিরের ভিতরে যাইনি প্রথমে। ডানদিক ধরে সামনে এগোনো গেল। পাথর বিছোনো পথ। শেষ হয়েছে যেখানে সেখানে রয়েছে এক বুদ্ধমূর্তি। তাঁর সামনে পঞ্চশিষ্য — অস্মীয় তথা অশ্বজিৎ, মহানামা, ভদ্দিয় বা ভদ্রিয়, ওয়াপ্পা তথা বপ্র ও কৌণ্ডিন্য। উপরে অশ্বত্থগাছ। সবুজ ডালপালা মেলে ধরেছে। কাণ্ড আত্মপ্রকাশ করেছে অনেকটা উঁচু অবধি। গোলাকার জায়গাটি সুন্দর করে বাঁধানো। যে বোধিবৃ(র নিচে বসে বুদ্ধদেবের বোধিলাভ, সেই পবিত্র অশ্বত্থবৃ(র অঙ্গজাত এখানকার অশ্বত্থবৃ(মূল। শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুর থেকে চারা এনে লাগানো হয়েছে।

বুদ্ধগয়ায় যে সকল বুদ্ধতীর্থের ছবি দেখেছি তারই একটি মন্দির আমাদের সামনে — সারনাথের মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক নির্মিত বিহার। মন্দিরটি ১৯৩১ সালের নির্মাণ। নির্মাতা হিসেবে সুপরিচিত শ্রীলঙ্কার অনাগরিক ধর্মপাল। দাতা হিসেবে স্মরণীয় সিংহল দেশের এন-মুন-সিং। লালচে বেলেপাথরের মন্দির। গর্ভগৃহের প্রাচীরে বুদ্ধের জীবনকাহিনী চিত্রিত। এঁকেছেন জাপানি চিত্রকর কোসেৎসু নসু। উৎকীর্ণ রয়েছে বুদ্ধবাণী। প্রবেশপথে ঘন্টা রয়েছে। বেদীতে পূজ্য মানবদেবতা — স্বর্ণময় ভাবান বুদ্ধ। ধর্মচক্র(মুদ্রায় উপবিষ্ট। এক আধারে সুর(ত রয়েছে সারনাথে পাওয়া বুদ্ধের ভস্মাবশেষের পেটিকা।

মহাবোধি সোসাইটির মন্দিরের পিছনে সংর(ত কানন। তথাগতের ২৫০০-তম পরিনির্বাণ জয়ন্তী উপল(সরকার দশ একর জমির উপর এই উদ্যান স্থাপন করেন — মৃগদাব। আসলে বনের চিহ্(মাত্র নেই। ছড়ানো ছিটোনো কিছু গাছপালা রয়েছে মাত্র। কয়েকটি হরিণ চড়ে বেড়াচ্ছে। এলেম থাকলে কল্পনার ডানায় উড়ে অতীতের স্মৃতিচারণ

করা যেতে পারে। ঝিরঝির বাতাসের গান শুনতে শুনতে । ঝোপের কাছে শিষ দিয়ে উঠছে যেন। বাঁশঝাড়ের স(স(সবুজ হলুদ পাতা — অনেক ঝরাপাতা। ঘাসবিছানো চত্বর আর পাথর-বসানো পথ। রোদ পড়েছে, ছায়া পড়েছে। কোলাহলে দামামা বাজছে না। অখণ্ড শান্তি ছড়ানো চারিদিকে। প্রকৃতির এই সাজও কত অপরূপ মনে হয়। এর সান্নিধ্যে ছুটে যাই বারবার মানসিক ক্লেদ মুছে ফেলতে। পায়ে পায়ে উচ্ছলতা ছলকে উঠছে। ঘাসের উপর দিয়ে ছুটতে ইচ্ছে করছে। হাসব, লাফাব, কথা বলব চিৎকার করে। অদিতি আর তাল রাখতে পারছে না।

পাশে টাওয়ার। তার উপর উঠেছি। দেখতে পাচ্ছি মৃগদাব বন, মন্দির, স্তূপ, বিহার। প্রশস্ত সবুজ প্রাঙ্গন। অদূরে বিশালাকার ধামেখ স্তূপ। ক্যামেরায় চোখ রেখেছি। সাটার টিপে সামনে তাকাতেই নজরে পড়ল একজন প্রান্তর দিয়ে পায়ে পায়ে হেটে হরিণের জালের কাছে এসে দাঁড়াল। হরিণেরা সেখানে ঘাস খাচ্ছে আর ক(ণ চোখে দেখছে। ঠিক অদিতির মতো।

ওই যে অদূরবর্তী স্তূপ দেখা যাচ্ছে যার নাম ধামেখ স্তূপ, কেউ কেউ বলেন, আসলে তা ধর্মচক্র(স্তূপ। সম্রাট অশোকই হয়তো প্রথম এটি নির্মাণ করেছেন। বোধিলাভের পর গয়া থেকে কাশী হয়ে সারনাথ আগমনের সময় সম্ভবত এখানেই তথাগতর সঙ্গে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের সঙ্গে প্রথম সা(াত হয়। তিনি পঞ্চশিষ্যকে নবীন ধর্মের উপদেশ দান করেন। এই ঘটনা ধর্মচক্র(প্রবর্তন নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। অশোক নির্মিত স্তূপটি তারই স্মারকচিহ্(বলে অনুমান। স্তূপের বর্তমান চেহারা অবশ্য গুপ্তযুগের। মনে হচ্ছে ধর্ম কথাটি থেকে ধামেখ শব্দ এসেছে। পণ্ডিতেরা বলেন ধর্মোপদেশক কথা থেকেও এর উৎপত্তি হতে পারে আবার সংস্কৃত ধর্মে(থেকেও হতে পারে। বর্তমান সভ্য জগতের কাছে এর অস্তিত্ব তুলে ধরেছেন স্যর আলেকজান্ডার কানিংহাম।

চোঙের মতো স্তূপের আকৃতি। গোড়ার ব্যাস তিরানব্বুই ফুট। উপরের দিকে কিছুটা উঠে তারপর কমে গিয়েছে একশ তেতাল্লিশ ফুট উচ্চতায়। নিচের ছত্রিশ ফুট পর্যন্ত পাথরের নির্মাণ। উপরের অংশ ইটের। আধাআধি উঁচুতে চারদিকে আটটি শূন্য গহ্বর দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওগুলো একদা বুদ্ধমূর্তি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। তার নিচে প্রাচীরে শোভা পাচ্ছে বিবিধ অলঙ্করণ। কা(কার্যে ফুল লতাপাতা পাখি মানুষের মূর্তি আছে। ইতিহাস বলছে এসব গুপ্তযুগের। স্তূপের ভিতরটা মাটি আর ইট দিয়ে ভরাট করা। ধরনটা মৌর্যযুগের। মহারাজ অশোক হয়তো প্রথমে এখানে কিছু নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তার উপর আরো নির্মাণকার্য হয় এবং বারবার স্তূপের সংস্করণ ঘটে।

১৮৩৬ সালে কানিংহামের খননকার্যের সময় এক প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায় যার উপর 'যে ধর্মাহেতু প্রভবা ... ' এই কথা খোদিত রয়েছে। শিলালিপি পাওয়া গিয়েছিল ধামেখ স্তূপের অভ্যন্তরে। এখানে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে নির্মিত ধর্মচক্র(মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি

পাওয়া গিয়েছে। সেসব থেকে বুদ্ধের ধর্মচক্র(প্রবর্তনের সূচনা হয় এই পবিত্র স্থান থেকে, এমনটি মনে করা সম্ভব হয়েছে।

ধামেখ স্তূপের অনেকটা পশ্চিমে রয়েছে ধর্মরাজিক স্তূপ। এটিও নির্মাণ করেন সম্রাট অশোক। তথাগতের পূতাস্থির উপর। বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পরে পূতাস্থি আট ভাগে বিভক্ত(করে আট জায়গায় স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল। সম্রাট অশোক সেই পূতাস্থি উদ্ধার করে ভারতবর্ষের আরো অনেক জায়গায় ছড়িয়ে দেন এবং তাঁর উপর স্তূপ নির্মাণ করেন। ধর্মরাজিকা স্তূপ সেভাবে নির্মিত স্মৃতি-স্তূপ।

দুর্ভাগ্যক্র(মে ১৭৯৪ সালে কাশীর রাজা চৈত সিংএর দেওয়ান বাবু জগৎ সিং ধর্মরাজিক স্তূপ থেকে ইট-সুড়কির ভগ্নরাশি খনন করে নিয়ে যান তার ভবন নির্মাণের জন্য। স্তূপের মধ্যে তিনি পাথরের আধারে সুর(িত এক পেটিকা পেয়েছিলেন। ঐ পেটিকায় বুদ্ধের পূত দেহাবশেষ সংর(িত ছিল। তিনি সেই দেহাবশেষ গঙ্গায় বিসর্জন দেন। বর্তমানে স্তূপের চিহ্(মাত্র অবশিষ্ট আছে।

বুদ্ধদেব সারনাথে এসে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণের কাছে প্রথম ধর্মোপদেশ দান করেন। তারপর কাছাকাছি কোন স্থানে বসবাস করতে থাকেন। সেই পুণ্য বাসস্থানে এক মন্দির স্থাপিত হয়। মূলগন্ধকুঠি নামে তা ভগবান বুদ্ধের সারনাথ অবস্থানকালীন বাসস্থান হিসেবে চিহ্(িত হয়েছে। সেই মুখ্যমন্দির ছিল তাঁর প্রতিদিনের ধ্যান ও সাধনার জায়গাও।

ধর্মরাজিক স্তূপের উত্তরে সারনাথের মুখ্যমন্দির। মন্দিরের পীঠ প্রায় ষাট ফুট বাহু বিশিষ্ট বর্গাকার (ত্রের উপর। পূর্বাভিমুখী। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, তিনি এখানে দুশ' ফুট উঁচু মন্দির দেখেছিলেন। ভগ্ন দেয়ালের গভীরতা খানিকটা তার সা(্য দিচ্ছে। প্রধানত ইট-চুনের তৈরী, তবে পাথরও ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে এখানে আরো প্রাচীন নির্মাণের খোঁজ পাওয়া যায়। অনুমান সেসব খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে শুঙ্গবংশের।

মুখ্যমন্দিরের পূর্বদিকে প্রবেশদ্বার ছিল। তার সামনে এক মুখ্যমণ্ডপও নির্মিত হয়েছিল। সেখান থেকে মন্দিরের সম্মুখস্থ অঙ্গন পূর্বদিকে প্রসারিত রয়েছে ধামেখ স্তূপের দিকে। এখানে অনেক স্তূপ ও চৈত্য রয়েছে। ভি(ুদের জন্য নির্মিত প্রকোষ্ঠও। গুপ্তযুগেও মুখ্যমন্দির মূলগন্ধকুটি নামে বিখ্যাত ছিল। এখানে যে প্রস্তর-নির্মিত দীপস্তম্ভ পাওয়া গিয়েছে, তাতে সেকথার উল্লেখ আছে। কাছাকাছি ভি(ুদের বাসস্থান ছিল যা মূলগন্ধ মহাবিহার নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কুমারদেবীর শিলালিপিতে তার উল্লেখ আছে।

অশোক নির্মিত একাধিক বেদিকা পাওয়া যায় মুখ্যমন্দিরের কাছে দ(ণের চৈত্যে। আট ফুটের মতো চৌকো মসৃণ প্রস্তরখণ্ড এটি। কোন সময়ে ধর্মরাজিকা স্তূপে সংযোজিত ছিল। তার গায়ে দুটি লিপিতে সর্বাস্তবাদী আচার্যদের নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। বোধহয়,

তৃতীয় শতকে আচার্য অশ্বঘোষের কালে প্রাচীন লিপি মুছে থেরবাদী-শাখার সর্বাস্তবাদী আচার্যদের নাম খোদাই করা হয়েছে।

মুখ্যমন্দিরের পশ্চিমে দণ্ডায়মান সুপ্রসিদ্ধ অশোক স্তম্ভ। বর্তমানে ভগ্ন স্তম্ভই রয়েছে রেলিং-ঘেরা জায়গায়। স্তম্ভের মস্তকে নির্মিত সিংহশীর্ষ সংর(িত রয়েছে মিউজিয়ামে। এখানেই হয়তো তথাগত বুদ্ধ ষাটজন শিষ্য নিয়ে ভি(ু সংঘের সূচনা করেছিলেন। সম্রাট অশোক তারই স্মারক রচনা করেন এই স্তম্ভে। একদা স্তম্ভটি পঞ্চাশ ফুট উঁচু ছিল। উপরভাগে ছিল কমলদল আর তার উপর চারদিকে মুখ করা চারটি সিংহ। চতুর্মুখ সিংহের উপর স্থাপিত হয়েছে ধর্মচক্র(। আমরা একে অশোক চক্র(বলেছি এবং শান্তি ও ন্যায়ের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছি। বর্তমানে মাত্র ফুট সাতেক উচ্চতার স্তম্ভ প্রোথিত রয়েছে।

অশোক-স্তম্ভে খোদিত তিনটি শিলালিপি। প্রথমটিতে ব্রাহ্মীলিপিতে বর্ণিত হয়েছে সম্রাট অশোকের সতর্কতামূলক নির্দেশ — অশোকের অনুশাসন লিপি। বলা হয় — যে ভি(বা ভি(ুণী সংঘের ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করবেন বা নিন্দা করবেন তাঁকে শ্বেতবস্ত্রে সাজিয়ে সংঘ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় লিপি কুষাণযুগের। আচার্য অশ্বঘোষের চল্লিশতম বর্ষে উৎকীর্ণ। তৃতীয় লিপি গুপ্তকালীন। সেই লিপিতে প্রাচীনপন্থী থেরবাদীদের শাখা সম্মিতীয় বৌদ্ধশাখার উল্লেখ রয়েছে।

মুখ্যমন্দিরের পশ্চিম দিকে চঙ্কম (চংক্র(ম) নামাঙ্কিত স্থানে বুদ্ধ পদচারণা করতেন। সেই স্থানটিও বর্তমানে চিহ্(িত করা হয়েছে। এক জায়গায় মথুরার ত্রিপিটকাচার্য ভি(বলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশাল বোধিসত্ত্ব মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। প্রথম শতকে সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে এই মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। এর ছত্রযষ্টির উপর কুষানযুগের লিপিতে বলা হয়েছে যে বুদ্ধপ্রতিমাটি চংক্র(মে প্রতিষ্ঠিত হল।

পঞ্চশিষ্য বলে উঠল — আয়ুষ্মান গৌতম।

বুদ্ধদেব বললেন — শোন, তোমরা তথাগতকে সুহৃদ সম্বোধন কোরো না। আমি বুদ্ধত্ব লাভ করেছি। তোমরা আমার উপদেশ গ্রহণ করো।

— কঠোর সংযম আর সাধনার পথ ত্যাগ করে আপনি কি করে সিদ্ধিলাভ করলেন?

— হে ভি(ু গণ, আমি মধ্যপন্থার সন্ধান পেয়েছি। আত্মনিগ্রহে মুক্তি(নেই। কৃচ্ছ্রসাধনে শরীর পতন ঘটে মাত্র।

এরপর তথাগত বুদ্ধ সেই পঞ্চশিষ্যকে তাঁর উপলব্ধির আলোক দান করলেন। এসব কথা বর্ণিত হয়েছে 'মজ্‌ঝিম্‌নিকায়' গ্রন্থে। বুদ্ধদেব আর্যসত্যের গূঢ় ধর্ম বি(-যণে রত হলেন। বললেন — চত্বারি অরিয় সচ্চানি, চার আর্য সত্য। দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিরোধ আছে এবং দুঃখরোধের পন্থা আছে। সংসারে বিষয়ভোগ করে

জীবনযাপন করা যায়, কিংবা প্রবল আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে। তৃতীয় আরেক উপায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। সেপথে চলতে আটটি মার্গ আছে। অরিয়ো অট্ঠাঙ্গিকো মগ্গো।

বয়োবৃদ্ধ কৌণ্ডিন্য বুদ্ধের শরণ নেলেন সবার আগে। একে একে অন্য চারজনও উপসম্পদা প্রার্থনা করলেন। সেই থেকে প্রবর্তিত হল ধর্মচত্র(। পরে স্থাপিত হল সঙঘ। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ অভিন্ন। ধর্মের জীবন্ত বিগ্রহ ভগবান তথাগত আর ধর্মের সংর(ক সংঘ। বুদ্ধদেব বললেন – অকুপ্পা মে চেতো বিমুত্তি অয়ং অন্তিমা জাতি নত্থিদানি পুনব্ ভবোতি। অটল আমার চিত্তবিমুত্তি(, আমার অন্তিম জন্ম এইপ্রকার।

পৃথিবীতে প্রবাহিত হতে শু(করল এক উজ্জ্বল আলোক মহিমা। বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে।

আশৈশব যৌবনমদরসে বিলাস-ব্যসনে লালিত হয়েছে কাশীর এক ধনকুবেরের পুত্র – যশ। তারও প্রাণে কিসের আবেগ মথিত হচ্ছে! নর্তকীর বিলোল কটা(নয়? তাদের নূপুরনিক্কণ নয়? ক্লান্ত শরীরে পড়ে রয়েছে তারা আনন্দসভার আনাচে কানাচে। তাদের সকলের বিস্রস্ত বসন আর অবিন্যস্ত কেশপাশ। ফেনায়িত মদস্রাব এখনো ছড়িয়ে চারিদিকে। নিস্তব্ধ রাত। অর্ধচেতন সঙ্গীসাথীরা।

বাইরে বেরোল যশ। এগিয়ে চলল ইসিপতনের দিকে। সেখানে এক মহাতাপস মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে দিচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছে বুদ্ধের ত্রিশরণ মন্ত্র। চলার গতি বর্ধিত হল। অপার আনন্দ মনকে আকুল করল।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

সংঘং শরণং গচ্ছামি।

পঞ্চবর্গীয় শিষ্য, যশ এবং তাঁর চুয়ান্নজন বন্ধু এই মোট ষাটজনকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করে বৌদ্ধসঙেঘর সূচনা হল। বুদ্ধ তাঁদের বললেন – চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অথায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং। মা একেন দ্বে অগমিত্থ। দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদিকল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং পরিয়োসানকল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পক্কাসেথ। হে ভি(ুগণ, তোমরা দিকে দিকে যাও, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, দেবতা ও মনুষ্যের কল্যাণের জন্য। দুজন একপথে য়েও না। তোমরা ধর্মপ্রচার করো যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পর্যবসনে বা অন্তে কল্যাণ। অর্থযুক্ত(, ব্যঞ্জনযুক্ত(ও সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রচার কর।

– কি দেখে এলে ওখানে? অদিতি প্র(করল।

– কিছু একটা। দেখেছি শুনেছি এবং পেয়েছি।

– পেয়েছি? কী আবার পেলে?

ওর ধার করে বলা কথাই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম – কি পেয়েছি তার হিসাব মেলাতে মন মোর নহে রাজী।

– হঠাৎ কাব্যে পেয়ে বসল নাকি!

– জানো তো প্রত্যেকের এক একটা মো(ম সময় আসে যখন মনের মধ্যে কাব্যের হিড়িক পড়ে যায়। হয়তো অনেক কথা তার নিজের নয়। ধার করা। চেনাজানা বা শোনা। তবু সেই কথার মধ্যে তার অন্তরের কথাও থাকে। থাকে না?

আমিও জেনেছি সাগরের উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করে মানুষ বাঁচে। তাকেই বলে জীবন। তবু যদি কখনো সাঁঝের বেলায় সূর্যঠাকুর পশ্চিমদিকে মুখ লুকোয় তখন তার রাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে এক একবার হৃদয় ছলাৎ করে ওঠে। হয়তো রাতের বেলায় চাঁদের আলো নদীর জলে ঝিলমিল করে উঠেছে তখন কি অন্তরের ঝিলিক দিয়ে ওঠা মনোভাব এড়িয়ে থাকা সত্যি সম্ভব? হৃদয়বৃত্তিকে জোর করে মেরে ফেলা যায়? যায় না। বানিজ্যের নিত্তি(তে সেসব মাপজোখ করে চলা যায় না। জগতের সবটা বন্দর নয়। সভ্যতা গড়ে ওঠেনি শুধু বন্দরে। অদিতিও সেসব জানে না, তা নয়। তবু ওকেও লড়ে যেতে হয়।

ধামেখ-ধর্মরাজিকা স্তূপের উত্তর ভাগে দয়স্র চৈত্য, অশোক স্তম্ভ ও মুখ্যমন্দির। আরো উত্তরে রয়েছে দ্বিতীয়, প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ বিহার। চতুর্থ সংঘারামের গঠনশৈলী গুপ্তযুগের। উত্তর এবং পূর্বদিকে কয়েকটি প্রকোষ্ঠ দেখতে পাচ্ছি। মাটি থেকে ভূমিতল অনেকটা নিচে। দ্বাদশ শতাব্দীর একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল সেখানে। শিব অন্ধকাসুর দানবকে বধ করছে।

ধামেখ স্তূপ আর চতুর্থ সংঘারামের মধ্যিখানে আরো অনেক স্তূপ ল(্য করা যাচ্ছে। গুপ্তযুগ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত নানা সময়কার স্বা(র। এখানে কুমারদেবীর এক শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে।

চতুর্থ সংঘারামের পশ্চিমে গুপ্তকালের তৃতীয় সংঘারামের ধ্বংসাবশেষ। দেখা যাচ্ছে ইট বাঁধানো চত্বর ও জল নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা। দ(ণের দিকে তিনটি কামরা ও সংলগ্ন বারান্দা। কুষানযুগের নির্মাণশৈলী নাকি! দশ ফুট পর্যন্ত উঁচু। দেয়ালের বেধ যা তাতে মনে হয় এই ভবন নিঃসন্দেহে দ্বিতল ছিল।

প্রথম বিহারের আরেক নাম ধর্মচত্র(জিন-বিহার। তার পূর্বদিকে তৃতীয় এবং পশ্চিমে দ্বিতীয় বিহার। বলা হয়, প্রথম বিহারে বৌদ্ধসংঘের সূচনা হয়েছিল। মাঝখানে মঠ। পশ্চিমে পাথর বাঁধানো উন্মুক্ত(চত্বর। তিনদিকে সারি সারি ক(। চত্বরের উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে কূপ। মঠের নিচের দিকটা আট ফুট উঁচু। পোড়ামাটির গঠন। কিছু কিছু

কা(শিল্প তখনো শোভা পাচ্ছে। কালের (য়ে সবই যখন ভগ্ন, তখন ঐ সামান্য শিল্পটুকুর বেঁচে থাকার ীণ প্রচেষ্টা বড়োই ক(ণ। প্রথম বিহারের প্রবেশতোরণ দুটি পূর্বদিকে দুশ নব্বুই ফুট ব্যবধানে।

ধর্মচক্র(জিন-বিহার প্রাচীনতর কোন ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মিত। তেমনি প্রাচীন নির্মাণ দ্বিতীয় বিহার, তৃতীয় বিহার এবং চতুর্থ বিহার। পঞ্চম ও সপ্তম বিহার দ(ি সীমানায়। কাশী থেকে সারনাথের পথে পড়ে চৌখণ্ডি স্তূপ। রাস্তার বাঁদিকে।

সারনাথের ধ্বংসাবশেষে মোট সাতটি বিহার, দুটি মহাস্তূপ, দুটি মন্দির এবং একটি স্তম্ভ আছে। পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন সারনাথে দেখেছেন চারটি স্তূপ ও দুটি বিহার। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ দেখেছিলেন অশোক স্তূপ ও অশোক স্তম্ভ। দেখেছিলেন দুশ ফুট উঁচু মন্দির যার মধ্যে ধর্মচক্র(প্রবর্তন মুদ্রায় বুদ্ধের ধাতুমূর্তি। এক সংঘারামে তখন সাম্মিতীয় শাখার প্রায় দেড় হাজার ভি(ছিল।

সারনাথের স্মৃতি সংর(ণ করতে মিউজিয়াম আছে। সেখানে অশোক স্তম্ভের সিংহশীর্ষ আছে। আছে কণিষ্কের আমলের বোধিসত্ত্বমূর্তি, ভি(বল কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত মথুরার লাল পাথরের মূর্তি ও আরো অনেক মূর্তি-স্তম্ভ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

সারনাথকে ধ্বংস করতে সর্বপ্রথমে অগ্রসর হয়েছে গজনীর সুলতান মামুদ। বোধ হয় ১০১৭ খৃষ্টাব্দে।

নয় বছর পরে স্থিরপাল এবং বসন্তপাল নামের দুই ভাই সম্রাট মহীপালের রাজত্বকালে রাজার প্রেরণায় কাশীর দেবালয় সংস্কার করেন সেই সঙ্গে তারা ধর্মরাজিকা স্তূপ এবং ধর্মচক্র(উদ্ধার করেছিলেন।

দ্বাদশ শতকে গোবিন্দচন্দ্রদেব (১১১৪-১১৫৪ খৃষ্টাব্দ) নামে এক রাজা কনৌজ, অযোধ্যা এবং বারাণসীর অধী(ের ছিলেন। গাড়োয়াল বংশের নৃপতি তিনি। তাঁর মহিষী ধর্মপ্রাণা কুমারদেবী। তিনি এখানে যে বিহার নির্মাণ করে যান সেটাই প্রথম বিহার তথা ধর্মচক্র(জিন বিহার। সারনাথের ইতিহাসে এই বিহারই সর্বশেষ সংযোজন। তার পরেই ইতিহাসের এক অধ্যায় নির্বাপিত হল। শু(হল অন্য এক যুগ। ধ্বংস করতে এলেন মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুব-উদ্দিন। ১১৯৪ সালে।

দ্বাদশ শতকের পরে বৌদ্ধধর্ম অনুশীলনের অন্যতম এই কেন্দ্রটি মাটির গর্ভে নিমজ্জিত হল। কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁর কোন খোঁজ রইল না। আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে শ'দুয়েক বছর আগে। সত্তর বছর পরে তার খনন শু(হয়। পঞ্চাশ বছর আগে শু(হয় ভূগর্ভস্থিত ধ্বংসাবশেষের খননকার্য। হয়তো আজও তা অসম্পূর্ণ।

...

আমাকে খোঁজ না তুমি বহুদিন। কতদিন আমিও তোমাকে খুঁজি নাকো।

— যাচ্ছ কোথায়?

— একটা সুড়ঙ্গ দেখতে পাচ্ছ? স(পথ। দুপাশে দেয়াল। মাথার উপর আচ্ছাদন। আসবে?

— না তুমি যাও।

প্রথম বিহারের থেকে সুড়ঙ্গ চলে গিয়েছে পশ্চিমদিকে। কিছুটা পাথর দিয়ে তৈরী কিছুটা ইট দিয়ে। ফুট ছয়েক উঁচু। প্রায় একশ' আশি ফুট লম্বা। শেষ হয়েছে মন্দিরের এক বেদীর কাছে। নিশ্চয়ই সেখানে আগে বুদ্ধের মূর্তি ছিল। এখন শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই। প্রথম বিহারের সমাধিতে আরো তিনটি বিহারের সা(্য মেলে।

জন্মের সান্নিধ্যে জন্মায় মৃত্যু। নির্মাণের সমান্তরাল অবস্থানে ধ্বংস। উপাসক ভক্তি(নিষ্ঠায় ও পুষ্পচন্দনে সৃষ্টির আরাধনা করছেন। অন্তরে একই সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে ধ্বংসের বীজ। সৃষ্টি পূর্ণতার দিকে যাচ্ছে। সংগোপনে (দ্রাকার ধ্বংসবীজ প্রবলতর হচ্ছে। এক সময় অনিবার্য বিস্ফোরণে তা ফেটে পড়ে অথবা নীরব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অর্বাচীনের মতো তবু আমরা প্র(্ন করি, কেন এই ভগ্নদশা? সবকিছু ভাঙবে, লয় পাবে, তা স্বীকার করে নেওয়া সবচেয়ে ভালো। আমরা পারি না তা করতে। বিধাতা বলে যদি কেউ থকেন, তিনি তখন অল(্য হাসেন।

— পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা কি কোনদিন কোন আশ্রয়ে পৌঁছোবো? শান্তির আশ্রয়ে ?

— জানি না, হয়তো পৌঁছে যাব, হয়তো নয়।

— বোধ হয় কোনদিন পৌঁছোবো না। ভয় হয়, পথই অনন্তকাল ধরে পাথেয় হয়ে না থাকে।

— কোনো মানে হয় না এমন ভয়ের। তুমি কি বি(্বাস করতে পারছ না আমাকে?

— না অবি(্বাস করছি না। তবে ভরসাই বা কোথায়!

আসলে আমি বুঝতে পারছিলাম সংসারে এমনটা সহজে হওয়ার নয়। তবু অন্ধ আবেগে এগিয়ে যাচ্ছি অদিতির দিকে। সবকিছু জেনেও তা রোধ করতে ব্যর্থ। এ এক লজ্জা নিজের কাছে।

কথা দিয়েছি — যা পেতে চাইছি, তা না পেলে বিবাগী হব না। কারো কোন (তি করব না। কারণ এভাবে (তি করা যায় না। তাহলে যে সমুদ্রের অতলে ডুব দেওয়াই সার হল। এ কী আলেয়া? হৃদয় জিনিসটার আধিপত্য দুর্বিষহ। বিশেষ করে আমাদের মতো শ্রেণির। একদিকে আমরা আবেগের প্রবল তাড়নায় তাড়িত। অন্যদিকে যুক্তি(কে সমূলে উৎপাটিত করতে পারিনি। আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত নিয়মেই জন্মায়। যুক্তি(তাকে সামলে-সুমলে রাখে।

দিল্লী থেকে ধাবমান এক বাহিনীর হাজার হাজার (ুরের শব্দ। অট্টহাস্যে দিগন্ত

খানখান। পৃথিবীতে সূর্য উঠছে কি ওই রক্ত(াক্ত(তরবারীতে বিদ্যুতের ঝিলিক হানতে? তরবারী আঘাত হানছে। ভাঙছে সবকিছু ভাঙছে। মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাঁদছে কেউ। এ যেমন সত্যি, তেমনি সত্য মহামতী অশোক কর্তৃক নির্মিত স্তম্ভ।

দেখো, এই স্তম্ভটি নির্মাণ করেছিলেন মহামান্য অশোক। তোমরা সকলেই তো তাঁর কথা জানো। একদিন তিনি কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। মৃত্যুর বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। সেই সম্রাট আরেক দিন অস্ত্রত্যাগ করে বসলেন। মানুষের কল্যাণের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন। অবি(াস নয়, হিংসা নয়, দ্বেষ নয়। সুন্দরকে আশ্রয় করতে হবে। সৎ ভাবনা ফিরিয়ে আনতে হবে। হৃদয়বৃত্তির যোগ্য মূল্য নিরূপণ করতে হবে। তিনি সেসব ভেবেছিলেন। স্তম্ভগাত্রে সেসব কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সংঘবাসীদের বলেছিলেন — তোমরা এই প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলো না। একে গড়ে তোলো। তারই আশ্রয়ে পথ খুঁজে নাও। শান্তির পথ।

সামান্য ব্যক্তি(গত লাভের আশায় প্রতিষ্ঠান ভাঙা সদর্থক কর্ম নয়। তবু অক্লেশে আমরা তা করি। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করি।

বেশ লাগছিল সারনাথের নির্জনতা ও প্রশান্তি। অদিতিকে বলছিলাম — পৃথিবীর উত্তপ্ত কোলাহল থেকে অনেক ভালো এই নির্জনতা। মনের শান্তি ও প্রাণের আরাম মেলে। মনে হচ্ছে আমাদের জগত থেকে নির্জনতা ত্র(মশ হারিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে শান্তিও। অদিতি সেকথার কোন জবাব দিল না।

সত্যিকথা বলতে কী, অদিতি সেবার সঙ্গে ছিল না। মনে মনে তবু তাকে কত কথাই না বলা। সারনাথে একদিন রাত্রিবাসের ইচ্ছে ছিল। হল না, কারণ পরদিন বাবলুদার সঙ্গে কোলকাতায় ফেরার কথা।

ইতি সারনাথ পর্ব

পরিশিষ্ট

রাজগৃহ-সারনাথ কেন্দ্র করে রচিত ভ্রমণকাহিনী এখানেই শেষ হওয়া উচিৎ ছিল। কেননা ভ্রমণপর্ব সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। তবু কাহিনীর সমাপ্তি হয় নি। আসলে তো কোন কথাই শেষ হয়ে যায় না যত(ণ জীবন চলতে থাকে। বড় জোর এক একটা পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাও বা হল কই? পরিশিষ্টে তারই শিষ্টাচার।

প্রাচীন রাজগৃহের যে রূপচিত্রটি বর্ণিত হয়েছে আজ কিন্তু আর চোখে পড়বে না। কেউ আর তেমন করে খুঁজে পাবেন না। মধ্যবিত্ত মানসিকতা ভীতি-বিহ্বলতার গণ্ডী ছাড়িয়ে জনপদ অনেক ঝাঁ চকচকে হয়েছে। তাল মিলিয়ে অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে। সমাজ সংসার সবকিছু।

কয়েক মাস পরে দুর্গাপুজোর সময় কমলেন্দু-চন্দন-শঙ্করের সঙ্গে দ্বিতীয়বার রাজগীর যাওয়া হয়েছিল। এলাহাবাদ হয়ে খাজুরাহো যাওয়ার পথে। সেই পুরোনো জৈন ধর্মশালায় সেবারেও আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বৈভার-বিপুলাচল পাহাড় চষে বেড়িয়েছি তখন। গৃধকূটেও পা রেখেছি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পায়ে হেঁটে চলে গিয়েছি নালন্দা। রাজগৃহকে যেমন এক বছর আগে দেখেছিলাম, প্রায় তেমনি দেখতে পেয়েছি। বড়ো করে কোন পরিবর্তন নজরে আসেনি।

ইতিমধ্যে নীতাদির সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হয়েও ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল কারণ অদিতির সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় হচ্ছিল। আবার সে নিবিড় সম্পর্ক ছিন্ন হতেও সময় লাগেনি বেশি। তারপর কি করে যে তা একদিন জোড়া লাগল সে আরেক গল্প।

সাত বছর পরে রাজগৃহ যাওয়া হয় শীতের ডিসেম্বরে। বাস টার্মিনাসের পিছনে ছোট্ট টিলার উপর অবন্তিকা হোটেল ছিল সেবারের বিশ্রামগৃহ। অদিতির নির্বাচন।

অবন্তিকা নামের মধ্যেই 'বিম্বিসার-অশোকের ধূসর জগতে'র গন্ধ। তত দিনে গৃধকূটের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেউ আর ও পথ মাড়ায় না। বৈভার-বিপুলাচল পাহাড়ে চড়াও নিষিদ্ধ প্রায়। পথঘাট সুরি(ত নয়। চুরি ছিনতাই বলাৎকার ঘটছে অহরহ। রাজগৃহের পরিবেশটাই কেমন ছন্নছাড়া মনে হয়েছে। মাত্র সাত বছরের মধ্যেই এমন শ্রীহীন হয়ে গেল জগতটা —দেখে মর্মাহত হয়েছি অন্য অনেকের মতো। পরিবর্তনের ঢেউ লাগতে শু(করেছে তখন থেকে। আস্তে আস্তে। নতুন হোটেল নির্মিত হচ্ছে। পানশালার সংখ্যা বাড়ছে। টুংটাং করে চলা এক্কাগাড়ির সংখ্যা কমছে। বাড়ছে যান্ত্রিক ত্রি(রিং শব্দ-করা সাইকেল রিক্সা।

পাটনায় কর্মোপলক্ষে যেতে হয়েছিল বারকয়েক। একবার সহকর্মী দিলীপ রায়কে নিয়ে কাজের ফাঁকে গিয়েছি রাজগৃহে দুদিনের জন্যে। সাত বছর পরে। সেবারে নতুন জিনিস দেখা হল শান্তি স্তূপ। গৃধকূট পাহাড়ের পশ্চিমে রত্নগিরি পাহাড়ে বিশাল শান্তিস্তূপ নির্মিত হয়েছে। ভিত্তিপ্রস্তরের ঘের একশ চুয়াল্লিশ ফুট। প্রায় অর্ধেক ঘের উপরকার স্তূপের। সওয়া শ' ফুট উঁচু। নির্মাণ করেছে জাপানের বৌদ্ধসঙঘ। রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এগারোশ ফুট উঁচু পাহাড় চূড়োয় বানানো সেই স্তূপে যেতে যান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল হয়েছে। মানুষ পায়ে হেঁটে পাহাড়ে চড়তে রাজী নয়। তারা চায় কষ্ট-লাঘব-করা রোপওয়ে। দুহাজার দুশ ফুট লম্বা এবং শতাধিক চেয়ার বসানো ঝুলা। উদঘাটন করেছিলেন আরেক রাষ্ট্রপতি শ্রীবরাহগিরি বেঙ্কটগিরি।

স্তূপের পাশে জাপানী বৌদ্ধ মন্দির। বুদ্ধমূর্তির পাদদেশে উৎকীর্ণ বুদ্ধবাণী — 'আমি লোকনাথ, আমি ভেষজ গুরু এবং সর্বসত্ত্ব রক্ষক। আমি জানি মানুষ ধর্ম-বিমুখ, ভোগবিলাসলিপ্ত এবং অজ্ঞানী। তথাপি আমি গৃধ্রকূটে অবস্থান করে সর্বদা সম্যক সম্বোধিকা উপদেশ দিই।'

মানুষ আরো আরো ধর্মবিমুখ হয়ে যাচ্ছে? মানবিকতা হারাচ্ছে? বুদ্ধের বা মনীষীদের উপদেশ কেউ মন দিয়ে শোনে বলে মনে হয় না। এখন কেউ আর জ্ঞান নিতে রাজী হচ্ছে না। সকলেই নেতাসদৃশ অতীব মহাজ্ঞানী।

শান্তিস্তূপ ঘিরে রয়েছে সুন্দর উদ্যান, বিশ্রাম-গৃহ এবং কাফেটারিয়া। উপরে উঠলে সময় কাটে ভালো। কিন্তু কেন যেন আমাদের মন ভরল না! যেন এত সব না হলেই ভালো হত। অনাবিল প্রকৃতি বেঁচে থাকত। সেই সঙ্গে বহুযুগের ওপার থেকে হাতছানি-দেওয়া ইতিহাস। আধুনিকতার অনিবার্য সংযোগ এড়ানো চলে না। যান্ত্রিক উন্নতি আটকে রাখা যায় না। তথাকথিত প্রগতি ব্যাপারটা হবেই। সত্যি সত্যি তার কতটা প্রগতি তা নিয়ে সন্দেহ ধূমায়মান।

রাজগৃহ আজ আর টিমটিমে মধ্যযুগীয় স্বাস্থ্যনিবাস মাত্র নয়। আরো হোটেল হচ্ছে। লজ হচ্ছে। আরো সুরাপানের ব্যবস্থাসহ। পর্যটকদল হৈহৈ করে চেয়ারে বসে রোপওয়ে করে শান্তিস্তূপ চলেছে। গৃধকূট কেউ বড়ো একটা যায় না। দেখার কিছু নেই নাকি! বৌদ্ধধর্মীয় ভক্তরা কেউ কেউ যায়। ইতিহাসের ভগ্নস্তূপ দেখতে কজন আর ভালোবাসে! জৈন ধর্মাবলম্বীরা বেশি করে যাচ্ছে রাজগৃহের পাহাড়ে ডুলিতে চেপে। পাবাপুরীতে।

কাশী দর্শনের বাসনা ছিল শ্বশ্রুমাতাঠাকুরানীর। সঙ্গ ছাড়ল না যাদবপুরের গীতাবৌদি। পাতানো দাদা-বৌদি। কে বলবে সেকথা? পাতানো সম্পর্কটা মনে না করিয়ে দিলে মনে পড়ে না। রাজগৃহ-সারনাথও যাওয়া হয়েছিল সেবার। বিষণ্ণ চোখে দেখতে হয়েছে — রাজগৃহে পুরোনো দিনের দুএকটি লজ কেমন করে অস্তিত্ব বজায় রাখার শেষ চেষ্টা করছে। বিদেশ ঘর এবং তার মালিক মানিকদা তখনো ছিলেন। ছিল পুরোনো দিনের

আরো কিছু মানুষ। মানিকদা পরম সমাদরে কুমড়োর হুক্কা খাইয়েছিলেন। সেকথা কোনদিন ভোলার নয়। প্রাচীন বিদায়ের পালা যে ঘনিয়ে এসেছে, মানিকদার কথায় তার সুর ছিল। প্রবীন কেউ কেউ তখনো খুঁজে খুঁজে তার ডেরায় হানা দিত। তো সে আর কদিন! নবীন জেনারেশনের পছন্দ ফাস্ট ফুড, কুমরোর হুক্কা নয়।

সেবার কাশীর গঙ্গার ঘাট, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির দেখা হয়েছে। সারনাথে পৌঁছে অদিতিকে বলেছি — 'দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না' মানে এই সারনাথ চিনতে পার কিনা?

— কি করে চিনব বল, এখানে আগে তো আসিনি।

— এসেছিলে তবু আস নাই।

মুচকি হেসে বলল — ও, তাই বল।

রাজগৃহ আরো দুবার গিয়েছি। প্রথম রাজগৃহ-দর্শনের বিংশপূর্তি উপলক্ষ্য বাহানা করে। বাহানাই বটে। বেঁচে থাকার জন্যে নিত্য নৈমিত্তিক কোন না কোন বাহানা নির্মাণ করা চাই। শুধু জৈবিক নিয়মে মানুষের দিনযাপন করা কঠিন। জৈন ধর্মশালার কাছেই অনেকটা জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে সরস্বতী লজ। সেখানে ছিলাম সেবার।

তারপর অনেক অনেক বছর চলে গিয়েছে। দেখতে দেখতে জীবনের অপরাহ্ন বেলা এসে পড়ল হুড়মুড়িয়ে। পাহাড়ে পর্বতে উচ্ছল হওয়া আর সাজে না। সামর্থ্যও কমেছে। অদিতিকে বলেছি — শেষবারের মতো একবার চল, অন্তিম বিদায় জানিয়ে আসি — গৃধকূটে ভগবান বুদ্ধের চরণে।

অশোক দত্ত লালকিলা এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে তুলে দিয়েছিল ট্রেনে। বিদায় জানাতে স্টেশনে এসেছিল তপতীও। কামরায় উঠেছিল একপাল দামাল ছাত্র। প্রাণভরে হুজ্জুতি করতে করতে যাচ্ছিল এক্সকারশনে। দুরন্তপনায় অতীতের প্রতিচ্ছায়া দেখা হল খুব। ওই ছেলেদের সঙ্গে বেড়িয়েছি সেবার কোকলাত জলপ্রপাত। পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে। নওয়াদা হয়ে যেতে হয়। জঙ্গলে ঘেরা অনাবিল প্রকৃতিরাজ্য। পাখির ডাক আর জলপ্রপাতের শব্দ ছাড়া আর কোন কোলাহল থাকার কথা নয়। আমরা একদল ছেলের অবাধ্য কোলাহলে মশগুল ছিলাম। পাবাপুরীও গিয়েছি ওদের সঙ্গে।

সেবার গৃধকূট যেতে পেরেছিলাম প্রশাসনের সাম্প্রতিক বদান্যতায়। আজকাল দেখছি লোকজন যায় ওপথে। এবং নির্ভয়ে। গৃধকূটে প্রগতির স্পর্শ লাগেনি। লাগবে। মহামানব বুদ্ধের চরণে অন্তিম প্রণতি জানিয়ে আসি অদিতিকে নিয়ে। আর কোনদিন হয়তো আসা হবে না এখানে। তথাগত বুদ্ধকে শরণ করে আমরা জীবন কাটাইনি। তবু তাঁকে স্মরণ করতে ভালো লাগে। ভালো লাগছিল। অজাতশত্রু গড়ের কাছে জৈনদের বীরায়তন মন্দির দেখা হল। মহাবীরের জীবনকথা পুতুল সাজিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সুন্দরভাবে। বেণুবনে জাপানী বৌদ্ধদের অর্থে নির্মিত নতুন বেণুবন বিহারটিও ভালো লেগেছিল।

যখন ছাত্র ছিলাম, আমার সহপাঠী সুনীল দাস বলেছিল — এই শোন, আমরা বড়ো হয়ে বৌদ্ধ হয়ে যাব। তুই হবি?

— তুই যদি হোস তবে আমিও হতে পারি।

কেন যে তখন বৌদ্ধ হওয়ার বাসনা হয়েছিল জানি না! অজন্তা-ইলোরার শিল্পকলায় আকৃষ্ট হয়ে? অথবা হয়তো হিউয়েন সাঙের কথা ভেবে। দূর দূরান্ত পাড়ি দেওয়ার লোভে। শেষ পর্যন্ত সুনীল বৌদ্ধ হয়নি। আমারও হওয়া হয়ে ওঠেনি।

আমরা গৃধকূটে গিয়েছিলাম। নতজানু হয়ে প্রার্থনা করেছি প্রাজ্ঞ বুদ্ধের কাছে। শান্তির প্রার্থনা করেছি। সংসারজীবন থেকে পালাতে পারিনি। অনেক হাবুডুবু খেতে হয়েছে। বিচিত্র মানুষজনকে দেখেছি। একবার মানুষকে মনে হয়েছে মানুষের পরম মিত্র। আবার মনে হয়েছে মানুষই মানুষের চরমতম শত্রু। এমন জঘন্য শত্রু কোন পশুও হতে পারে না। মানুষে-অমানুষে এ পৃথিবী অসমতল।

এখানে বুদ্ধ যীশু মহম্মদ কনফুসিয়াস জরাথুস্ত্র এসেছেন। রামমোহন বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ গান্ধী বিবেকানন্দ এসেছেন। এমন কি মার্কস-লেনিনরাও এসেছেন। অনেক ধর্মমত আছে। অনেক সমাজশুদ্ধির কথা হয়েছে। সমাজবাদের কথা হয়েছে। তবু পৃথিবীতে শান্তি অধরা থেকে গেল। যুদ্ধ গেল না, দাসত্ব গেল না, অধীনতা গেল না, প্রবঞ্চনা গেল না। ব্যক্তি(র উপর ব্যক্তি(র, বর্ণের উপর বর্ণের কিংবা জাতির উপর জাতির আধিপত্য কোন-না-কোন রূপে থেকেই গেল।

ভালো ভালো তত্ত্বকথা অনেক আছে। আমরা তা খুব জানি। কিন্তু মানি না। মানি আপন আপন সুবিধামতো শর্তে।

মাত্র কয়েকটা বছরের মধ্যে আমূল বদলে গিয়েছে শতাব্দী প্রাচীন জনপদ রাজগৃহ। লেগেছে আরো গভীর করে আধুনিকতার ছোঁয়া। বসে বসে ভাবি — আহা, সিংজির স্বপ্নের মতো পাহাড়কোলের বাড়িটা আর নেই। বাড়ির সামনের সেই ফাঁকা মাঠ নেই। ভরে গিয়েছে নানা আকারের বাড়িতে অলিগলিতে স(-রাস্তায় আর নর্দমায়। কিলবিল করছে হলিডে হোম আর লজ। অনেক আস্তানা এখন। বাসস্ট্যান্ডের পিছনে আরো অনেক বসবাস মানুষের। আধুনিক রাজগীরে।

জগতে কিছুই স্থির নয়। ইতিহাসও কি স্থির থাকে? নিত্য নতুন ইতিহাসের সংযোগ হয় না? রাজগৃহ-সারনাথের মতো ঐতিহাসিক স্থানও বা অপরিবর্তিত থাকে কি করে? পরিবর্তন সর্বত্র হয়েই চলেছে — অমোঘ এবং অনিবার্যনিয়মে।

তবুও ইতিহাস বেঁচে থাকে, ঐতিহ্য বেঁচে থাকে। অতীত ঘুমিয়ে থাকে চেতনার গভীর অন্তরে।